বাংলার জৈন ঐতিহ্য : সেকাল ও একাল

(প্রথম নিবেদন)

(বঙ্গদেশে জৈনধর্মের বিকাশ ও বিবর্তনের ইতিহাস)

ডঃ লতা বোথরা

বঙ্গানুবাদ

শ্রীগুরুপদ বায়েন

সম্পাদনা

সুখময় মাজী

বিবেকানন্দ বুক সেণ্টার
৩এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বাংলার জৈন ঐতিহ্য : সেকাল ও একাল
JAINA HERITAGE OF BENGAL : PAST AND
PRESENT (IN Hindi)
By DR. Lata Bothra

Translated into Bengali
By Shri Gurupada Bayen

সম্পাদক
সুখময় মাজী

প্রকাশক
প্রাণকৃষ্ণ মাজী
বিবেকানন্দ বুক সেন্টার
কলকাতা - ৭০০০৭৩

© লেখিকা কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ
২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

অক্ষর বিন্যাস
সুদীপ মাজী
৫এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট
কলকাতা - ৭৩

মুদ্রণ
ডিপি গ্রাফিক্স
গঙ্গানগর

প্রচ্ছদ : ড: লতা বোথরা

ISBN : 978-93-80973-61-0

মূল্য : ৪৫০.০০ টাকা

পূজ্য আচার্য শ্রী পদ্মসাগর সূরি মহারাজের আশীর্বচন

শব্দ শিল্পী লেখিকা শ্রীমতি লতা বোথরা দ্বারা ঐতিহাসিক তথ্যাদিতে পূর্ণ 'বরণভূমি বঙ্গাল' পুস্তক বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হতে চলেছে জেনে খুব খুশী হলাম।

লেখিকা ইতিহাসের গভীরে গিয়ে অনুসন্ধান করে সত্য উদ্ঘাটনের প্রয়াস করেছেন। ভগবান মহাবীরের সময় থেকে মুসলমান শাসনকাল পর্যন্ত ইতিহাসকে এই গ্রন্থে জোড়া হয়েছে। বঙ্গদেশের পূর্ণ ঐতিহাসিক পরিচয়ও এই পুস্তকে পাওয়া যায়।

একসময় যে বঙ্গদেশে জৈন সংস্কৃতির ব্যাপক প্রভাব ছিল, তা পরবর্তীকালে প্রাপ্ত জৈনমূর্তি, তাম্রপত্র, শিলালেখ পুরনো মন্দির ও তাদের ধ্বংসাবশেষ, ইত্যাদি থেকে প্রমাণিত হয়। জৈন সাহিত্য ও চরিতাবলী থেকেও প্রদেশ সম্পর্কে অনেক কিছু তথ্য জানা যায়। ভগবান মহাবীর এহ ভূমিতে আগমন ও অবস্থান করে এই ভূমিকে পবিত্র করেছেন। কিন্তু একটা সময় প্রতিকূল পরিস্থিতি, সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ও সামাজিক উপদ্রবের কারণে বঙ্গপ্রদেশে জৈন শ্রমণদের যাতায়াত বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে স্থানীয় জৈন জীবন ধারার বড়সড় সাংস্কৃতিক পরিবর্তন আসে এবং জৈন সংস্কৃতির অস্তিত্ব প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়।

এরপর অনেক দিন অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর পশ্চিম ভারত থেকে জৈন শ্রেষ্ঠিগণ এসে পুনরায় এখানে বহু জৈন তীর্থস্থান নির্মাণ এবং কল্যাণকারী ভূমির পুনরুদ্ধার সাধন করেছেন। নিজ নিজ বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও তাঁরা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ জেলায় জৈন মহাজনগণ জৈন সংস্কৃতির পুন: প্রতিষ্ঠার কাজে অসাধারণ যোগদান দিয়েছেন।

বর্তমান পুস্তকের লেখনশৈলী অতি সুন্দর ও রোচক। বিশিষ্ট ঐতিহাসিকদের রচিত গ্রন্থাদি, বিভিন্ন চরিত্র বিষয়ক রচনা, শিলালেখ, ভূগর্ভ

থেকে প্রাপ্ত মূর্তি এবং বিদেশী পর্যটকদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত ইত্যাদি থেকে প্রামাণিক তথ্য আহরণ করে এই পুস্তককে সুসমৃদ্ধ করা হয়েছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই পুস্তক পাঠ-করার পর জৈন সংস্কৃতির প্রাচীন গৌরব সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের ধারণা স্পষ্ট হবে, এবং অনেক অনেক প্রেরণাও লাভ করতে পারবেন।

এই পুস্তক প্রস্তুত করার সময় লেখিকা যে শ্রম স্বীকার করেছেন তা অভিনন্দনযোগ্য। এই পুস্তকের প্রকাশনা লগ্নে তাঁর প্রতি আমার আর্শীবাদ রইল।

পদ্মসাগর সূরি

পূজ্য প্রবর্তিনী শ্রী শশিপ্রভাজী'র
আর্শীবচন

জৈনধর্ম অনাদি এবং সৃষ্টির সাথেই এর আর্বিভাব । এই ধর্ম যতটা প্রাচীন ততটাই সজীব, সক্রিয় এবং সেই সঙ্গে প্রগতিশীলও । জৈন দর্শনের প্রাচীনতা ও এই বাংলার গৌরবময় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি সকলের সামনে তুলে ধরার যে শুভ প্রয়াস শ্রীমতি লতা'জী বোথরা করেছেন। এই প্রয়াস শুধু কঠিনই নয়, রীতিমত সুকঠিন ।

এই যুগের আদিকর্তা আদিনাথ ভগবান থেকে শুরু করে শেষ তীর্থংকর শ্রমণ ভগবান মহাবীর স্বামী পর্যন্ত প্রায় সকল তীর্থংকর ভগবানই নিজেদের সাধনা ও তপস্যার জন্য এই বঙ্গভূমিকে বরণ করেছিলেন।

অতএব, এই গ্রন্থ পাঠ করে বঙ্গভূমির জন্য আমাদের গর্বিত হওয়া উচিত। এই গ্রন্থটি পাঠে আমাদের এই বিশ্বাস ও প্রত্যয় জাগ্রত হবে, যার ফলে আমরাও এই বঙ্গভূমির হৃদয় পরিবর্তনের জন্য অভিনব কোনও কর্মে ব্রতী হতে পারি।

বঙ্গভূমির বিস্তৃত ইতিহাস জানার জন্য এই পুস্তক অত্যন্ত উপযোগী। প্রতিভাশালিনী লতা'জী অনেক পরিশ্রম করে এই পুস্তক প্রণয়ন করেছেন; সেইজন্য তাঁকে অনেক অনেক সাধুবাদ জানাই । এইভাবে জিনশাসনের জ্ঞানপুষ্পে সমর্পিত থাকুন, এই আর্শীবাদ রইল।

জিনশাসন সেবিকা
শশি প্রভা শ্রী

অনুমোদনীয় অভিব্যক্তি

তীর্থঙ্কর পরমাত্মা মহাবীর স্বামীর সাধনভূমি এবং তপোভূমি বাংলার বিষয়ে কেবল সাধারণ ভারতবাসী নয়, জৈনদেরও জ্ঞান সীমিত। বঙ্গবাসীরাও এই গৌরবশালী ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক সচেতন নয়; এ এক পরিতাপের বিষয়। বাংলায় জৈনধর্মের অনেক প্রাচীন অবশেষ নষ্ট হয়েছে বা নষ্ট করা হয়েছে এবং আজও হয়ে চলেছে। এর ফলে বিনষ্ট হতে চলেছে আমাদের ইতিহাস। প্রত্যেক ভারতীয়দের পক্ষেই এ এক লজ্জাজনক স্থিতি। তবে ক্ষিতিমোহন সেন এবং প্রবোধচন্দ্র সেনদের মতো বিদ্বজনেরা অনেক প্রামাণ্য তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের উপর জমেথাকা আবর্জনার ধূলি অপসারণ করে বহু গৌরবশালী তথ্যাদি অমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন।

জৈনধর্ম অত্যন্ত প্রাচীন ধর্ম। ঋষভদেব থেকে মহাবীর পর্যন্ত ২৪ জন তীর্থঙ্কর এই দেশে বিভিন্ন সময়ে নূতন নূতন চেতনা জাগ্রত করে প্রতিটি মানুষের মোক্ষপথ প্রাপ্তির জন্য উপদেশ দিয়েছেন। এইভাবে সভ্যতার ও ধর্মের পথ তাঁরা প্রশস্ত করেছেন। ফলে কল্যাণ হয়েছিল সমগ্র মানবজাতির। কিন্তু কিছু মানুষ এই ইতিহাস না জানার কারণে অহেতুক তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। জৈনধর্মের প্রাচীনতার উপর প্রশ্নচিহ্ন তুলে ধরেন। এই সকল বক্তব্যগুলির বিষয়ে এখানে লতা দিদি ঐতিহাসিক সাক্ষ্যের আধারে যে নিরপেক্ষ পর্যালোচনা করেছেন তা প্রামাণ্য এবং যথার্থ।

এই গ্রন্থে বাংলার প্রাচীন ইতিহাস সহ অনেক গ্রন্থ এবং প্রমাণের আধারের উপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে। দেশবিদেশের অনেক ইতিহাসবিদের মতামত যাচাই করে এই গ্রন্থের প্রামাণিকতা আরও বৃদ্ধি করা হয়েছে। আগম সাহিত্য এবং বাংলায় লিখিত স্বল্পপরিচিত গ্রন্থগুলির প্রমাণ ও অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ।

জৈনধর্মের প্রাচীন গৃহস্থ-সাধক-উপাসকরা হলেন সরাক সম্প্রদায়। এদের আচার-বিচার কুলদেবী দেবতা আদি বিষয়ে অত্যন্ত সুক্ষ্ম এবং গভীর অধ্যয়ন করে আমাদের সম্মুখে অনেক নতুন তথ্য প্রস্তুত করা হয়েছে, যা থেকে কেবল বাংলার নয়, সমগ্র জৈন সম্প্রদায়ের ও গৌরব অনুভব করার বিষয়। এই জন্যও লতা দিদিকে ধন্যবাদ।

এ গ্রন্থে জৈন আগম সাহিত্য, ভগবতীসূত্র, কল্পসূত্র, আচারাঙ্গ সূত্র প্রভৃতি গ্রন্থের আধারে ভগবান মহাবীরের তপোভূমি বাংলার সুন্দর বর্ণনা করা হয়েছে। তদুপরি অনেক অভিলেখ, মূর্তির উপর খোদিত লিপি এবং উৎখনিত প্রত্নভূমিতে প্রাপ্ত অবশেষ ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে বাংলায় জৈন ধর্মের প্রাচীনতার সুন্দর বর্ণনা প্রামাণ্য ঢং এ বর্ণিত হয়েছে, সুতরাং এই গ্রন্থ প্রত্যেক জৈন ধর্মাবলম্বীর অবশ্যপাঠ্য।

ডঃ লতা বোথরাকে আমরা আহমদাবাদে অবস্থিত লালভাই দলপতভাই ভারতীয় সংস্কৃতি বিদ্যামন্দিরে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলাম। কিন্তু হয়ত বা সঙ্কোচবশত: শ্রীমতী বোথরাজী এই আমন্ত্রণ স্বীকার করেন নি,তথাপি আমাদের আগ্রহ ছিলই এবং তাঁকে আবার অনুরোধ করার পর উনি আমার অনুরোধ স্বীকার করে ‘বরণভূমি বঙ্গাল’ বিষয়ে বিদগ্ধ আলোচনা সভায় তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। এল.ডি. ইন্সটিটিউট ইন্ডোলজী দ্বারা আয়োজিত “বী.এম.শাহ ব্যাখানমালাতে” তিনি তিনদিনের ব্যাখ্যান প্রস্তুত করেছিলেন। বহু বিদ্বান ব্যক্তি সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং উপস্থিত সুধীমণ্ডলী এই ব্যাখ্যানকে সাধুবাদ জানিয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করেছিলেন। ঐ সময় আমি তাঁর কাছে তাঁর সেই ব্যাখ্যানকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিলাম। পরবর্তীতে বারবার তাগাদাও দিয়েছি। আমি আনন্দিত যে, তিনি তাঁর ব্যস্ত কার্যক্রমের মধ্যেও লেখার কাজ চালু রেখেছিলেন। আজ সেই ব্যাখ্যান পুস্তক আকারে প্রকাশিত হতে চলেছে দেখে আমি অত্যন্ত খুশি। আমার আশা,লতাদিদি এইরূপ অনেক গ্রন্থ রচনা করে সমাজকে লাভান্বিত করবেন।

আমি লতাদিদিকে অভিনন্দন জানাই এবং কামনা করি,তিনি ভবিষ্যতেও এইরূপ অনেক গ্রন্থের সৃষ্টি করতে থাকুন।

ডঃ জীতেন্দ্র বী. শাহ
নির্দেশক,
লালভাই দলপতভাই ভারতীয় সংস্কৃতি বিদ্যামন্দির,
আহমদাবাদ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার প্রথম অর্ঘ্য হিন্দী ভাষায় লিখিত 'বরণভূমি বঙ্গাল' গ্রন্থের প্রকাশ কাল ইং ২০১০। প্রায় দীর্ঘ দেড় দশক পর এই মূল হিন্দী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হতে চলেছে সংশ্লিষ্ট সকল শুভানুধ্যায়ী আন্তরিক ও অকুণ্ঠ সহযোগিতায়। "বরণভূমি বঙ্গালে'র প্রকাশনার জন্য যাঁরা,বিশেষ করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে জৈন সংস্কৃতি তথা সুপ্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য পরম্পরাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মহান কর্তব্যে ব্রতী হয়েছেন,তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ;এঁরা হলেন-

পরম শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতি প্রেমলতা বান্থ
পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার বান্থ এবং
অন্যান্য শুভানুধ্যায়ী শ্রুতপ্রেমী সুহৃদ ও সজ্জনবৃন্দ।

একই সাথে আমি সাধুবাদ জানাই ধন্যবাদ জানাই বর্তমান পুস্তকের অনুবাদক সম্মানীয় শ্রী গুরুপদ বায়েন ও সম্পাদক শ্রী সুখময় মাজীকে। তাঁদের নিঃস্বার্থ পরিশ্রম না থাকলে বাংলা ভাষায় এই গ্রন্থ প্রকাশ প্রায় অসম্ভব ছিল।

সকলের সমবেত প্রয়াসে বইটির এই বাংলা সংস্করণ পাঠক সমাজে আদৃত হবে বলে আশা রাখছি। কোথাও কোন তথ্যগত বা অন্যান্য ভুলত্রুটি থাকলে সেজন্য ক্ষমাপ্রার্থী। সেই সব ভুল বা অসংগতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সুধী পাঠকবৃন্দকে অনুরোধ জানাই;পরবর্তী সংস্করণে সেগুলি নিশ্চিতভাবেই সংশোধন করা হবে।

মহাবীর জয়ন্তী — বিনীতা
কলিকাতা - ৭০০০৫৫ — ডঃ লতা বোথরা

‘বরণভূমি বঙ্গাল’ এর বঙ্গানুবাদ প্রসঙ্গে দুটি কথা

গুরুপদ বায়েন

২০০৯-১১ শিক্ষা বর্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত ছাত্র হিসেবে ‘BUDDHIST STUDIES’ এ M.A. পড়ার সুবাদে অধ্যাপক ড: এস.আর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট কলিকাতার বিখ্যাত জৈন ভবনের পরিচয় পাই। ‘BUDDHIST STUDIES’ এর মধ্যে বুদ্ধ বিষয়ক বিদ্যাছাড়া অন্যান্য বিষয় ছিল জৈন, গান্ধী এবং শান্তি বিষয়ক বিদ্যা। আমার জৈন বিষয়ক পড়াশনা খুব ভালো লাগে। এই বিষয়ে আরও কিছু জানার আগ্রহে ‘জৈন ভবনে’ গিয়ে বিপুল ‘সম্পদের’ সন্ধান পাই। ‘শ্রমণ’ ও ‘JAIN JOURNAL’ পত্রিকার গ্রাহক হই এবং সাধ্যমত কয়েকটি গ্রন্থও সংগ্রহ করি; এই বিষয়ে আরও জানার জন্য সম্মানীয়া ড: লতা বোথরাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। সাক্ষাৎকালে দানের সময় তিনি তাঁর হিন্দীতে লেখা দুখানি গ্রন্থ -‘বরণভূমি বঙ্গাল’ এবং ‘আদিনাথ ঋষভদেব ও অষ্টাপদ’ আমাকে উপহার দেন। দিনটা ছিল ২১/১১/২০১২। জৈনবিদ্যায় আগ্রহী একজন ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে বুঝতে পারি, বই দুখানি অত্যন্ত মূল্যবান, কিন্তু ভাষাগত ব্যবধানের কারণে কোটী কোটী বাঙ্গালী পাঠকের কাছে অপরিচিত রয়ে গেছে। আমি তাঁকে এই দুখানি গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করার প্রস্তাব দিলে তিনি তা স্বীকার করেন এবং আমাকে দায়িত্ব নেওয়ার অনুরোধ করেন। আমি ‘করোনা’ আবহে গৃহবন্দী অবস্থায় ‘বরণভূমি বঙ্গাল’ গ্রন্থটির অনুবাদে সচেষ্ট হই। অনুবাদ করার সুবাদে আবার এ বিষয়ে অনেক কিছু অধ্যয়ন ও চর্চ্চার সুযোগ ঘটে। অবশেষে অনুবাদের কাজ শেষ করতে পেরে নিজেকে তৃপ্ত অনুভব করছি।

‘বরণ ভূমি বঙ্গাল’ গ্রন্থটির বাংলা ভাষার অনুবাদ প্রসঙ্গে বলতে গেলে বলতে হয়, আমার মাতৃভাষা বাংলা। ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষা স্কুল জীবনে পড়েছি, কিন্তু হিন্দী শেখার সুযোগ হয় নি । পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিসে ১৯৭৯ এ যোগদান করার সুবাদে আবশ্যকীয় বিভাগীয় পরীক্ষার জন্য হিন্দী শিখতে ও পরীক্ষায় পাশ করতে হয়েছিল, অনুবাদ কালে মাঝে মধ্যে Hindi-Bengali-English [Trilingual] Dictionary - র সাহায্য নিয়েছি। ‘বরণ-ভূমি বঙ্গাল’ এর অনুবাদ করার সময় আমার বিশেষ কিছু অনুভূতি হয়েছে, কারণ লতাজী যে সকল জায়গার বিবরণ উনার গ্রন্থে রেখেছেন, সিভিল সার্ভিসে থাকার সুবাদে প্রায় সকল জায়গায়

একাধিকবার আমার যাওয়ার, দেখার এবং কাজ করার সুযোগ ঘটেছিল। তাঁর লেখা বিবরণ পড়তে পড়তে আমি চরম পুলকিত ও রোমাঞ্চিত হয়েছি। ঐতিহাসিক স্থান, কাল ও পাত্রের বাস্তব চিত্রের সঙ্গে আমার নিবিড় সংযোগ ঘটেছিল। আমি সাবেক পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট, এবং বালুরঘাট ও গঙ্গারামপুর মহকুমার মহকুমা শাসক ছিলাম, একাধিকবার দেবকোট বা বানগড় যাওয়ার সুযোগ ঘটেছিল, বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার মহকুমা শাসক ছিলাম, আমি বাঁকুড়া,পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী বর্দ্ধমান জেলার আসানসোল-দুর্গাপুর মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভূমি অধিগ্রহণ, প্রশাসন ও উন্নয়ন বিভাগে কাজ করেছি, মুর্শিদাবাদ জেলায় দুটি পৃথক পৃথক ক্ষেত্রে প্রায় সাত বছর কাজ করেছি। শেষ তিনবছর জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক হিসেবে কাজ করেছি। মুর্শিদাবাদে থাকা কালীন জিয়াগঞ্জ জেলার ভগ্নপ্রায় সংগ্রহশালা নির্মাণের সঙ্গেও যুক্ত ছিলাম। তাই ড: লতা বোথরাজী'র বিবিরণগুলিকে আমি জীবন্তরূপে অনুভব করতে পেরেছি।

ব্যক্তিগত ভাবে আমি একজন ইতিহাসের ছাত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭০ সালে ইতিহাসের স্নাতক ও ১৯৭২ সালে ইতিহাসে স্নাতোকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করে বছর তিনেক কলেজের অধ্যাপনাও করেছি। অধ্যাপনা করবার সময় আমি বুঝতে পারি "ভারতীয় সভ্যতা বৈদিক সভ্যতার অবদান" একথা আংশিক সত্য হতে পারে, সম্পূর্ণ নয়। এ ছাড়া প্রতিবাদী ধর্ম হিসেবে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের বিকাশ প্রসঙ্গে আলোচনা হলেও এর সঠিক ঐতিহাসিক মূল্যায়ন পাওয়া যায়না। সঠিক ঐতিহাসিক মূল্যায়ন হলে জানা যাবে, ভারতীয় সভ্যতার মূল আধার হল প্রাক-বৈদিক ভারতীয় সভ্যতা, যা পুরাণের গল্পের গোলকধাঁধায় হারিয়ে গেছে। প্রাক-বৈদিক সভ্যতা ছিল, মাতৃতান্ত্রিক। ভারতবর্ষে আর্যদের আগমনের পর মূল প্রাক-আর্য সভ্যতার আধারের উপর বৈদিক সভ্যতার প্রভাব ছিল প্রবল।

সাহিত্য হল জীবনদর্পণ। বেদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থগুলি থেকে জানা যায় পূর্ব ভারত দীর্ঘদিন ধরে বৈদিক সভ্যতার অনুপ্রবেশ থেকে মুক্ত ছিল। দীর্ঘদিনের চেষ্টায় সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে দুই সভ্যতার মিলনে গড়ে উঠেছে 'ভারতীয় সভ্যতা'। এই ভারতীয় সভ্যতা গড়ে তোলার জন্য একদল আর্য ঋষি ও সমাজ সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত সকল শ্রেণীর বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবিগণ বিভিন্ন পন্থার সন্ধান করেছিলেন। সমাজে মানুষের মধ্যে মেলবন্ধন গড়ে তোলা এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে মানুষের জীবন ও জীবিকার

সুরক্ষা ও সুবন্দোবস্ত করাই ছিল এঁদের লক্ষ্য। এই বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন আদিনাথ ঋষভদেব, যাঁর সম্পর্কে ঋগ্বেদেও উল্লেখ পাওয়া যায়। এই পথে যে সকল অগ্রণী চিন্তাবিদ ও সমাজ সংগঠক বিশেষ অবদান রেখেছিলেন তাঁদের বলা হয় তীর্থঙ্কর। এঁরা মানুষের সাধারণ কামনা-বাসনাকে জয় করে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করার ব্রত গ্রহণ করে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। আত্ম নিয়ন্ত্রণের মহান ব্রত পালন করে জাগতিক সকল কামনা-বাসনাকে জয় করতে পেরেছিলেন বলে এঁরা 'জিন' নামে পরিচিত। এঁদের আদর্শ অনুসরণ করে যাঁরা নিজ জীবনে এর প্রয়োগ করতেন তাঁরা জৈন নামে সমাজে পরিচিত হতেন।

বলাবাহুল্য অবিভক্ত প্রাচীন বঙ্গদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জৈন তীর্থঙ্করদের ব্যাপক বিচরণ ও ধর্মপ্রচারের ফলে বঙ্গদেশে জৈনধর্ম দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা ছিল প্রথম কোন আর্যধর্মের বঙ্গভূমিতে বিকাশ ও বিস্তার। এর ফলে সর্বপ্রথম মানবীয় ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতির ঐক্য ও সংহতি। বঙ্গভূমি থেকে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রী, প্রাপ্ত শিলালেখ ও তাম্রলেখ, সমসাময়িক জৈন, বৌদ্ধ ও বৈদিক সাহিত্য, বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী ইত্যাদি প্রমাণ করে, জৈন তীর্থঙ্করগণের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় সর্বপ্রথম ঐশ্বরীয় ভাবনার ঊর্দ্ধে মানুষের পুরুষার্থ ও শ্রমের বিনিময়ে বিজ্ঞানসম্মত সমাজ গঠন সম্ভব। এই বঙ্গদেশ থেকে সৃষ্ট জৈনধর্ম সারাভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল। মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে জৈনধর্মে দিক্ষিত করেছিলেন বঙ্গদেশের একজন জৈনসাধু, তিনি হলেন অধুনা বানগড়, পূর্বের দেবকোট বা কোটীবর্ষের ভদ্রবাহুস্বামী।

জৈন ধর্মে কোন ঈশ্বরের কৃপার সাহায্যে নয়, পুরুষার্থ ও ন্যায়নীতির মূল্যবোধের আধারে সমাজ গঠনের কথা বলা হয়েছে। ব্যক্তি থেকে গোষ্ঠী। সুতরাং প্রতিটি ব্যক্তির আচার-আচরণ যদি শুদ্ধ ও যথাযথ হয়, সমগ্র সমাজের তথা রাষ্ট্রেরও আচার আচারণ শুদ্ধ হয়। জৈন তীর্থঙ্করগণ প্রতিটি ব্যক্তির জন্য পালনীয় পাঁচটি ব্রতের কথা বলেছেন;যথা- অহিংসা, সত্য, অচৌর্য, অপরিগ্রহ এবং ব্রহ্মচর্য। সাধু সাধ্বীগণ এই পাঁচ ব্রত মহাব্রত রূপেই পালন করেন,গৃহস্থরা পালন করেন অনুব্রত রূপে। এই 'অপরিগ্রহ' ব্রত পালনের মধ্য দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের সামগ্রিক কল্যাণ সম্ভব। এই ব্রতের মাধ্যমে যার যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু সম্পদ রেখে বাকিটা সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে ব্যয় করার কথা বলা হয়েছে। এই ব্রতের মাধ্যমে সমাজে ধনী দরীদ্রের বিরাট ব্যবধান কমানোর ইঙ্গিত রয়েছে।

এই সমাজকল্যাণকামী রাষ্ট্রীয় ভাবনা ভোগবাদে বিশ্বাসীদের কাছে কাম্য

বিষয় ছিল না। আমরা ইতিহাস থেকে জানি, জৈনধর্ম বঙ্গদেশে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সমাজ-সমন্বয়ী ধর্ম হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। পরবর্ত্তী পর্যায়ে বঙ্গদেশে আগমন ঘটে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের। জৈন মতাবলম্বীদের উপর নেমে আসে আদর্শগত সঙ্ঘাতসঞ্জাত অত্যাচার। একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে জৈন সম্প্রদায়ের উপর নেমে আসে চরম বর্বরতা। কিভাবে বঙ্গদেশ থেকে জৈনধর্মের বিলুপ্তি ঘটেছিল এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর তথাকথিত কোন ইতিহাসকারের লেখাতে তেমন ধরা পড়েনি বরং ঐতিহাসিক প্রামাণিকতার প্রশ্নে এড়িয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টাই দেখা যায়। এ হেন পরিস্থিতিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে মাননীয়া শ্রীমতি ড: লতা বোথরা এই না-খুঁজে পাওয়া হারানো ইতিহাসের তথ্য ভান্ডারগুলিকে বিশ্লেষণ করে এই গ্রন্থের মাধ্যমে তা পাঠকবর্গের দরবারে হাজির করেছেন। ব্যাপক অনুসন্ধান করে বর্তমান অবস্থায় প্রাপ্ত তথ্যাদির অবশেষ খুঁজে বের করে তিনি দেখিয়েছেন, কিভাবে জৈন সংস্কৃতি বিবর্তনের মাধ্যমে আজও বঙ্গদেশে বিদ্যমান, জীবন্ত প্রমাণ হিসেবে। এখনও বহু জৈন অবশেষ অবহেলা ও বিকৃতির শিকার। প্রকৃত ইতিহাস চর্চ্চার অভাবে আমরা হারিয়ে ফেলছি সত্যতার স্মারকচিহ্ন গুলি। এই গুলি সংরক্ষণের দ্বারা আমরা আমাদের চিন্তাভাবনাকে জাগ্রত করতে পারি, এর ফলে প্রকৃত মানবসভ্যতার অগ্রগতির পথে অন্তরায়গুলিকে চিহ্নিত করতে পারি এবং ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারি। এখনও বিশ্বে জৈনধর্ম অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। যুদ্ধোন্মাদনা ও ভোগবাদের নাভিশ্বাস থেকে সমগ্র মানবসভ্যতাকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র জৈন আচার সংহিতা ও জৈন দর্শন। মাননীয়া ডঃ লতাবোথরাজীর "বরণ-ভূমি বঙ্গাল" বাংলাভাষায় অনুদিত হয়ে প্রতিটি বঙ্গভাষী জনের মননে প্রতিষ্ঠা পেলে আমি বাধিত হব।।

২।১১।২০২১ গুরুপদ বায়েন
কলিকাতা, ৪১

সম্পাদকের কলমে

দীর্ঘ পরিশ্রম এবং বঙ্গদেশের জৈন ঐতিহ্যকে জানার তীব্র কৌতূহল থেকে জন্ম নিল এই 'বাংলার জৈন ঐতিহ্য : সেকাল ও একাল' গ্রন্থটি। জৈন ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতিতে অত্যন্ত সুপণ্ডিত মাননীয়া ডঃ লতা বোথরা'জী দীর্ঘদিন ধরেই বাংলার জৈন ইতিহাসের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত রয়েছেন। আগ্রার এক অত্যন্ত ধার্মিক এবং যুক্তিবাদী ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করায় তিনি একই সঙ্গে পারিবারিক ধার্মিক বাতাবরণ এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার সুযোগ লাভ করেছিলেন। তাঁর জীবন ও সাহিত্যে তাই ধার্মিক ও বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় মেলে। তিনি কানপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করার পর তাঁর আজন্মলালিত স্বপ্ন সাহিত্য এবং পুরাতত্ত্বের উপর গবেষণা শুরু করেন, যার ফলশ্রুতিতে তিনি লক্ষ্ণৌস্থিত 'ভারতীয় শিক্ষা পরিষদ' থেকে পি. এইচ. ডি. উপাধি লাভ করেন। বঙ্গদেশে জৈন পুরাতত্ত্বের গুরুত্ব সম্বন্ধে তাঁর নিরন্তর অনুসন্ধিৎসা এবং গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ কোলকাতার 'ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ ওরিয়েন্টাল হেরিটেজ' তাঁকে ডি লিট্ উপাধিতে ভূষিত করে। জৈনবিদ্যায় তাঁর অনন্যসাধারণ অবদানের জন্য তিনি ঋষভ ফাউন্ডেশন থেকে 'মহাবীর স্বামী অ্যাওয়ার্ড' সহ অসংখ্য পুরস্কার এবং সম্মান লাভ করেন। কোলকাতা-স্থিত জৈন ভবন থেকে প্রকাশিত 'শ্রমণ'(বাংলা),'তিথয়র'(হিন্দি) এবং জৈন জার্নাল' (ইংরেজি)-এই তিনটি পত্রিকার সাথে তিনি দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত আছেন। বর্তমানে তাঁরই ঐকান্তিক প্রয়াসে ও সম্পাদনায় পত্রিকাগুলি নবরূপে প্রকাশিত হচ্ছে।

ঐতিহাসিকগণ আজ স্বীকার করেছেন যে,বৃহত্তর বঙ্গভূমিতে সর্বপ্রথম একটি সুসংগঠিত আর্যধর্ম হিসাবে জৈনধর্মই আবির্ভূত হয়। অথচ আজ বাংলায় আদি জৈনধর্মের কোনও প্রভাবই সেভাবে দেখা যায় না। বিষয়টি লতাজীকে ব্যাথিত করেছিল। সেই অন্তর্বেদনার দ্বারা চালিত হয়ে তিনি বাংলার জৈন ইতিহাস খুঁজে বের করতে যে গভীর প্রয়াস চালিয়েছিলেন,তারই ফল রূপে ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কোলকাতার 'জৈন ভবন' থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর গবেষণা গ্রন্থ 'বরণ-ভূমি বঙ্গাল'।

প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পণ্ডিত মহলে সাড়া ফেলে,কিন্তু সাধারণ বঙ্গজন এ থেকে তেমন উপকৃত হতে পারে নি;কারণ বইটি ছিল লতাজী'র মাতৃভাষা

হিন্দিতে রচিত। বাংলা ভাষায় এইরকম গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকের বড়ই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু যোগ্য ও আগ্রহী অনুবাদকের অভাবে এই গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ এতদিন সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন উচ্চপদস্থ আমলা শ্রী গুরুপদ বায়েন এই গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করতে আগ্রহী হন এবং লেখিকার সাথে যোগাযোগ করে তাঁর সম্মতিতে এই অনুবাদকার্য সম্পন্ন করেন। বিদ্যানুরাগী শ্রীযুক্ত বায়েন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুটি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন;চীনা ভাষাতেও তাঁর ডিপ্লোমা রয়েছে। একদা তিনি মেদিনীপুরের পালপাড়া কলেজে অধ্যাপনা করেছেন; মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনের সদস্য এবং সভাপতি হিসেবেও কাজ করেছেন। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৌদ্ধবিদ্যা বিভাগের অতিথি অধ্যাপক হিসেবেও কাজ করার অভিজ্ঞতায় তিনি ঋদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনদপ্তরের যুগ্ম সচিব হিসেবে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। এখনও তিনি বিদ্যাচর্চায় সদা নিরত। এহেন গুণী মানুষ যখন অনুবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন,তখন সম্পাদকের আর খুব একটা কিছু করার অবকাশ থাকে বলে মনে হয় না।

তাই যখন এই পুস্তক সম্পাদনার প্রস্তাব পেলাম তখন ‘বনের মোষ তাড়ানোর’ কাজের ব্যস্ততা সত্ত্বেও এ প্রস্তাব স্বীকার করার লোভ সামলানো গেল না। নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতিকে সেবা করার দুর্লভ সুযোগ হিসেবেই এই গুরুদায়িত্বকে গ্রহণ করলাম। নিজে বঙ্গভাষী আদি জৈন হওয়ার সুবাদে এবং জৈন ধর্মতত্ত্ব নিয়ে অতি সামান্য পড়াশোনার উপর ভরসা করে কাজটা সুসম্পন্ন করার চেষ্টা করা গেল। কতটা সফলতা এল, তা বিচারের ভার পাঠকের। পাঠকের হাতে বইটি তুলে দেওয়ার আগে গ্রন্থটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত রাখার জন্য যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও কোথাও কোথাও অনিচ্ছাকৃত ভুল থেকে গেলে ক্ষমাপ্রার্থী। অলমতি বিস্তরেণ। জৈনম্ জয়তু শাসনম্।

।। সম্পাদক ।।

<u>বিষয়-সূচী</u>

	বিষয়		পৃষ্ঠা
১।	আর্শীবচন		III
২।	অনুমোদনীয় অভিব্যক্তি	শ্রী জীতেন্দ্র বী শাহ	VII
৩।	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	ড: লতা বোথরা	IX
৪।	‘বরণভূমি বঙ্গাল’ এর বঙ্গানুবাদ প্রসঙ্গে দুটি কথা	গুরুপদ বায়েন	XI
৫।	সম্পাদকের কলমে	সুখময় মাজী	XV
৬।	বাংলার জৈন ঐতিহ্য : সেকাল ও একাল এর পূর্বকথা		XIX
৭।	বাংলার আদি মানবধর্ম ও আদিনাথ		২
৮।	তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ		১২
৯।	ভগবান মহাবীর		১৮
১০।	জৈন সাহিত্যে তাম্রলিপ্ত সহ অন্যান বিশিষ্ট জনপদ		৩৬
১১।	জম্বু স্বামী		৪৫
১২।	পাহাড়পুরের জৈন সংস্কৃতি		৪৮
১৩।	পাহাড়পুরের তাম্রশাসন		৫১
১৪।	ভদ্রবাহু স্বামী		৫৪
১৫।	ময়নামতি		৫৭
১৬।	মহাস্থানগড়		৫৮
১৭।	মেগস্থিনিসের বিবরণ		৫৯
১৮।	মৌর্যকাল		৬০

১৯। অজয়নদ	৬৪
২০। গঙ্গারিডি	৬৫
২১। চন্দ্রকেতুগড়	৬৬
২২। মুরণ্ড রাজত্বকাল	৭০
২৩। গুপ্ত রাজত্বকাল	৭১
২৪। শশাঙ্ক	৭৩
২৫। হুয়েন সাং এর ভ্রমণ বত্তান্তে কর্ণসুবর্ণ	৭৬
২৬। শশাঙ্ক পরবর্তী বাংলা	৭৯
২৭। মায়া নির্যুক্তি	৮৪
২৮। মুর্শিদাবাদ	৮৬
২৯। মুর্শিদকুলী খাঁ	৯৫
৩০। বানিজ্যিক পরম্পরায় মুর্শিদাবাদ	৯৭
৩১। বঙ্গদেশে জৈন-সংস্কৃতির পরম্পরা ও বিবর্তন	৯৯
৩২। আজিমগঞ্জের জৈন পরম্পরা	১০০
৩৩। পাঁচথুপির বরাহ কোনা দেউল	১০১
৩৪। জৈনতীর্থ আজিমগঞ্জ	১০২
৩৫। মুর্শিদাবাদে জৈনদের পুনরাগমন	১০৩
৩৬। মুর্শিদাবাদে জৈনমন্দির	১০৮
৩৭। জগৎ শেঠ ও সমকালীন ভারতবর্ষ	১২৯
৩৮। মহিমাপুরের কসৌটি মন্দির	১৫৪
৩৯। বঙ্গদেশে জৈনধর্মের পুনর্জাগরণ	১৫৭
৪০। নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী	১৫৯

বাংলার জৈন ঐতিহ্য : সেকাল ও একাল এর পূর্বকথা
-:পূর্বকথা:-

ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুর উপর চিন্তন তথা লিপিবদ্ধকরণ সবচেয়ে কঠিন কাজ, কারণ যে কোন দেশ, রাষ্ট্র সমাজ ও জাতির ক্ষেত্রে তাদের প্রাচীন ইতিহাস একটি মহামূল্যবান সম্পদ। অতিতের ভাবনার উপর গড়ে উঠে বর্তমান ইতিহাসের স্তিতি, তথা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার আধার। ইতিহাসের ঘটনাবলী সাক্ষ্য দেয়,যখন ইতিহাসকে অবহেলা করা হয়েছে তখন কোননা কোন বিঘটন ঘটেছে, কিন্তু যখন ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে তখন নতুন সৃষ্টির শুভ সূচনা হয়েছে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যদ্বারা গ্রীক আক্রমণকারীদের পরাজিত করার পশ্চাতে আলেকজান্ডারের ভারতবর্ষ আক্রমণ ও যুদ্ধে পুরুর পরাজয়ের ঘটনার পশচাৎভূমি উল্লেখযোগ্য। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয় ইতিহাসকে অবহেলা করার পরিণাম। রাজপুত নৃপতিবর্গও ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নাই, ফলস্বরূপ ভরতবর্ষে মুসলমান সাম্রাজ্যের সূচনা ঘটেছিল।

যে কোন সমাজ ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতেও ইতিহাসকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে দেখা যায়। কারুর ধর্ম, রাষ্ট্র, জাতি ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে চাইলে তার ইতিহাসকে বিনষ্ট করলে তা ধীরে ধীরে আপনাআপনি নিজ থেকে বিনষ্ট হয়ে যাবে, যা একটি সময়সিদ্ধ ঘটনামাত্র। ভারতবর্ষের আদি সংস্কৃতির গৌরব বিনষ্ট করার জন্য ঐতিহাসিক স্মারক, প্রাচীন দস্তাবেজ গুলির বিলোপসাধন ঘটানো কিংবা বিকৃত করার অপচেষ্টা সাতশত বছর ধরে অনবরত ভাবে চলে আসছে। এবং আজও পরোক্ষভাবে সমানে তা চলছে।

অতীত ইতিহাসকে অবহেলা করা মানে নিজদেশ ও নিজ সংস্কৃতির গৌরব ঐতিহ্যকে অবহেলা করা এবং এর ভয়ঙ্কর পরিণাম আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান। আমাদের ইতিহাসের মহত্ত্বপূর্ণ অধ্যায় আজও বিস্মৃতির অতল অন্ধকার গহ্বরে নিমজ্জিত। আজও অনেক মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণ অবহেলিত বা উপেক্ষিত। ধর্মও জাতির নামে ভেদভাব বশতঃ অন্যধর্মের সাহিত্য ঐতিহ্যকে গুরুত্ব না দেওয়ার প্রবণতা প্রকট । বুদ্ধিদীপ্ত তার্কিক পর্যালোচনা কিংবা

বিশ্লেষণাত্মক চিন্তনের অভাব স্পষ্টত: দেখা যাচ্ছে, যার ফলে একদেশদর্শী বিচারধারার শিকার হচ্ছে ইতিহাস।

ভারতীয় সভ্যতা যে পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগুলির মধ্যে একটি এ বিষয়ে আজকে বিতর্ক বা সন্দেহের অবকাশ নেই। মহেঞ্জোদাড়ো হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ এই বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করে যে আর্যদের ভারতে আগমনের বহুপূর্বে এখানে একটি অতি উন্নতিশীল সংস্কৃতি বিরাজমান ছিল, যা বেদবর্ণিত ব্রাত্য, নির্গন্থ, শ্রমণ সংস্কৃতি ব্যতিত আর অন্য কিছু নয়। অনেক আধুনিক ইতিহাসবিদদের গবেষণা পত্রেও এই বিষয়ে উল্লেখ এই ধারণারই পুষ্টি সাধন করে। এই শ্রমণ সংস্কৃতি প্রাচ্য ভূমিতে তীর্থঙ্কর দ্বারা বিকশিত হয়ে পরবর্তী পর্যায়ে আচার্যদের প্রভাবে তা বঙ্গদেশে ব্যপক প্রসারলাভ করেছিল, এই বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ আজও বঙ্গদেশে বিদ্যমান।

পূর্বভারতে অবস্থিত বঙ্গদেশের ভূমি যে সুপ্রাচীনকাল থেকে জৈনধর্মের বিস্তারের ক্ষেত্রছিল তার সুস্পষ্ট প্রমাণ বঙ্গদেশের প্রত্নভূমির গর্ভ থেকে প্রাপ্ত শতশত জৈনমূর্তির আবিষ্কার। অধিকাংশ মূর্তি গ্রামের অভ্যন্তরে পরিত্যক্ত ভগ্ন চাতাল কিংবা দালান ও বৃক্ষতলে উপেক্ষিত বা অবহেলিত অবস্থায় আজও পাওয়া যায়। আবার কোথাও কোথাও এই মূর্তিগুলিকে অন্যকোন দেবতারূপে অনেককে পূজো করতেও দেখা যায়। এমনকি অনেক স্থানে এই দেবতাদের উদ্দেশ্যে পশুবলিও ঘটে থাকে। বঙ্গদেশের কোন কোন জেলায় আমি যখন ঐ সকল মূর্তি গুলি দর্শন করি ও খোঁজখবর করি, তখন জেনে আশ্চর্য হয়েছি যে ঐ সকল ঐতিহাসিক স্মারকের অবশেষগুলি জৈন ধর্ম সম্পর্কযুক্ত, যা অজ্ঞানতাবশত: জনগণের কাছে অজানা।

এই বঙ্গদেশ যে ২৩ তম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ ও ২৪ তম তীর্থঙ্কর বর্দ্ধমান মহাবীর এর কর্মভূমি ছিল তার প্রমাণ জৈন আগমসাহিত্যে সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধ। বর্দ্ধমান,বীরভূম প্রভৃতি নামের অস্তিত্ব এই ধারণাকে পুষ্ট করে। প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ ড: কালীদাস নাগ, সুবোধচন্দ্র সেন, শ্রী হরিসত্য ভট্টাচার্য্য, শ্রী রামচন্দ্র অধিকারী, আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তাঁদের রচিত গ্রন্থে এই বক্তব্যের সাপেক্ষেই তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন।

অজয় নদের তটবর্তী অঞ্চলে বর্ণসংস্কারবর্জিত আদি সংস্কৃতির অবশেষ ভগবান মহাবীরের পূর্বেকার শ্রমণ সংস্কৃতির ব্যপক ব্যাপ্তির কথা স্মরণ করায়। খ্রী:পূব: ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভগবান মহাবীর এই ক্ষেত্রভূমিতে প্রজ্ঞার অলোকবর্তিকার প্রজ্বলন করে, অজ্ঞানতার অন্ধকার দূরীভূত করে মানব ধর্মের বিকাশ ঘটিয়েছিলেন।

মানুষের নৈতিক স্তরকে উন্নত করার যে প্রয়াস উনি করেছিলেন তার প্রভাব এতদ্অঞ্চলে ভাষা, আচার-ব্যবহার ও সংস্কৃতিতে তা স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়।

ভগবান মহাবীরের পর জৈনাচার্যদের কুল ও গণ এর নাম জৈন ঐতিহ্য ও পরম্পরার সঙ্গে সংযুক্ত অন্তিম-কেবলী জম্বুস্বামীর নির্বাণস্থল এই বঙ্গদেশেই ছিল। পাহাড়পুর থেকে প্রাপ্ত তাম্রপত্রে এই তথ্যের, সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। সোমপুর বিহারের প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলে প্রাপ্ত নিদর্শন থেকে জানা যায় প্রথমে এখানে জৈনবিহারের অস্তিত্ব ছিল। ভগবান মহাবীরের চতুর্থ পট্টধর গোবিন্দাচার্য কোটপুরে (দেবীকোট অধুনা গঙ্গারামপুর, দক্ষিণদিনাজপুর জেলা) এসেছিলেন। খ্রী:পূ:প্রথম শতকে কালকাচার্য বঙ্গদেশের ভূমি থেকে সুবর্ণভূমির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন বলে ঐতিহাসিকগণ মান্যতা দিয়ে থাকেন। বারীবটেশ্বর থেকে প্রাপ্ত মুদ্রা থেকে জানা যায় খ্রী:পূ: ষষ্ঠশতকে এতদঅঞ্চল গঙ্গারেডই সাম্রাজ্যের অর্ন্তভুক্ত ছিল । এই বঙ্গজনপদের কথা জৈন শাস্ত্রেও বর্ণিত রয়েছে। মানভূম, বীরভূম এবং বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলাগুলিতে আনুমানিক আড়াইহাজার বা তিনহাজার বছরের পুরাতন জৈন অবশেষ পাওয়া যায়, যা জৈনধর্মের প্রাচীনতা ও বঙ্গদেশের মানুষের আদিধর্ম হিসেবে জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রভাবের কথা দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করে।

পূর্ববঙ্গের(অধুনা বাংলাদেশ) নরসিংহডিহি কুমিল্লা, মহাস্থানগড় (অধুনা বগুড়া জেলা) ময়নামতি প্রভৃতি অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খননে আবিষ্কৃত প্রাচীন জৈন অবশেষ পাওয়াগিয়েছে। এমনকি উক্তস্থানে খ্রী: পূ: চতুর্থশতকে খোদিত ধাতুনির্মিত মুদ্রা ও পাওয়া গেছে। বাংলাদেশে প্রাপ্ত ১৮০০ বছরের প্রাচীন ১১তম তীর্থঙ্কর মল্লীনাথের মূর্তির আবিষ্কার একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। এই সকল পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন বঙ্গভূমিতে জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রভাবের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। পুন্ড্রবর্ধন, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ইত্যাদি অঞ্চলে প্রাপ্ত অসংখ্য জৈন অবশেষ ভগবান মহাবীর ও উনার পরবর্তী জৈনাচার্যদের বঙ্গভূমিতে আগমনের বলিষ্ঠ সাক্ষ্য বহন করে, যা ছিল আমাদের পূর্বজদের অমর কীর্তি, যা আমাদের সযত্নে সংরক্ষিত রাখা পরম কর্তব্য।

বাংলাভাষার বিকাশ প্রাকৃত অর্ধমাগধী থেকেই ঘটেছিল। প্রাকৃতভাষায় যে সমৃদ্ধ সাহিত্য সম্ভার বর্তমান, তথায় একদা অনেক সমৃদ্ধশালী বঙ্গ জনপদেরও পরিচয় পাওয়া যায়, যথা পুন্ড্রবর্ধন, তাম্রলিপ্ত, সমতট, কৌটশিলা, কুমিল্লা, পৌণ্ড্র ইত্যাদি। এই সকল স্থানের সমৃদ্ধি ও বিকাশের সঙ্গে জৈন ধর্ম ও সংস্কৃতির বিকাশের প্রভাব যথেষ্ট। কালক্রমে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ধর্মীয় বিদ্বেষভাবের

উদ্ভবের কারণে এই সকল অঞ্চলের জৈন সম্প্রদায়, যাঁরা উন্নত সংস্কৃতির এক সময় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, ধীরে ধীরে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থান ক্ষাত্রশক্তির পতনের অন্যতম কারণ ছিল। ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের মনে দেব-দেবীর মাহাত্ম্য, ভক্তি, ভীতি-ভাবনাকে বিশেষভাবে জাগরুক করানো হয়; হোম-যজ্ঞ দ্বারা মানুষের সকল দু:খ দূর হয়ে যাবে, সুখ-সমৃদ্ধির বিকাশ ঘটবে, এইভাবে কর্ম ও পৌরুষকে গুরুত্বহীন করে মন্ত্রতন্ত্র ও বিশ্বাসের উপর ক্ষত্রিয়-তথা জনগণের মনে দৈব নির্ভরতা সৃষ্টি করা হয়। রাজন্যবর্গের মনে দেব-দেবীর অলৌকিক ক্ষমতার কথা প্রচার করে তাঁদের শ্রমণ পরম্পরার ঐতিহ্যের অবসান ঘটানো হয়। এইভাবে সমাজে ক্ষত্রিয় আধিপত্যের অবসান এবং ব্রাহ্মণদের প্রভূত ও প্রতিপত্তির বিস্তার ঘটতে থাকে, ফলে শ্রমণ ও শ্রাবক শ্রাবিকারা উক্ত অঞ্চল থেকে পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। যাঁরা কোন প্রকারে বেঁচেছিলেন তাঁদের ধর্ম পরিবর্তনে বাধ্যকরা হয়েছিল। কোথাও মন্দির ধ্বংস করে কিংবা মন্দিরের মূর্তির অপসারণ ঘটিয়ে তথায় শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। যেখানে কেউ কোনদিন শিবমূর্তি দেখে নাই, সেখানে লিঙ্গ চিহ্নকে শিবলিঙ্গ বলে প্রচার করা হয়। প্রমাণ স্বরূপ জি.টি.রোড সন্নিকটে বরাকর নদীর তটবর্তী স্থানে রেগুনিয়া অঞ্চলে অবস্থিত চারটি প্রাচীন জৈন মন্দিরে জিন মূর্তির জায়গায় শিবলিঙ্গ স্থাপন করে দেওয়ার ফলে আজও জৈনমন্দির শিবমন্দির নাম প্রচারিত হচ্ছে। এইভাবে মিথ্যা প্রচার দ্বারা সাধারণ মানুষের মনে বিভ্রান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল।

ঐতিহাসিক বি.সি সেন মহোদয় তাঁর "বৃহৎবঙ্গের ইতিহাস" গ্রন্থে লিখেছেন, জৈন ধর্মের বিলুপ্তির কারণ ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থান। জৈনমন্দির গুলিকে হিন্দুমন্দিরে রূপান্তরিত করা এমন কি জৈনমূর্তিকে হিন্দু দেবতার নাম অরোপিত করা ও পূজা করার প্রয়াসে মূর্তিগুলির জৈন সম্পর্ককে অস্বীকার করা হয়েছিল।

[The Brahmins were responsible for wiping out Jainism from Bengal. Jaina Temples were converted into Hindu temples and even some of the deities who were widely worshipped were given Hindu names and worshipped as Hindu Gods without ackowledgement of their Jaina origin.]

জৈন ধর্ম জ্ঞানমূলক দর্শন এবং তীর্থঙ্করদের প্রস্তরনির্মিত প্রতিমাগুলি জ্ঞান-সাধনার অবলম্বন বিশেষ, আন্তরিক সৌন্দর্যের বাহ্যিক প্রকাশ, শিল্পীর চেতনার আলোয় সার্থক রূপায়ণ, যা কেবল সম্পূর্ণ সাধনা এবং আরাধনা

ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। এই মূর্তিগুলি কেবল সাধনার প্রতিফলন এবং নিদর্শন যা জ্ঞানের মূর্তপ্রতিক। এই সকল প্রতিমা নির্মাণের পশ্চাতে রয়েছে এক সুদৃঢ় সাংস্কৃতিক পরম্পরা যা ঋষভদেবের সময় থেকে সুরু হয়েছিল এবং তা বর্দ্ধমান মহাবীরের সময় এক চরম উৎকর্ষতায় পৌঁছেছিল।

বর্দ্ধমান মহাবীর এই বঙ্গভূমিতে যে পৌরুষ ও আধ্যাত্মিকতার জ্যোতি বিকীর্ণ করেছিলেন তা অনেক শতাব্দীধরে বঙ্গভূমিতে সমৃদ্ধ ও প্রজ্জ্বলিত ছিল। আধ্যাত্মিকতার অন্তর্নিহিত মাধুর্য যাঁদের স্পর্শ করেছিল তাঁরা হয়েছিলেন জৈন। সুপ্রাচীনকাল থেকে শুরুকরে আজ থেকে পাঁচশত বছর পূর্বেও এই বঙ্গভূমিতে বহুজ্ঞানী ও মনীষীদের বিচরণ ভূমি ছিল, যা কালক্রমে জৈন আচার্যদের আগম-নিগমের পথ অবরুদ্ধ হয়ে যায়, যার ফলে জৈন সংস্কৃতির গৌরবময় পরম্পরা ধীরে ধীরে অপসৃয়মান হতে থাকে। কিন্তু আজ পুনরায় গৌরবময় ঐতিহাসিক ভূমিতে ভূমিপুত্র জৈনাচার্য শ্রী পদ্মসাগরসুরিশ্বরজী মা.সা. মহোদয়ের পুনরায় আগমণে আমার মনে আশার কিরণ জাগায় যে এখানে শ্রমণ সংস্কৃতির পুনরুত্থান সম্ভব। স্বাধ্বী শ্রী প্রভাশ্রীজীর বঙ্গভূমিতে পুন: পদার্পণ এই সংকেত দেয় যে বঙ্গ ভূমিতে এমন সংস্কৃতির জ্যোতি পুনরায় প্রজ্বলিত রাখার সংকল্প কেবল অলীক কল্পনা নয়। ভগবান মহাবীর এই বঙ্গভূমিতে যে আধ্যাত্মিকতা ও পৌরুষার্থের দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত রেখেছিলেন তার তমসাচ্ছন্ন অবস্থার অবসান ঘটিয়ে পুনরায় তার প্রজ্জ্বলন সম্ভব বলে আমি আশাবাদী।

বিগত ৩৭ বছর বাংলা আমার কর্মভূমি। এখানে সুপ্রাচীনকাল থেকে জৈনধর্মের কি ভূমিকা ছিল, এই বিষয়ের গুরুত্ব ও মহত্ত্ব উপলব্ধি করে আমার দৃঢ় সংকল্প ছিল, এই বিষয়ে গবেষণা করা। আমার স্বামী শ্রী সুরেন্দ্রচন্দ্রজী বোথরা তাঁর ব্যস্ত জীবন থেকে অমূল্যসময় বের করে আমার গবেষণার সংকল্পকে সার্থক করার প্রয়াসে পায়ে পায়ে আমার সাথ দিয়ে উপযুক্ত পদপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন। উনার জন্যই আমার এই গবেষণার কাজ আজ সাকার হয়েছে।

শ্রীমতি মালা বৈদ ও আমার গবেষণার কাজে স্বত:স্ফূর্তভাবে আমাকে নিরন্তর এগিয়ে থেকে প্রেরণা দিয়েছেন, এই গ্রন্থের সম্পাদনার কাজে উনি আমাকে বরাবর সহযোগ দিয়ে গেছেন। এই গ্রন্থের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যসামগ্রীর সংগ্রহ কাজে শ্রী শশিকান্ত নওলাখা, শ্রী জ্যোতিকুমার নাহার, শ্রীসিংঘী তথা শ্রী প্রদীপকুমার বৈদ মহাশয়দের সহযোগিতার জন্য আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমার এই গবেষণার কাজে জৈনভবনের সকল কর্মকর্ত্তাদের পূর্ণ সহযোগ পেয়ে আমি চির কৃতজ্ঞ। সুশ্রী রেখা বাজপেয়ী এবং শ্রী বিভাস দত্তর (অরুণিমা প্রিন্টিংস

ওয়ার্কস)এর নিকট আমি কৃতজ্ঞ, যিনি পূর্ণ মেহনত ও সময়ের সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটিয়ে এই গবেষণারকাজ সাকার করতে সহযোগ দিয়েছেন।

পুন: আমি সকল ব্যক্তিবর্গের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যাঁরা পত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে আমাকে সহযোগিতা দিয়েছেন।

জৈনভবন, কলিকাতা, **লতা বোথরা**

ইং সেপ্টেম্বর, ২০১০

বরণ-ভূমি বাংলা

প্রথম অর্ঘ্য

যুগপুরুষ, যুগস্রষ্টা তথা তীর্থঙ্করগণের জন্মভূমি, সিদ্ধভূমি ও নির্বাণভূমিকে আমরা তীর্থভূমি মনে করি। সেই সঙ্গে তাঁদের পাদস্পর্শে পবিত্র ধূলিময় মৃত্তিকাও তীর্থভূমি। ভগবান মহাবীর তাঁর নিজের সাধনা ও তপস্যার জন্য যে ভূমিকে বরণ করে ছিলেন এবং যে ভূমির ধূলিকণা তাঁর পাদস্পর্শে পূত, সেই পূণ্য তীর্থভূমির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস আজও অনেক বঙ্গবাসীর কাছে অজ্ঞাত। "ভগবান মহাবীর রাঢ় অঞ্চলের দুর্গম বন্ধুর পথের প্রতিবন্ধকতা তুচ্ছ করে বিহার করেছেন; সাধনা ও তপস্যার দ্বারা চরমজ্ঞান লাভ করেছেন এবং এতদঞ্চলকে তাঁর অসীম করুণাধারায় অভিষিক্ত করেছেন। মানুষের হৃদয় পরিবর্তনের এই মহান প্রয়াস এই বঙ্গভূমিতেই ঘটেছিল"।

– নেমিচাঁদ জৈন।

বাংলার আদি মানব ধর্ম ও আদিনাথ

আমরা ভারতীয় ইতিহাসের বর্তমান স্বরূপে বাংলার ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের প্রবাহ সপ্তম শতাব্দীতে শশাংকের সময় থেকেই প্রথম দেখতে পাই। তার পূর্বের সকল ঐতিহাসিক তথ্যাদিকে উপেক্ষা করা হয়েছে, এর কারণ কী? একথা জানা আবশ্যক। ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থে বঙ্গদেশকে অনার্যভূমি বলে গণ্য করা হয়েছে। সপ্তম শতাব্দীতে অন্ধ ধর্মীয় উন্মত্ততার প্রবাহে ধর্মীয় বিদ্বেষভাব বশত: শৈব ভক্তদের বাহিনীর গ্রামে গ্রামে বিচরণ করা ও ওখানকার প্রাচীন কাল থেকে চলে আসা নিদর্শনগুলিকে নষ্ট তথা চরিত্রের বিকৃত করার প্রয়াসের দ্বারা সে কালে প্রচলিত সংস্কৃতির পরম্পরাকে বলপূর্বক পরিবর্তন করার প্রয়াস দেখা যায়। এইভাবে আনুমানিক ১১০০ বছরের ইতিহাসকে বিকৃত করে এর প্রকৃত স্বরূপকে অন্ধকারময় ধোঁয়াশার আস্তরণের অন্তরালে রাখা হয়। সাম্প্রতিক কালে কতিপয় জ্ঞানী পণ্ডিত প্রাচীন সাহিত্য ও পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনার দ্বারা প্রাচীন বঙ্গদেশের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি জনসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করার প্রচেষ্টা করেছেন। ঐ সকল পণ্ডিতগণের দ্বারা উদ্‌ঘাটিত তথ্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিহাসের একটি রূপরেখা আমি এই নিবন্ধে তুলে ধরার প্রয়াস করছি। এই নিবন্ধে আমি শান্তিনিকেতনের আচার্য শ্রী ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য, তাঁর গবেষণামূলক নিবন্ধে 'জৈন ধর্ম ও বঙ্গদেশ' তুলে ধরেছেন, আমি তার উল্লেখ করছিঃ

"আমাদের প্রচীন ধর্মের যে সব নির্দশন পাওয়া যায় তাহা সবই জৈন, তাহার পরে বৌদ্ধযুগ, তাহার পরে বৈদিক ধর্মের মতবাদ এসেছিল।"

অর্থাৎ আমাদের প্রাচীনতম ধর্মের যে সব নিদর্শন পাওয়া যায় তার সবই জৈনধর্মের এবং এর পর আসে বৌদ্ধযুগ এবং এরপর আসে বৈদিক যুগ। সাহিত্য ও পুরাতাত্ত্বিক এই দুই প্রকার তথ্যের আধারে নিরপেক্ষভাবে পর্যালোচনা ও অধ্যয়ন করার পর আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের উক্ত ধারণার উপর দৃঢ় প্রত্যয় জন্মায়।

প্রসিদ্ধ বিদ্বান শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ও এই বিষয়ে মতামত ব্যক্ত

করতে গিয়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে বঙ্গদেশে বৈদিক ধর্ম জৈন, বৌদ্ধ ও আজীবক ধর্মের পরেই প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। তাঁর মূল্যবান প্রশ্ন "বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম কোন ভারতীয় ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার ঘটেছিল"? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন। জৈন এবং আজীবক ধর্মের বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারের কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে"।

— বাংলার আদিধর্ম, প্রবোধচন্দ্র সেন।

পরবর্তীকালে আজীবক ধর্ম জৈনধর্মের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। সম্ভবত: এইকারণে সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাং যখন ভারতবর্ষে এসেছিলেন তখন বাংলা ভ্রমণকালে এখানে তিনি নির্গ্রন্থ (জৈন) দের প্রভাব সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য করেছিলেন। আজীবক সম্প্রদায় সম্পর্কে তাই তিনি কোন উল্লেখ করেন নি।

বিহঙ্গাবলোকনে যদি সংস্কৃতির আদিম স্রোতধারাকে নিরীক্ষণ করা যায় তবে, জানা যায় সমস্ত প্রাচীন ধর্ম গ্রন্থগুলিতে উল্লিখিত মহা ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পথপ্রদর্শক আদি তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের ভূমিকার কথা। চতুর্দশতম কুলকর নাভির পুত্র ঋষভদেব তৎকালীন সমাজগঠনে মানবকুলের পথপ্রদর্শক ছিলেন। দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে তিনি তাঁর একশত পুত্রকে বিভিন্ন দেশে সমাজসংস্কারের বিভিন্ন কাজে দায়িত্বভার অর্পণ করেছিলেন। তাঁর পুত্র অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, ইত্যাদির নাম আজও জীবন্তরূপে ভগবান ঋষভদেবের স্মৃতি বহন করে চলেছে।

আচার্য জিনসেন লিখিত "মহাপুরাণে" (পর্ব ১৬) বর্ণিত কাহিনী বাংলার প্রারম্ভিক ইতিহাস সম্পর্কে আরও ইঙ্গিত দেয়। যেখানে জৈন সাহিত্যে আদি তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের পুত্র 'বঙ্গ'র নামানুসারে এই দেশের নাম 'বঙ্গ', সেখানে অন্যান্য সাহিত্যে রাজা বলির মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভজাত পাঁচ পুত্রের কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা, 'অঙ্গ', 'বঙ্গ','কলিঙ্গ', সুহ্ম এবং পুণ্ড্র। একথা মনে করা যেতে পারে যে, তাঁর অধীনস্থ দেশের নাম তাঁদের নামানুসারেই হওয়া সম্ভব। বঙ্গদেশের আদি অধিবাসীদের মধ্যে বঙ্গজাতির লোকেরাই সবচেয়ে প্রাচীন বলে তাদের নামানুসারে পুরো দেশটাই বঙ্গদেশ নামে পরিচিত। বঙ্গদেশের পরিচিতি 'Banga''Bangla' 'Bangladesh' প্রভৃতি নামেও পাওয়া যায়, যা থেকে অনুমান করা যায় এই সকল নাম 'বঙ্গ' নাম থেকেই উদ্ভূত। কিছু ইতিহাসবিদের মতানুসারে, এই 'বঙ্গ' শব্দটি অষ্ট্রিক শব্দ 'BONGA' , থেকে এসেছে যার অর্থ SUN GOD বা সূর্যদেব। ঋষভদেবের পূজা আমরা সূর্যদেবের পূজা রূপে পালিত হতে দেখি। যে ভাবে জগতের সকল প্রকার জীবের প্রাণরক্ষক

হিসেবে সূর্যকে দেখা হয়, তেমনি ঋষভদেবকে জগতের সকল প্রাণীর জীবন রক্ষায় একজন অগ্রগামী, ও উদ্ভাবনীশক্তির অধিকারী উদ্যমী মানব হিসেবে মান্য করা হয়।

অনেক ভাষাতত্ত্ববিদ 'বঙ্গ' শব্দের উৎপত্তি তিব্বতি BANS শব্দ থেকে হয়েছে বলে মনে করেন। যার অর্থ হল আর্দ্র জলাভূমি। তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের বিকাশের পূর্বে বৌন ধর্মের প্রচলন ছিল। এবং বৌনধর্মের পূর্বে এখানে লিচ্ছবী রাজাদের রাজ্যছিল যাঁরা ছিলেন ব্রাত্যক্ষত্রিয়দর শ্রমণ সংস্কৃতির অনুগামী। ঋষভদেবের পরিনির্বাণ তীর্থ অষ্টাপদ কৈলাশ তিব্বতেই অবস্থিত।

অধিকাংশ ঐতিহাসিক মনে করেন, সিন্ধু উপত্যকায় সভ্যতার পতন শুরু হলে ওখানে বসবাসকারী 'বৌঙ্গ' নামক এক জাতি, যাদের ভাষা ছিল দ্রাবিড়, খ্রী: পূ: একহাজার বৎসর পূর্বে এই বঙ্গদেশে এসে বসবাস শুরু করে।

'The Kingdom of Anga Vanga and Magadha was formed by the 10th century B.C. located in Bihar Bengal regions.Exact origin of the word Bengla or Bengal is unknown. It is believed to be derived from the Dravidion speaking tribe Bang that settled in the area around the year 1000 B.C.''["অঙ্গ বঙ্গ এবং মগধ রাজ্য ১০০০ খ্রী: পূ: বাংলা ও বিহার গঠিত হয়েছিল। বাংলা বা বঙ্গ কথাটির উদ্ভবের প্রকৃত কারণ অজানা। তবে মনে করা হয়, এরা দ্রাবিড় ভাষাভাষী মানবগোষ্ঠী যাঁরা ১০০০খ্রী: পূ: এখানে বসবাস শুরু করেছিল] তবে কিছু ঐতিহাসিক এই ঘটনা ১৮০০ খ্রী: পূ: ঘটেছিল বলে মনে করেন।

সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত সিলমোহর ইত্যাদি থেকে জানা যায় সিন্ধুসভ্যতার সংস্কৃতি শ্রমণ সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত ছিল। অধ্যাপক রমাপ্রসাদ চন্দ্র, অধ্যাপক প্রাণনাথ বিদ্যালংকার তথা ড: রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পন্ডিত এই বক্তব্য সমর্থন করে সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে যুক্ত সিলমোহর ইত্যাদি নির্দশনগুলিকে শ্রমণ সংস্কৃতির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

"আজ জাম গ্রামের নিকট অজয়নদের উত্তর তীরস্থ অঞ্চলে অবস্থিত পাহাড়পুর গ্রামে সিন্ধুসভ্যতার সময়ের এক মাতৃমূর্তির মাথার দিকের অংশ পাওয়া গেছে, যা থেকে সিন্ধুজাতির এই অঞ্চলে আগমনের প্রমাণ পাওয়া যায়।"

— শ্রী হরিপ্রসাদ তেওয়ারী

অধিকাংশ ঐতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতাকে দ্রাবিড় এবং অনার্য সভ্যতা রূপে বর্ণনা করেছেন। বঙ্গবাসীদিগকেও অনার্য, দস্যু ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হোত। কিন্তু এর পশ্চাতে বাস্তবিক আরও কিছু তথ্য ছিল। বিশ্বের সমস্ত প্রাচীন সভ্যতা ও তার ইতিহাস থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, সকল স্থানেই ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় জাতির আপন আপন প্রভুত্ব কায়েম রাখার স্বার্থে প্রচ্ছন্ন আপোষের আড়ালে পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল, কখনও রাজন্য আদি ক্ষত্রিয় গোষ্ঠী বলশালী হয়ে উঠেছে কখনও বা ব্রাহ্মণ পুরোহিত শ্রেণী।

ইউরোপেও প্রথম থেকে চার্চ ও রাজার মধ্যে প্রভুত্বের লড়াই জারি ছিল। অন্যভাবে বললে তা ব্রাহ্মণের অধীনে ক্ষত্রিয়দের অবনত করার প্রচেষ্টা। প্রথম প্রথম ভারতবর্ষে এই ধরণের দ্বন্দ্ব ছিল না। তখন সমাজের সব গোষ্ঠীর লোকেরাই প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজ নিজেরাই সুচারুভাবে সম্পন্ন করত। কিন্তু ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণরা তাদের কর্তৃত্ব বাড়াতে শুরু করে এবং নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কেবল যুদ্ধের দ্বারা ক্ষত্রিয়দের পরাজিত করার মধ্যদিয়েই নয় বরং জাগতিক কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য যাগযজ্ঞ, পশুবলি, ইত্যাদির দ্বারা দেবতাদের প্রসন্ন করে মনোবাসনা সিদ্ধি করার এক অলীক প্রচেষ্টার দিকে তাদের পরিচালিত করেছিল। পরশুরাম কর্তৃক পৃথিবীকে নি:ক্ষত্রিয় করার কাহিনী এই ধারণার পুষ্টিসাধন করে। এই জন্যে মূল বেদেও নানা পরিবর্তন আনা হয়। পরে ইতিহাসবিদগণের মধ্যে অনেক আপন স্বার্থ রক্ষার জন্য একে আর্য ও অনার্যের সংঘাত রূপে বর্ণনা করেছেন। প্রথিতযশা: বিদ্যান মোক্ষমূলার ও একে আর্য অনার্যের সংঘাত বলে স্বীকার করেছেন, কিন্তু জাতিগত দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়। অনার্য জনসাধারণের ভাষা ছিল প্রাকৃত আর শিক্ষিত উচ্চবর্গের লোক যারা প্রকৃত জ্ঞানী এবং আত্মজ্ঞান ও বিজ্ঞান সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, তাঁরা আর্য হিসেবে পরিচিত হতেন। ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিক চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। এই জন্য এই দেশকে আর্যাবর্ত বলা হয়ে থাকে। জৈনেতর গ্রন্থে রাবণকে, যাঁকে একজন মহান পন্ডিত, জ্ঞানী এবং বিদ্বান বলে স্বীকার করেও তাঁকে রাক্ষস এবং অনার্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু জৈন সাহিত্যে রাবণকে ঘৃণিত রাক্ষস হিসাবে উপাস্থাপিত করা হয় নি। এই জন্য পরবর্তীকালে যে সকল লোক শ্রমণ সংস্কৃতির আবর্তে ছিলেন তাঁরা অনার্যদের জন্য দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন, কারণ তাঁরা ছিলেন ক্ষত্রিয় জাতির অন্তর্গত। বায়ুপুরাণ ও মৎস্যপুরাণে বাংলার পুণ্ড্র, সুহ্ম এবং বঙ্গবাসীদের ক্ষত্রিয় হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

ক্ষত্রিয়দের মূলনীতি হল অসহায় এবং দুর্বল লোকেদের রক্ষা করা। ক্ষত্রিয় রাজারা নিজেদের প্রজার পালন কর্তা বলে মনে করতেন। একজন ক্ষত্রিয় তিনিই হবেন যাঁর মধ্যে দয়া, ক্ষমা এহং সহনশীলতার গুণ বিদ্যমান। যিনি দৃঢ়প্রত্যয়ের অধিকারী, পরাক্রমী ও সংযমশীল এবং নিজ পৌরুষের উপর অগাধ আস্থাবান, তিনিই ক্ষত্রিয়। অন্যান্য বর্গের সকল মানুষকে নিজ ছত্রছায়ায় রেখে সুরক্ষা প্রদান করা তাঁর কর্ত্তব্য। এই গুণাবলীর জন্য শ্রমণ-সংস্কৃতিতে সকল তীর্থঙ্কর ক্ষত্রিয় বলা হয়ে থাকে। আদি তীর্থঙ্কর ঋষভদেব সবচেয়ে প্রথমে এই ক্ষাত্রধর্মের শিক্ষা দিয়েছিলেন। মহাভারতের শান্তিপর্বে উল্লেখ রয়েছে যে, ভগবান আদিনাথ কর্ত্তৃক ক্ষাত্র ধর্ম প্রবর্তিত হয়েছিল এবং অবশিষ্ট ধর্ম তার পরে প্রবর্তিত হয়, যথা—

ক্ষাত্রো ধর্মো হ্যাদিদেবাৎ প্রবৃত্ত:।
পশ্চাদন্যে শেষভূতাশ্চ ধর্ম:।।

মহাভরত শান্তিপর্ব ১২/৬৩/২০ ব্রাহ্মণপুরাণে (২/১৪) ধরাশ্রেষ্ঠ ঋষভদেবকে সমস্ত ক্ষত্রিয়দের পূর্বজ বলা হয়েছে।

প্রজাপালন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, অনিষ্ট থেকে রক্ষা, এবং বেঁচে থাকার সকল বন্দোবস্তকরে প্রজার প্রতিপালন করা, এই দুটি গুণের প্রকাশ ঋষভদেবের মধ্যে ছিল। উনি স্বয়ং দু বাহুতে অস্ত্রধারণ করে লোকেদের শস্ত্রবিদ্যার শিক্ষা দেন। তিনি শাস্ত্রশিক্ষা প্রাপ্ত লোকদেরকে ক্ষত্রিয় উপাধিতে ভূষিত করেন। ক্ষত্রিয়ের অর্ন্তনিহিত ভাব এইখানেই আছে। উনি কেবল শাস্ত্রবিদ্যার শিক্ষা দেন নি, বরং তিনি সর্বপ্রথম ক্ষত্রিয় বর্ণের প্রতিষ্ঠাও করেছিলেন ।ব্রাহ্মণরা কেবল ধর্মগ্রন্থের পঠনপাঠন ও যজনযাজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু ক্ষত্রিয়দের ধর্মগ্রন্থাদি পঠন পাঠন ব্যাতিরেকে বিভিন্ন কলা ও শিল্পরীতি শৈলীর শিক্ষা অর্জন করতে হ'ত। বীর এবং সাহসীরাই কেবল উৎকৃষ্ট ত্যাগ এবং শ্রেষ্ঠ তপস্যা করার যোগ্য, ফলে নিবৃত্তি ধর্মও ক্ষত্রিয়ের আয়ত্ব ছিল, যার প্রভাব ঋষভদেবের সময় সর্বপ্রথম দেখা যায় এবং যার ছাপ সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা থেকেও পাওয়া যায়।

সিন্ধুসভ্যতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অধিবাসীগণ এই বঙ্গ ভূমিতে আগমন করে বসতিস্থাপন করেছিলেন। এই বক্তব্যের সমর্থনে এখানে আজও বিদ্যমান একটি জাতির অবস্থান,যার অস্তিত্ব এবং ঐতিহ্য আজও অক্ষুন্ন রয়েছে, যাঁদের আমরা 'সরাক' নামে জানি। এই সরাক জাতির প্রধানত: দুটো গোত্রের কথা জানা যায়,

আদিদেব এবং ঋষভদেব। আদিদেব ঋষভদেবেরই নাম।

ইতিহাসের পৃষ্ঠা বিবর্ণ হয়েযায়, বিস্মৃতির অতলে ইতিহাস হারিয়ে যায়, কিন্তু এমন কিছু ঐতিহ্য মানব জাতির মধ্যে প্রচলিত থাকে যা অতীতেরে সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক জুড়ে রাখে এরকমি একটি ঐতিহ্য হল তার জাতি ও গোত্র। অতীতকালে মানুষ যে যুগপুরুষ দ্বারা প্রবর্তিত অনুশাসন, রীতিনীতি তথা শিক্ষা প্রাপ্ত হয় তাকে গোত্র-পিতা বলা হয়ে থাকে, যা হাজার বছরের পরেও পরম্পরা রূপে উক্ত জাতির পরিচয়ের প্রতীক হিসেবে বিদ্যমান থাকে। এই সরাক জাতির গোত্র পিতা ঋষভদেব হওয়ার কারণে এটা নিশ্চিৎরূপে বলা যেতে পারে, সরাকজাতির পূর্বপুরুষ ঋষভদেব বা উনার কোন অত্যন্ত নিকট সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি, যাঁর সঙ্গে তাঁদের রক্তের কোন সম্পর্ক ছিল। এখানে এই কথাও দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয় যে, ঋষভদেবের পুত্র বঙ্গ দ্বারা বঙ্গদেশের অস্তিত্বের সূত্রপাত ঘটেছিল।

কল্পবৃক্ষ কালের শেষ সময়ে মানুষের বাঁচার জন্য যখন বিভিন্ন আবশ্যকীয় বিষয় বস্তুর প্রয়োজন বাড়তে তাকে তখন ঋষভদেব মনুষ্যজাতির জন্য ছয়প্রকার কর্মের বিধান ও শিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। উনি অগ্নির প্রয়োগ বিষয়ে শিক্ষা দেন, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়েও শিক্ষা দেন। অন্যভাবে বললে বলতে হয়, উনি মনুষ্যজাতিকে সকল প্রকার সংস্কারের জ্ঞান ও শিক্ষা প্রদান করে সভ্যতাও সংস্কৃতির বিকাশের সূচনা করেন। সরাক জাতি শিল্পীর জাতি এবং এঁদের শিল্প দক্ষতা ঋষভদেবের আমল থেকে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে জুড়ে রয়েছে।

এইভাবে দেখতে গেলে আদি তীর্থঙ্কর মনুষ্যসমাজকে অসি, মসি, কৃষি, মৃত্তিকার দ্বারা বর্তন নির্মাণ, বস্ত্র বয়ন, প্রভৃতি বিভিন্ন কর্মের শিক্ষণ দিয়ে প্রগতির বিকাশ ঘটিয়ে মানবসমাজকে আদিমযুগ থেকে ধাতুযুগে এনেছিলেন এবং তাঁর প্রদর্শিত পথে এক উন্নত প্রগতিশীল সভ্যতার ভিত্তি গড়ে উঠেছিল, যা ঋগ্বেদের রচনাকালের আগেই বিদ্যমান ছিল,ঋগ্বেদের মধ্যেই এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

আজ ঋগ্বেদকে বিশ্বের সবচেয়ে প্রথম সাহিত্য বলে কৃতিত্ব দেওয়া হয়। শ্রমণ সংস্কৃতির রচিত সাহিত্য অনুসারে বেদের রচনা ঋষভদেবের পুত্র ভরত কর্ত্তৃক শ্রাবকগণের শিক্ষার জন্য সংকলিত হয়েছিল। প্রাচীন বেদ লুপ্ত হলে অনেক নবীন শ্রুতিধর ব্যক্তি হিংসা, বলি ও যজ্ঞের দ্বারা শক্তিশালী দেবতাদের প্রসন্ন করার জন্য স্তুতিগান গাইতেন। মহাভারতের যুগে বিচ্ছিন্ন হওয়া প্রাচীন বেদ ও নবীন শ্রুতিধরদের স্তুতিগান একত্রিত করে বেদব্যস বেদকে চার ভাগে বিভক্ত করে বেদ নির্মাণ করেন। বেদের পরবর্তীকালের স্তুতিগুলি থেকে স্পষ্ট

হয় যে এই সংস্কৃতির লোকেরা জাগতিক কামনা-বাসনা চরিতাথ' করার জন্য দৈবশক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল। বেদের ঋকগুলিতে ঋষভদেবের উল্লেখ থেকে এই বক্তব্যের প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়, যে ঋগ্বেদের রচনার পূর্বে শ্রমণ সংস্কৃতি একমাত্র প্রমূখ সংস্কৃতি ছিল। ঋগ্বেদ সংহিতা অধ্যয়ন করলে এক মনুষ্যজাতি আমাদের ধ্যান আকর্ষণ করে যারা সোনা মণিমুক্তা শোভিত ছিল,ব্যবসায়-বাণিজ্যে দক্ষ ছিল, যে রূপ ও সন্তানের জন্য গর্ব অনুভব করত, যে ধনী, যে ভোজন-বিলাসী, সে সম্পদ আহরণের জন্য সমুদ্রযাত্রা করত, কিন্তু তাঁরা ইন্দ্রকে মান্যতা দেন নাই। তাঁরা ছিলেন দেবহীন,যজ্ঞবিহীন, এবং দেব-নিন্দুক; যে জাতি ঋষিদের দান দিতেন না এবং তথাকথিত দেবস্তুতি বন্দনায় তারা আগ্রহী ছিলেন না।

ঋগ্বেদে ঐ সমৃদ্ধশালী মানুষেরা পণি(বণিক?) নামে পরিচিত। এই সমৃদ্ধশালী পণি থেকেই সম্ভবত : আমাদের প্রাচীনমুদ্রার নাম পণ এবং বাণিজ্য সম্ভারের নাম পণ্য হয়েছে। এইসব থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় প্রাচীন যুগে মুদ্রা নির্মাণের জন্য তাম্রধাতুর আবশ্যকতা ছিল যা এঁদের আয়ত্বে ছিল। ভারতবর্ষের তৎকালীন অর্থব্যবস্থায় এই মুদ্রার অত্যাধিক গুরুত্ব ছিল, কারণ ধাতুর অধিকারী লোকেরা সমাজে কৃষি-নির্ভর লোকেদের চেয়ে অধিকতর সমৃদ্ধ ও সম্পন্ন ছিল। পণিদের মূল নিবাস স্থান সম্বন্ধে ঋগ্বেদ থেকে জানা যায় যে, তাঁরা ছিলেন সপ্তসিন্ধু অঞ্চলের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত প্রাচ্যের কোন নাব্যঅঞ্চলের বাসিন্দা। এই প্রাচ্যদেশ বলতে আমরা সম্মিলিতভাবে বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যাকে বুঝি, ঋগ্বেদে প্রায় প্রত্যেক মুনি-ঋষিগণের স্তোত্রে পণিদের উল্লেখ পাওয়া যায়;এমনকি এদের পরাভূত করার উদ্দেশ্যে ঋগ্বেদে স্তোত্র রচনা করে গাওয়া হত।

এই সকল আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় ঋগ্বেদের রচনা কালের বহু পূর্ব থেকেই এই দেশে এক অতি উন্নতিশীল সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ-ঘটে ছিল, যা ছিল যজ্ঞ বিরোধী, যা অতি প্রাচীন নির্গ্রন্থ ধর্মের (যা বস্তুত: যজ্ঞ এবং হিংসা বিরোধী এবং যেখানে দেবতাদের বিশেষ কোন ভূমিকা নেই) সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করা হয়। নির্গ্রন্থ ধর্ম যাগযজ্ঞের বিরোধী এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অস্তিত্ব তাতে স্বীকৃত নয়।

অথর্ববেদে ব্রাত্যজনজাতির প্রিয় আবাস ভূমি পূর্বদিকেই বলা হয়েছে :

বৃহতশ্চ বৈস রথন্তরস্য চাদিত্যানং চ বিশ্বেষাং
চ দেবানাং প্রিয়ং ধাম ভবতি তস্য প্রাচ্যাং দিশি।। ৪।।

এই শ্লোকে পূর্বদিকে আপন প্রিয় ধাম গঠন করা ব্যাক্তিগণ, বৃহৎ রথারূঢ়

সূর্যদেব ও দেবতাদের প্রিয় ব্রাত্যজনদের সম্মান করা হয়েছে।

জৈনেতর গ্রন্থাদিতে প্রাচ্যদেশে ব্রাহ্মণদের যাতায়াত নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল, কারণ এই দেশ শ্রমণ-সংস্কৃতির প্রভাবাধীন ছিল। বঙ্গদেশ ঐ সময় এমন এক আয়নার মত অবস্থায় ছিল যার সামনে দাঁড়ালে যতই বস্ত্র পরিধান করে আসুক তার প্রকৃত স্বরূপ খোলাসা হয়ে যেত,অর্থাৎ জ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের আসল পরিধির গভীরতা পরিস্ফুট হয়ে যেত। এই যাদু আয়নার সামনে বস্ত্রপরিধান করে গেলেও বস্ত্রবিহীন দশা বা আপনার প্রকৃত স্বরূপ প্রতিফলিত হওয়ায় আশংকায় ব্রাহ্মণদের ওখানে (প্রাচ্যদেশে) যাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষিত করে শাস্ত্র রচিত হয়েছিল। বৈদিক ব্রাহ্মণদের এই প্রাচ্যদেশের অধিবাসীদের প্রতি মনোভাব বিদ্বেষপূর্ণ ছিল। ঋগ্বেদে বর্ণনা করা হয়েছে যে "ঋষিদের প্রতি দ্বেষ পোষণকারী লোকেদেরকে শত্রু হিসেবে বিবেচনা করতে হবে, যারা বেদবর্হির্ভূত ব্রত উদযাপন করে থাকে তাদের দন্ড দেওয়া হোক, যজ্ঞহীন লোকেদের সম্পদ হরণ করে , যজ্ঞকারী গণকে দেওয়া হোক"। ব্রাত্য, শ্রমণ এবং নির্গ্রন্থ ধর্মের প্রভাব প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল যার প্রমাণ স্বয়ং ঋগ্বেদ। চতুর্থ শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত এই শ্রমণ সংস্কৃতি প্রভাব ক্ষুন্ন হতে শুরু করে। 'ব্রাত্যজন হঠাও শিবলিঙ্গ বানাও' এর প্রত্যক্ষ ছবি বাংলাতেই পাওয়া যায়।

আজকাল অনেক ইতিহাসচর্চাকারী ব্যক্তি তীর্থঙ্কর হোক বা না হোক সব দেবতার এক বা একাধিক স্ত্রীদেবীর সংযোজন কল্পনা করে থাকেন। এই প্রসঙ্গে লিপি, উপমা এবং কিংবদন্তীর বিষয় দেখা কিংবা পাঠ ইত্যাদি বড়ই পরিতাপের বিষয়। সঠিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে দেখার বা লিপিবদ্ধ করণের প্রয়াসে প্রয়াসী প্রকৃত ইতিহাসকারের সংখ্যা অত্যন্তবিরল। এই বঙ্গভূমিতে একদিন তীর্থঙ্করদের পাদস্পর্শ ঘটেছিল এবং এখানে একদিন তীর্থঙ্করগণের বিহারের ফলে প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষজন উন্নতির শিখরে পৌঁছেছিলেন। কোথায় গেলেন সেই সকল মানুষজন, যাঁরা ছিলেন বণিক, ব্যাপারী, ব্রাত্যক্ষত্রিয়, যাঁরা অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় ছিলেন, এবং সঠিক মার্গদর্শন অনুসরণ করে নিজের পুরুষার্থ অক্ষুন্ন রেখে জীবন অতিবাহিত করতেন? সপ্তম শতাব্দী থেকে বাংলায় কী এমন বিশৃঙ্খলা ও বিভাজন শুরু হয়েছিল যা এখন বিচার বিবেচনার অধীন?

সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার পরে মহাকাব্যের (রামায়ণ ও মহাভারত) কালের সময় নির্ধারণ করা যেতে পারে, কারণ এই দুটি মহাকাব্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা কোন লিপি কিংবা নিদর্শন সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া যায় নি। মহাভারতের ভীষ্ম পর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, কেমন ভাবে কুরুক্ষেত্রের

যুদ্ধে বাংলার রাজন্যবর্গ কৌরবদের পক্ষে অনেক পরাক্রমের সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

'There is a description of the encounter between the Pandus and the mighty ruler of the Vangas. while some of the Bengali kings fought on elephants, other rode on ocean bread steeds of the hue of the moon'.

[বঙ্গের পরাক্রমশালী রাজার সঙ্গে পাণ্ডুর বাহিনীর মধ্যে সংঘাতের বর্ণনা পাওয়া যায়। বঙ্গের অনেক নৃপতি গজারূঢ় হয়ে যেমন যুদ্ধ করেছিলেন,তেমনি অনেক সমুদ্রের ঢেউএর তলে চন্দ্রাতপের আলোয় অশ্বের মত জলপথেও যুদ্ধ করেছিলেন।] গৌড়ের রাজা পৌণ্ড্রক বাসুদেবের সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধেরও বর্ণনা পাওয়া যায়। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভাতে বাংলার তিন রাজকুমারের উপস্থিত থাকারও উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতে সমুদ্রতটবর্তী এলাকার লোকেদের ম্লেচ্ছ বলা হয়েছে, কারণ এই ক্ষেত্রের লোকেরা শ্রমণ সংস্কৃতি পরম্পরার অনুসারী ছিল। প্রাচীন শ্রমণ সংস্কৃতির দৃঢ় অবস্থানকে দুর্বল প্রতিপন্ন করার জন্য মুনির মর্য্যাদা ভ্রষ্ট ঋষিরা মহাকাব্যকে আপন দৃষ্টিভঙ্গীর মোড়কে আবিষ্ট করে পুনরায় প্রচার করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে ডা: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এই উক্তি বিশেষ মহত্বপূর্ণ

'Myths and legends of Gods and heroes current among the Austrics and Dravidians, long attending the period of Aryan advent in India (1500 B.C.) appeared to have been rendered in the Aryan language in late and garbled or improved version according to themselves to Aryan Gods and heroes of the world and it is these myths and legends to Gods and sages we largely find in the Puranas" [প্রাচীনকালের তমসাবৃত কল্প কাহিনী ও কিংবদন্তী দেবতা ও বীরদের গাথা, যা অষ্ট্রিক এবং দ্রাবিড় গোষ্ঠীভুক্ত জন-জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল, আর্যদের এ দেশে আগমনের* অনেক পরে প্রায় ১৫০০ খ্রী: পূ: আর্যদের ভাষার অর্ন্তগত হয় এবং পরিবর্ধিত হয়ে আর্য-দেবতা ও বীরনায়কদের সর্বজনীন করা হয়, যা কিংবদন্তী ও কল্পকাহিনী হিসেবে পূরাণে পাওয়া যায়]

মহাভারতে বর্ণিত খরবট বা করবল তাম্রলিপ্তের সন্নিকটস্থ কোন নগর ছিল। ঐ সময় সুহ্মদেশ আজকের হাওড়া, বলা হয়ে থাকে। মহাভারতে বর্ণিত অঙ্গদেশের মধ্যে বঙ্গকেও ধরা হয়। মুর্শিদাবাদ জেলা তৎকালীন অঙ্গের অর্ন্তভুক্ত

হয়েছে ।

‘The Mahabharat states that Anga included -- Vanga, that is, the deltaic Bengal between the Bhagirathi in the west and the Meghna-Padma in the east; if this be true, then the Anga Vanga country included the whole of the Modern district of Murshidabad”.মহাভারতের উল্লেখ অনুসারে অঙ্গ দেশের অন্তর্গত ছিল বঙ্গদেশ। এই বঙ্গদেশ ছিল পশ্চিম ভাগীরথী ও পূর্বে মেঘনা-পদ্মার অন্তবর্তী বদ্বীপ অঞ্চল। এই যদি সঠিক হয় তবে অঙ্গ ও বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল বর্তমানকালের মুর্শিদাবাদ জেলা।]

তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ:

নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে ২৩ তম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ পরিভ্রমণ করেছিলেন । তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে যাত্রা করে কলিঙ্গে অবস্থান করার সময় কোপ কটক নামক স্থানে ধন্য নামে কোন এক গৃহস্থের আবাসে তিনি আহার গ্রহণ করেছিলেন। এই ঘটনা আনুমাণিক ৯০০ খ্রী: পূর্বাব্দের। ভগবান পার্শ্বনাথজীর নির্বাণ সাম্মেতশিখরে হয়েছিল, যা বঙ্গদেশের অত্যন্ত নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত। এই স্থান ২০ জন তীর্থঙ্করের নির্বাণভূমি বলে মান্য করা হয়। এপ্রসঙ্গে Dr. P.C. Das Gupta লিখেছেন, "Among other Tirthankaras Parsvanath and Neminath, before Mahavir, belonged to an age close to the threshold of history. It may be recalled that 20 of the 24 Tirthankaras from Rasabhanath to Mahavira attained their nirvana on the crest of the Sammeta Sikhara, i.e the mount of Parsvanatha in eastern India. Standing in a picturesque landscape of Hazaribagh district close to West Bengal the hill has both an idyllic and holy association. It is sacred to the Jainas."

-Jainism in Ancient Bengal, P.C.Das Gupta

ভগবান মহাবীরের সাধনাকালের সময় এই ভূমিতে বিহারকালীন সময়ে পার্শ্বনাথ সম্প্রদায়ের সাধুগণের ভ্রমণের উল্লেখ জৈনসাহিত্যে পাওয়া যায়, যা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, ২৩ তম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের প্রভাব উক্তঅঞ্চলে ব্যাপ্ত ছিল। বঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের সন্নিকটেই সম্মেতশিখর পাহাড়ে তাঁর নির্বাণ প্রাপ্তি ঘটেছিল। অতএব বঙ্গদেশে উনার বিচরণ সুনিশ্চিত ভাবে ঘটেছিল। পার্শ্বনাথ সম্প্রদায়ের সাধুদের সঙ্গে ভগবান মহাবীরের বাক্যালাপের বিশদ বর্ণনা ভগবতীসূত্র থেকেই পাওয়া যায়। ভগবান পার্শ্বনাথের উদ্দেশ্যে ভগবান মহাবীর বলেন—

" পাসেনং অরহয়া পুরিসাদানিক্রণং সাবাত্র লোএ
বুইয়ে অনইয়ে অনবদগ্নে পরিত্তে পরিবুডে"

"Arhat Parsva the most respected of men, ordained the sphere to be eternal, without a beginning and without an end......"

Bhagvati Sutra B K 5 Ch.I

বাংলাথেকে প্রাপ্ত প্রাচীনমূর্তিগুলির মধ্যে পার্শ্বনাথের মূর্তির সংখ্যা অধিক। বাংলায় রোগ এবং বিষ হরণকারী দেবতারূপে পার্শ্বনাথের বিষয়ে বিশ্বকোষ গ্রন্থে লেখা আছে যে উনি লোকহিতের জন্য দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করতেন। একবার তিনি পুণ্ড্রদেশে এসেছিলেন এবং পুণ্ড্রদেশ থেকে তাম্রলিপ্ত গিয়েছিলেন। দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চলে তুঙ্গিয়া নামে কোন এক প্রাচীন নগর ছিল, যেখানে পার্শ্বনাথ বেশ কয়েকবার এসেছিলেন। পরবর্তীকালে এখানে এক শ্রমণ সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। এই এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে অনেকের গোত্রের নামছিল পরশ যা একসময় বহুল প্রচলিত ছিল। পার্শ্বনাথ বাংলার সুন্দরবন,বিক্রমপুর তথা মানভূম অঞ্চলেও পরিভ্রমণ করেছিলেন।

" The Jaina religious head Parashnath himself is said to have preached Jainism in Sundarban, Vikrampur and Manbhum areas of Bengali."

-East Himalayan Culture, Ecology and People

ডঃ তপন চক্রবর্তী স্বীকার করেছেন যে বাংলায় পার্শ্বনাথের যা প্রবল প্রভাব ছিল তা অন্যকোন দেবতার ছিল না। স্বর্গীয় ড: তপন চক্রবর্তী তাঁর 'বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে জৈন ধর্ম ও সংস্কৃতি' গ্রন্থে এই বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন," বিশ্বকোষের ৩০২-৩০৩ পৃষ্ঠায় পার্শ্বনাথ সম্পর্কে লেখা হয়েছে-পরে তিনি বিশ্বের মঙ্গল কামনায় পুনরায় নানাদেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদিন ভ্রমণ করিতে করিতে পুণ্ড্র দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিছুদিন পরে তথা হইতে তাম্রলিপ্ত গমন করিলেন...। শিব, সুন্দর, সৌম্য ইত্যাদি পার্শ্বনাথের শিষ্য হইল। পার্শ্বনাথ সেখান হইতে ক্রমে নাগপুরীতে উপস্থিত হইয়া জনৈক ধনাঢ্য পণ্ডিত বন্ধু দত্ত নামক যুবককে বিবিধ ধর্মের উপদেশ দিলেন।"

উপরোক্ত তথ্যটি সম্ভবত: পরবর্তীকালের "পার্শ্বচরিত কথা ও কাব্য" থেকে বিশ্বকোষ সংগ্রহ করেছিল। এই তথ্যটি বাংলায় পার্শ্বনাথের ব্যাপক ভ্রমণ

ও সাংগঠনিক কার্য্যকলাপকেই প্রতিষ্ঠিত করে। শুধু জৈন বা অন্যান্য সাহিত্যের উল্লেখই নয় বাংলা ও বাঙ্গালী জাতির উপর পার্শ্বনাথের ব্যাপক প্রভাব থেকেও একথা প্রমাণিত হয়, পার্শ্বনাথের সঙ্গে এতদঞ্চলের মানুষদের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর ছিল। বিশেষ করে বর্ধমান, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার সীমান্ত অঞ্চলে পার্শ্বনাথ তথা পার্শ্বাস্পত্য সম্প্রদায়ের একটি বড় কেন্দ্র ছিল বলে মনে হয়। কাঁসাই ও কুমারী নদীর অববাহিকায় পুরুলিয়ার মানবাজার, পুঞ্চা থেকে বাঁকুড়ার রাণীবাঁধ, খাতড়া, রাইপুর এবং মেদিনীপুরের বিনপুর জামবনি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় পার্শ্বস্পত্য সম্প্রদায়ের বৃহৎ কেন্দ্র ছিল, একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। এখানকার স্থাননাম এবং প্রাপ্ত মূর্তি ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করলে পার্শ্বনাথের কথাই মনে আসে। এখানে পরেশনাথ নামে একটি গ্রামই রয়েছে, যেখানে বহু জৈন মূর্তি ও মন্দির পাওয়া গিয়েছে, তাছাড়া অম্বিকানগর, পাকবিড়রা, ডাইনটিকরি, জামবনী, বিনপুর, রাইপুর, দেউলভেড়া ইত্যাদি প্রায় সব জায়গা থেকেই পার্শ্বনাথ ও অন্যান্য তীর্থঙ্কর ও জৈন শাসকদের দেব-দেবীদের মূর্তি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়েছে।"

"প্রাচীন বাংলার এই অঞ্চলটি তুঙ্গভূম নামে পরিচিত। আমরা ভগবতীসূত্রে একটি প্রাচীন নগরের নাম পাই যার নাম তুঙ্গিয়া। যেখানে পর্শ্বনাথ প্রায়শই যেতেন। এইস্থান পরবর্তীকালে পার্শ্বপত্যদের একটি বড় কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। ভগবতীর বর্ণনা মতো যদিও স্থানটি রাজগৃহের কাছে কিন্তু এই বর্ণনায় কিছু ভুল আছে বলেই মনে হয়। কারণ পরবর্তীকালে জিন-প্রভ-সূরী তার বিবিধ তীর্থকল্পে তুঙ্গীয় বঙ্গদেশে অবস্থিত বলে বর্ণনা করেছেন। দশম শতকে লেখা স্বয়ংভুর "পয়ুসচরিউ" গ্রন্থে 'তুঙ্গ বিষয়' নামেও একটি অঞ্চলের নাম পাওয়া যায়, এবং 'তুঙ্গিকারণ' নামে একটি প্রাচীন গোত্রও রয়েছে। ভদ্রবাহুর গুরু যশোভদ্র ঐ গোত্রের। এই গোত্র নামের উল্লেখ আমরা মথুরা লেখেও পাই। তাই মনে হয় তুঙ্গীয়া, তুঙ্গ বিষয় ইত্যাদি পৃথক পৃথক স্থান হতে পারে । তার মধ্যে পর্শ্বনাথের কেন্দ্র বলে পরিচিত স্থানটি বাংলার এই পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদনীপুর সীমান্তে বলেই মনে হয় বিশেষকরে পরেশনাথ অম্বিকানগর অঞ্চলটি।"

পার্শ্বনাথের প্রভাব স্থান-নামে, গোত্র-নামে (ভুমিজদের একটি গোত্রের নাম পরশা), ব্যক্তিনামে এমনভাবে বাংলার সর্বত্র ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যে কোন ধর্মীয় দেবতা তথা ধর্মপ্রবর্তক তাঁর মত প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। বিশেষভাবে আদিবাসীদের মধ্যে তার প্রভাব অসামান্য। বহু পার্শ্বনাথ মূর্তি লোকদেবতায় পরিণত হয়ে নানা নামে আজও আদিবাসী ও তথাকথিত নিম্নবর্ণের

মানুষের দ্বারা গ্রামে গ্রামে পূজিত হচ্ছে। শুধু পার্শ্বনাথই নয় পরবর্তীকালে পার্শ্বনাথের শাসনদেবী পদ্মাবতী ও প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে। বাংলায় পার্শ্বনাথের প্রতিপত্তির একটা বড় কারণ হলো রোগ ও বিষ-হরণ-কারী দেবতা হিসেবে পার্শ্বনাথের প্রতিষ্ঠা। এই লোকবিশ্বাসের কারণেই পার্শ্বনাথ সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয় হয়েছে।

— তপন চক্রবর্তী

তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের নির্বাণ এই বাংলার অত্যন্ত নিকটবর্তী সীমান্তে ঘটেছিল যা বাংলায় জৈনধর্মের ব্যাপক প্রসারের প্রাচীনতাকেই এক অকাট্য প্রমাণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয়। পার্শ্বনাথের শাসনদেবী পদ্মাবতীরও এখানে অনেক মান্যতা দেওয়া হয়ে থাকে; যে কারণে গঙ্গার এক ধারার নাম পদ্মা।

গঙ্গানদীর দুটি শাখা ভাগীরথী এবং পদ্মা বাংলার সম্পদ ও সমৃদ্ধির প্রতীক। সগর রাজার পৌত্র ভগীরথের নামানুসারে গঙ্গার পশ্চিমী ধারার নাম ভাগীরথী বলা হয়, কারণ এই গঙ্গার জল ধারার প্রবাহের কারণে সগর রাজার পুত্রগণের মুক্তিলাভ ঘটেছিল। এই থেকে এই বিশ্বাস প্রচলিত হল যে ভাগীরথীর জলস্পর্শে সকল পাপের বিনাশ ঘটবে এবং মোক্ষ প্রাপ্তি হবে। সুতরাং ভাগীরথীকে এক পূণ্যসলিলা নদী হিসেবে মান্যতা দেওয়া হতে থাকে; পরে নদীকে দেবতা হিসেবে মান্য করা হয়। গঙ্গার পূর্বদিকের প্রবাহপথ পদ্মা নামে প্রসিদ্ধ, যা বাংলার বৃহত্তম নদী। এতদসত্ত্বেও এই নদীকে পাপপ্রবাহিনী তথা কীর্তিনাশা বলে আখ্যায়িত করা হয়। কবি কৃত্তিবাসের,উক্তি অনুযায়ী পদ্মার জলের স্পর্শে মুক্তি পাওয়া যায় না, কারণ এর জল অপবিত্র। পদ্মাবতীর প্রতি হিন্দুসমাজের অশ্রদ্ধার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কবি বলেছেন, স্বর্গ থেকে মর্ত্যে অবতরণ করার পরে গঙ্গার নাম পদ্মা রাখেন পদ্ম নামে জনৈক জৈনমুণি এবং তিনি গঙ্গাকে পূর্বদিশায় প্রবাহিত হওয়ার দিগনির্দেশ করেন। অল্পসময়ের পর গঙ্গাদেবী নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং ভগীরথকে অনুসরণ করার জন্য দক্ষিণবাহিনী হয়ে যান। এর পর তিনি পদ্মাকে অভিশাপ দেন যে পদ্মার জলে কারুর মুক্তি ঘটবে না। এই পঙক্তিটি এই প্রকার :

কন্ডোরের প্রতিগঙ্গা মুক্তিপদ দিয়া।
গৌড়ের নিকট গঙ্গা মিলিল আসিয়া।।
পদমনামে এক মুনি পূর্বমুখে যায়।

ভগীরথ বলি গঙ্গা পশ্চাৎ গোড়ায়।।
পূর্ব্বদিকে যাইতে আমার নাহি পথ।।
পদমমুনি লয়ে গেল নাম পদ্মাবতী।
ভগীরথ সংগেতে চলিল ভাগীরথী।।
শাপবাণী সুরধুনী দিলেন পদ্মারে।
মুক্তি কেহ তব নীরে পাবে না সংসারে।।

কবি কৃত্তিবাস যে পদ্ম মুণির কথা উল্লেখ করেছেন উক্ত নামে কোন হিন্দু দেবতা বা ঋষির নাম পাওয়া যায় না। বরং জৈন তীর্থঙ্করদের মধ্যে পদ্মপ্রভ ষষ্ঠ তীর্থঙ্কর ছিলেন, যাঁর জন্ম হয়েছিল কৌশাম্বীতে এবং যার লাঞ্ছন বা প্রতীক ছিল রক্তকমল। পদ্মপ্রভ অতিপ্রাচীনকাল থেকেই বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তাঁর কতিপয় মূর্তি এই বঙ্গদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে, যাতে পদ্মের চিহ্ন বর্তমান।

অন্য একটি ব্যখ্যানুসারে, ভগবান পার্শ্বনাথের শাসনদেবী পদ্মাবতী বাংলায় মনসা নামেও পরিচিতি লাভ করেছিল। মনসার নাম পদ্মাবতী কিভাবে হল এর বর্ণনা পদ্মপুরাণে পাওয়া যায়, যা থেকে জানা যায় পদ্মের বন বা ঝাড়ি থেকে এঁর উৎপত্তির কারণে ইনার নাম পদ্মাবতী। মনসা নাম হয় নাগরাজ থেকে। অর্থাৎ শিবের কন্যা মনসার জন্ম পদ্মের বন বা ঝাড়ি থেকে ঘটেছিল,যা থেকে পূর্ববঙ্গে মনসা পদ্মা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। প্রথমে সর্পদেবী মনসা অনার্য লোকেদের দ্বারা পূজিত হতেন এবং খুব সম্ভবত: তাঁরই নামানুসারে ভাগীরথীর পূর্বপ্রবাহের নাম পদ্মাবতী হয়েছে। ধীরে ধীরে হিন্দু সমাজে ইনি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেন। এতদ্সত্ত্বেও পদ্মাবতী অথবা পদ্মানদী ব্রাহ্মণদের শ্রদ্ধা ভক্তি কখনও অর্জন করতে পারেনি। পরন্তু: এই পদ্মাবতীকে কীর্তিনাশা নদী বলে নিন্দা করা হয়। যেভাবে সম্মেৎ শিখরের নাম ‘পারসনাথ পাহাড়’ ভগবান পার্শ্বনাথের নামানুসারে ধরা হয়, বর্দ্ধমান, বীরভূমি প্রভৃতি স্থানের নাম ভগবান মহাবীরের স্মৃতি থেকে সৃষ্ট, তেমনি পার্শ্বনাথের শাসনদেবী পদ্মাবতী বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধির উচ্চ শিখরে অবস্থিত। এইসব কারণের জন্য এখানকার আদি জনগোষ্ঠী নদীর নাম তাঁর নামের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা থেকে পদ্মাবতী রাখেন। বাংলার ইতিহাস লিখতে গিয়ে প্রফেসর শ্রী চিত্তরঞ্জন পাল মহাশয় তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধে এই বিষয়ে বিস্তর আলোকপাত করেছেন।

পাশ্চাত্য পন্ডিতগণের বিবরণ এবং জৈনগ্রন্থাদি থেকে আমরা জানতে

পারি, যে ছোটনাগপুরের পার্শ্বনাথ পাহাড়ের সন্নিকটে ভগবান মহাবীরের আগমণের বহু পূর্ব থেকে এখানে সরাক জাতির লোকেরা আপন বসতি স্থাপন করেছিলেন। ভগবান মহাবীর এই সকল স্থানে ছয় বছর সাধনার জন্য অতিবাহিত করেন।

শ্রী শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও উল্লেখ করেছেন যে, জৈন সূত্র গ্রন্থাদি (আচারাঙ্গ সূত্র,ভগবতীসূত্র ইত্যাদি) থেকে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় যে মহাবীরের অনেক আগে এখানে অনেক জৈন মুনি বা সন্ন্যাসীগণ ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এই সকল অঞ্চলে এসেছিলেন। এসব থেকে অনুমান করা যেতে পারে তাঁরা মহাবীরের পূর্ববর্তী তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের অনুগামী ছিলেন। এই অনুমান সত্য হলে এটা স্বীকার করতেই হয় যে, পার্শ্বনাথ মহাবীরের পূর্বে বাংলায় ধর্ম প্রচার করেছিলেন।

— 'বঙ্গাল সীমান্ত পর বসা সরাক সম্প্রদায়'।

আশ্চর্যের কথা এই যে অনেক ঐতিহাসিক জানেন, বলেন এবং লেখেন যে এই বঙ্গভূমিতে তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ এসেছিলেন, বর্দ্ধমান মহাবীর এসেছিলেন, কিন্তু তাঁদের কাছে যে বাংলার ইতিহাস আছে তার ঐতিহাসিক মান্যতা কেবল সপ্তম শতাব্দী থেকে । খ্রী: পূ: ষষ্ঠশতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় সপ্তমশতাব্দী পর্যন্ত প্রায় ১১শত বৎসরের বঙ্গদেশের ইতিহাস কিভাবে অতিবাহিত হয়েছিল,এর সম্যক ধারণা পেতে হলে এবং এই দেশের ইতিহাস জানতে হলে এখানকার জন-জাতির সাংস্কৃতিক পরম্পরা রীতি-নীতি, চালচলন, এককথায় জীবন-চর্যা বুঝতে পারলে ঐ সময়ের ইতিহাস সহজেই অনুমিত হয়। খ্রী:সপ্তম শতাব্দীর শুরু থেকেই জৈন সংস্কৃতির বিলোপ ঘটানোর প্রক্রিয়া শুরু। এই থেকে অনুমান করা যায়, সপ্তম শতাব্দী থেকে ক্রমবদ্ধ ইতিহাসের পাতায় জৈন-সংস্কৃতি পরম্পরার ক্রমাগত হারিয়ে যাওয়াও শুরু হয়েছিল। একথা ইতিহাস স্বীকৃত, বঙ্গদেশের এক বৃহদংশ খ্রী: পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারের অধিকারে এসেছিল, যার মধ্যে ছিল বাংলার রাঢ় ভূমি।

"Bimbisara, the first known Imperial monarch of Magadha, conquered Anga and probably retained some form of control over Radha, included in Anga."

-M.G. Pg-29

ভগবান মহাবীর

ভগবান মহাবীর এর জীবনী প্রসঙ্গের পরিচয় বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে পাওয়া, যার মধ্যে অন্যতম হল কল্পসূত্র, ভগবতী সূত্র এবং আচারাঙ্গ সূত্র। কল্পসূত্রে রাঢ় দেশের পুণ্যভূমিতে তাঁর নয়টি বর্ষাবাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভগবতীসূত্রানুসারে বজ্জভূমিতে পুণ্যক্ষেত্রে ভগবান মহাবীরের ষষ্ঠ বর্ষাবাস উদ্‌যাপিত হয়েছিল। বর্দ্ধমান, বীরভূম ইত্যাদি নামাঙ্কিত ভূমির নামে তাঁর স্মৃতি আজও অক্ষুন্ন রয়েছে। আচারাঙ্গ সূত্রানুসারে মহাবীর রাঢ়দেশের কঙ্করময় ভূমিতে অনেক বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছিলেন।

"At the dawn of the history, part of the district as now constitued appears to have been included in the tract of the country known as 'Rarh' and part in the tract called Vajjabhumi. The traditions of the Jains state that Mahavira, their last great Tirthankara,wandered through these two tracts in the 5th Century B.C and the description of them would seem to show that the eastern part of the district with its alluvial soil, well watered by rivers formed part of Rarh while the wilder and more rugged country to the west was aptly known as Vajiabhumi i.e.the country of thunderbolt."

-Bengal Gazettears

[ইতিহাসের প্রারম্ভে এই জেলার অংশ বিশেষ এখন যেমন সংগঠিত হয়েছে, রাঢ় অঞ্চলের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত রয়েছে যা বজ্জ বা বজ্রভূমি নামে পরিচিত। জৈনসংস্কৃতির পরম্পরা অনুযায়ী শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর এই সকল জায়গায় পঞ্চম খ্রী:পূ: পরিভ্রমণ করতেন, এবং জৈন শাস্ত্রগ্রন্থের বর্ণনানুসারে জেলার পূর্বে পলিমাটি বেষ্ঠিত ও নদীজলধারায় সেচ সেবিত অঞ্চলও এই রাঢ়দেশের অর্ন্তগত ছিল। অপরদিকে জঙ্গলাকীর্ণ ঊষর অঞ্চল যা জেলার পশ্চিমাংশে অবশিষ্ট তা বজ্জ (বজ্র) ভূমি বা বজ্রপাতের ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত।]

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও লিখেছেন:

"The first recorded contact of Bengal With jainism was marred by incidents which reflect great discredit on her people. We learn from the Acaranga Sutra that when Mahavir as a naked mendicant in Ladha (ie Radha or western part of undivided Bengal through its two divisions known as Vajjabhum and Subbhabhumi he was attacked by the people who even went to the length of setting dogs upon him".

-R.C Majumdar.

[প্রথম লিখিত বিবরণ অনুযায়ী বাংলায় জৈনধর্মের বিস্তারে বাধাদানের ঘটনা ঘটেছিল, যার দ্বারা বাংলার মানুষদের মুখ উজ্জ্বল হয়না। আচারাঙ্গ সূত্র থেকে আমরা জানতে পারি, যখন মহাবীর বস্ত্রহীন অবস্থায় রাঢ়ের (যা অবিভক্ত বঙ্গদেশের পশ্চিমাঞ্চল) দুটি বিভাগের মধ্যে যা বজ্রভূমি এবং সুক্ষ্ম ভূমি নামে পরিচিত, পরিভ্রমণ করতেন তখন তিনি স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। এই সব লোকেরা এমনকি মহাবীরের উদ্দেশ্যে কুকুর লেলিয়ে দিত।"

-রমেশচন্দ্র মজুমদার।

আচারাঙ্গসূত্রের নবম অধ্যায়ণের তৃতীয় উদ্দেশ অংশে লেখা আছে -

अह दुच्चरं लाटमचारी वज्जभूमियं सुब्भ भुमियं पंतं
सिच्चं सेविंसु, आसणगणि चेब पंताणि ।।२।।

অর্থাৎ- এখানে ভ্রমণ করা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু লাঢ় দেশের বজ্রভূমি এবং সুক্ষ্ম ভূমি- এই দুই প্রদেশেই ভগবান ভ্রমণ করতেন। ঐ সকল স্থানে অনেক উপদ্রব সহ্য করে জনমানব শূন্য জায়গায় কোন পরিত্যক্ত ঘরে ভগবান বিশ্রাম গ্রহণ করতেন।

लाढेहिं तस्सुवसग्गा बहवे जाणवया लुसिंसु,

अह लूह दैसिए भेत्ते, कुक्कुरा तत्थहिंसिंसुणि वइंसु ।। ३ ।।

অর্থাৎ রাঢ় দেশে পরিভ্রমণের সময় ভগবানকে উপসর্গ সহ্য করতে হয়েছে। তখনকার অধিবাসীরা ভগবানকে আঘাত করত, কুকুরকে লেলিয়ে দিয়ে তাঁকে

কামড় খাওয়ানো হত এবং তাঁর উপর ঢিল বর্ষিত হত।

णागी संगाम सीसे व पारए तत्थ से महावीरे
एवं वि तत्थ लाढेहिं अलद्धपुव्वी वि एगया गमो ।।৮।।

যেমন হস্তি যুদ্ধের অগ্রভাগে এগিয়ে গিয়ে শত্রুকে প্রহারপূর্বক শত্রুর উপর বিজয় হাসিল করে এগিয়ে যায়, তেমনি ভগবান মহাবীর স্বামীও রাঢ় দেশে সকলপ্রকার উপদ্রবকে পরাভূত করে ঐ দেশ অতিক্রম করেছিলেন। কোথাও একটু বিশ্রামের জন্য কোন গ্রামে তাঁর জায়গা হয়নি উনি তখন জঙ্গলে গিয়ে বৃক্ষতলে বিশ্রাম নিতেন।

আজীবক সম্প্রদায়ের গোশাল ভগবান মহাবীরের সঙ্গে সাথ দিয়ে রাঢ় প্রদেশে পরিভ্রমণ করেছিলেন। এই ঘটনার বর্ণনা আমরা ভগবতীসূত্র থেকেই পাই।

" तएणँ से गीसाले मंखलिपुत्ते हट्ठतुट्ठे ममं तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं चाव णमंसित्ता एवं वयासी-तुज्झे णं भंते ! मम धम्मायरिया, अहं पां तुज्झं अंतेवासी। तएणं अहं गोयमा ! गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स एयमट्ठं पडिसुणेमि। तएणं अहं गोयमा ! गोसालेणं मँखलिपुत्तेणं सद्धिं पणियभूमीए धव्वासाइं लाभं अलाभं सुखं दुक्खं सक्कारम सक्कारं पच्चणुब्भवमाणे अणिच्चजागरियं विहरित्था।"

ভগবতী সূত্র ২৫,৫ ৪ ३

অর্থাৎ: "মঙ্খলিপুত্র গোশালক আমার প্রতি সন্তুষ্ট ও প্রসন্ন হয়ে আমাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে নমস্কার জানিয়ে বললেন, " হে ভগবান! আপনি আমার ধর্মগুরু আর আমি আপনার শিষ্য"। হে গৌতম! আমি মঙ্খলিপুত্র গোশালকের এই বক্তব্যকে স্বীকার করেছি। এর পরে গৌতম! আমি মঙ্খলিপুত্র গোশালকের সঙ্গে আমার তপ:ভূমে ছয় বছর সকল লাভ-অলাভ, সুখ-দুখ,ভালোকাজ-মন্দকাজ ইত্যাদি বিষয়ে অনুভব করতে করতে (জগতের) অনিত্যতা বিষয়ে চিন্তা করতে করতে দিন অতিবাহিত করেছি।"

'ভারতের ইতিহাস' রচয়িতা ডা: রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও এই ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন।

The Bhagawati Sutra describes in detail how Gosala, after several unsuccessful attempts, was at last accepted as a

disciple by Mahavira at a place called Paniyabhumi. The story , put in the mouth of Mahavira then proceeds :

aham.....gosalenam....saddhim Paniayabhumi chawasaim viharithha. The normal meaning of the passage is that the two lived together at Paniya bhumi during the next six years. But this is in conflict with the statement in the Kalpa Sutra that Mahavira spent only one rainy season in Paniyabhumi. As according to the persistent Jaina tradition Mahavira led a wandering life except during the rainy season, the expression in the 'Bhagavati Sutra' evidently means that Mahavira and Gosala fixed their headquarters at Paniyabhumi, wandering about from place to place during the year, as described in detail, year by year by Jinadasa-

R.C Majumder : Jainism in Anceint Bengal.

ভগবান মহাবীর তাঁর নিজের তপস্যা ও সাধনার ক্ষেত্র হিসেবে বাংলার যে ভূমিখন্ডকে বেছে নিয়েছিলেন সেখানে অনেক মহত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। উনি এই অঞ্চলেই সাধনা করেছিলেন, সেখানে অনেক উপসর্গকে জয় করে আপনার অসীম করুণাধারায় অভিসিক্ত করে ওখানকার আদিবাসীদের মনে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তারের দ্বারা মানসিক পরিবর্তন ঘটাতে সফল হয়েছিলেন। ঐ অঞ্চলেই উনার দ্বিবদৃষ্টি লাভ ঘটে। আচার আচরণে অহিংসার ব্রত ও বিচার বিবেচনায় অনেকান্তের ভাবনা দৃঢ় ভাবে উনার মনে প্রতীতি জন্মেছিল।

আত্মার স্বতন্ত্রতা বিষয়ক জৈন দর্শন সম্পর্কে উনি যে প্রতিবেদন রেখেছেন এবং তা জীবন্ত প্রতীক রূপে আজও বিদ্যমান, এর প্রভাব কেবল পূর্বভারত নয়, সমগ্র দেশে এবং দেশের বাহিরেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

দীক্ষা গ্রহণের পর ভগবান মহাবীর দেওঘরের (আজকের বৈদ্যনাথধাম) নিকট মোরাক আশ্রমের কুলপতির আগ্রহে ঐখানে প্রথম চার্তুমাস অতিবাহিত করার জন্য এসেছিলেন। কিন্তু মাত্র ১৫ দিন অতিবাহিত করার পর তাঁকে চলে যেতে হয়। তাঁর স্বল্পকালীন এবং উনার কঠোর তপস্যার কারণে এই আশ্রম একটি পবিত্র স্থান হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠে। এই আশ্রমের নীচে এক ঝরণা থেকে ময়ূরাক্ষী নদীর উৎপত্তি। জামাতোড়ের নিকট অজয় নদীর তট বরাবর চলতে চলতে মহাবীরস্বামী মূল্যবান সুদৃশ্য বস্ত্র বিদীর্ণ করে সোম নামক এক

ব্রাহ্মণকে দান করেন। পথ চলতে চলতে প্রভু বীরভূম এবং বর্দ্ধমান জেলার সীমানায় অবস্থিত বোলপুরের নিকট বর্দ্ধমান গ্রামে যাকে পরে অস্থিকগ্রাম বলে বলা হয়ে থাকে, সেখানে আগমন করেন। এবং ওখানে শূলপাণি যক্ষ প্রভূর উপর অনেক উপসর্গ করে কিন্তু অবশেষে পরাস্ত হয়ে স্বয়ং প্রভূর কাছে আত্মসর্ম্পণ করে। পরে ঐ শূলপানি যক্ষ শূলপানি শিব নামে প্রসিদ্ধ হয়।

মঙ্গলকোটের কাছে প্রভূ অজয়নদী অতিক্রম করে বোলপুর প্রভৃতিস্থান ছড়িয়ে সুবর্ণবালুকা (ময়ূরাক্ষী নদীর দক্ষিণ প্রান্তে গিয়ে সিদ্ধেশ্বরী নদী পৌঁছানোর পর ধ্যানমগ্ন হয়ে যান। এই জায়গার নাম তাঁতলোই বলা হয়ে থাকে। ঐখানে কালকষ্ঠি পাথরে পার্শ্বনাথ স্বামীর একটি তিনফুট উচ্চ একটি ভগ্নমূর্তির অবশেষ রয়েছে যা প্রথমে বীরেশ্বর শিবের নামে প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু আজকাল একে তীর্থঙ্কর শিব বলে বলা হয়ে থাকে।

ওখান থেকে প্রভূ কনকখল আশ্রমের (জোগী পাহাড়ী) কাছাকাছি জায়গায় বিহার করেন। এখানে কোন পরদেশী রাজার রাজধানী সেয়াবিয়া অর্থাৎ বর্তমান সাঁইথিয়ার সন্নিকটে ছিল। ঐস্থানে চন্ডকৌশিক নামে একটি সর্পের উপসর্গ ঘটেছিল। এই পাহাড়ের নিকট কৌশিকা নামে একটি গ্রাম ছিল যাকে আজ ঊষকা বলা হয়। ঊষকা গ্রামের অধিবাসীদের কাছে উক্ত গ্রামের প্রাচীন ইতিহাসের বিষয়ে চন্ড কৌশিকের ঘটনার কথা বলতে শোনা যায়। প্রভূ নাগসেন নামে এক গৃহস্থের গৃহে নির্জলা উপবাস ব্রত পারণ করেছিলেন,পারণ করার সময় প্রভূকে পায়েস (চাউল ও ক্ষীরের মিশ্রণ) এবং চালের তৈরী পীঠা দেওয়া হয়। এই দুটি খাদ্য বাংলার ঘরে ঘরে আজও প্রচলিত। এখানে রাউতোড়ায় লালপাথরের তৈরী তিন কলামন্ডিত প্রাচীন মন্দিরের অবশেষ পাওয়া যায়।

রাউতোড়া থেকে বিহার করার সময় সোনারগড়ে যা আজও অঙ্গারগোড়ে বলা হয়ে থাকে, প্রভূ প্রবেশ করেছিলেন। ডা: নীহাররঞ্জন রায় তাঁর ‘বাঙালীর প্রাচীন ইতিহাস’ নামক গ্রন্থে রাঢ়দেশের সীমানা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন যে ‘দামোদর নদীর উত্তর পাড় থেকে মুঙ্গের পর্যন্ত ‘উত্তর রাঢ়’ (বজ্রভূমি) আর দামোদর নদীর দক্ষিণ তীর থেকে তমলুক পূর্ববঙ্গ পর্যন্ত ‘দক্ষিণ রাঢ়’ বলা হয়ে থাকে। বজ্রভূমি শব্দের প্রাকৃত রূপ বইরভূমি থেকে বীরভূমি, আর এর অপভ্রংশ বীরভূম’।

“রাজপ্রশ্নীয় সূত্রে” এই রাঢ় দেশকে কেকয়াধং দেশ অর্থাৎ অর্ধ আর্য অর্ধ অনার্য দেশ বলা হয়ে থাকে। এখানকার অনার্যশাসক রাজা পরদেশীর

রাজধানী ছিল সেয়ংবিয়া (সাঁইথিয়া) নগরী। নগরীর উত্তর-পূর্ব ঈশান কোণে এক সুগন্ধযুক্ত, শীতল ছায়ায় আচ্ছাদিত এক রম্য নন্দনকানন যা মৃগবন নামে পরিচিত, এক উদ্যান ছিল। সেয়ংবিয়ার সীমা বর্তমান কুণ্ডলগ্রাম থেকে ললিয়াপুর বাজার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এর নিকটেই ঈশান কোণে কোচরাজার দিঘি নামক এক বৃহৎ পুষ্করিণী ছিল। এই মৃগবণে শ্রমণ কেশীকুমার এসে অবস্থান করেন এবং তাঁর ধর্মোপদেশে প্রভাবিত হয়ে পরদেশী রাজার মন পরিবর্তন ঘটে এবং এখানে শ্রাবক ধর্মের বিস্তার ঘটে।

যখন রাজা পরদেশীর কানে ভগবান মহাবীরস্বামীর আগমনের সুসমাচার পৌঁছল তখন কাল বিলম্ব না করে তৎক্ষনাৎ রাজা তাঁর সৈন্যসামন্ত, নিজ পরিবারের লোকজন ও নগরবাসীগণকে সঙ্গে নিয়ে মহা সমারোহে নগরের বাইরে এসে পাঁচজন অনুগামী শিষ্যদ্বারাপরিবৃত ভগবানের সমীপে উপস্থিত হয়ে স্বাগত-বন্দনা করেন। ভগবানের এই পবিত্র পদার্পনের স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য তিনি রাজ্যের নাম পরিবর্তন করে ভগবানের আদরসূচক নাম বীরপ্রভুকে অনুসরণ করে বীরভূমি (বজ্রভূমি) নাম রাখেন। বীরভূম নামকরণ প্রসঙ্গে অনেক বিদ্বানই মহাবীর স্বামীর প্রভাবের বিষয়ে এই জনশ্রুতিকে মান্যতা দিয়ে থাকেন।

যে স্থানে প্রভুকে স্বাগত জানানো হয়েছিল ঐ স্বর্ণবালুকা নদীর তটবর্তী অঞ্চল অমলকপ্পা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। বর্তমান ঐ স্থান অমুয়া নামে পরিচিত। এক প্রাচীন অক্ষয় বটবৃক্ষ এখনও ঐ স্থানে বিদ্যমান এবং স্থানীয় লোকেরা বলে, তাদের পূর্বপুরুষদের মুখে তারা শুনেছে যে, এই বৃক্ষের নীচে এক মহান বালক সন্ন্যাসী বাবাকে ধূমধামসহকারে স্বাগত জানান হয়েছিল এবং ঐ সময় থেকে বৃক্ষমূলে আড়াই সের পরিমাণ ফাফড়া ও মিষ্টি প্রত্যেক বছর প্রত্যেক গ্রামবাসী নিবেদন করে আসছে। নদীর তটবর্তী নিম্নভূমি অঞ্চলে আজও কোন প্লাবনের প্রকোপ দেখা যায় নি। এই সকল আশ্চর্য ঘটনা বৃক্ষমূলে মিষ্টি ইত্যাদি নিবেদন করার পূণ্যফল বলে জনসাধারণের ধারণা আজও অটুট।

ভগবান মহাবীর প্রভূ সেয়ংবিয়া থেকে পরিভ্রমণ করেছিলেন। পথে পরদেশীরাজার অধীনস্থ পাঁচ করদ রাজা, যাঁরা পরদেশী রাজার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য চার চাকার রথে আরোহণ করে আসছিলেন তাঁরা প্রভুকে দেখা মাত্র অতিসত্ত্বর রথ থেকে অবতরণ করে প্রভুর পাঁচ অনুসরণকারী শিষ্যসহ প্রভুকে স্বাগত বন্দনা করেছিলেন। অতঃপর ঐ স্থানকে তীর্থভূমি বলে মান্য করা হয় এবং এই গ্রামের নাম বীরচন্দ্রপুর রাখা হয়। এই রাজার রাজ্য বার বর্গ ক্রোশ

দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, যার পরিধিকে চক্র বলা হয়ে থাকে এবং যা থেকে একচক্রা নামের উৎপত্তি। একচক্রা ও বীরচন্দ্রপুর দুটি স্থানই আজ বৈষ্ণব তীর্থে পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

বীরচন্দ্রপুর থেকে রাজগ্রামের পথ ধরে প্রভু মহাবীর স্বামী রাজগৃহের উদ্দেশ্যে বিহার করেছিলেন। 'বীরভূম বিবরণ' নামক পুস্তকের বিবরণ অনুযায়ী বীরভূম এবং বিহার সীমান্ত বরাবর রাজগ্রাম, জোগী গুফা আর বৈষ্ণবডাঙ্গার পাশ দিয়ে গঙ্গা নদী প্রবহমান ছিল। নদী পারাপারের জন্য প্রভু নৌকায় আরোহণ করলে পর নৌকার ডুবে যাওয়ার মত উপসর্গ দেখা দেয়। নদীর প্রবাহ ঐ স্থানের মাটিতে আংশিক আটকে যাওয়ার জন্য আজও ওখানে এক বিশাল জলাশয় দেখা যায়, যা বর্ষার সময় গঙ্গার জলধারার সঙ্গে মিশে যায়। উপসর্গের স্থান হওয়ার কারণে ঐ স্থানের মহত্বও বেড়ে যায় এবং বীরপ্রভূর নামানুসারে ঐ জলাশয়ের নাম তপস্বীবিল হয়ে যায়। উপসর্গকে সহ্য করে প্রভু নদী (তপস্বীবিল) অতিক্রম করে পথ চলতে শুরু করেন। কিছু সময় পরে পুষ্পক নামে এক ব্যক্তি, যিনি সামুদ্রিক জ্যোতিষ শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন, ঐ স্থানে উপস্থিত হন। নদীর তটভূমিতে মিহি ধূলোর উপর প্রভূর চক্র, ধ্বজা, মঙ্গল কলশ ইত্যাদি দূর্লভ চিহ্ন যুক্ত পদচ্ছাপ দেখে তিনি আশ্চর্যচকিত হয়ে যান। নিজের অধীত বিদ্যা দ্বারা পুষ্পক বুঝতে পারেন, এই চিহ্ন কোন সাধারণ ব্যক্তির নয়; অবশ্যই কোন চক্রবর্তী রাজার। পুষ্পক ভাবতে থাকে এমন মহান পুরুষ যাঁকে আজ একাকী মনে হচ্ছে, এঁর সাথে যদি কেউ সঙ্গ দিতে পারে তবে সে তার নিজের দরিদ্রতা চিরতরে দূর করতে পারবে। পদচিহ্ন অনুসরণ করতে করতে ঐ ব্যক্তি তাঁর ধরার জন্য অগ্রসর হলেন এবং শেষে এক অপরিগ্রহী সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পেয়ে নিরাশ হলেন। নিজের বিদ্যাকে নিষ্ফলা মনে করে ঐ ব্যক্তি যখন তাঁর সমস্ত পুস্তক জলে ফেলে দিতে উদ্যত হলেন তখন ঐ স্থানে শকেন্দ্র উপস্থিত হয়ে ঐ সন্ন্যাসীর প্রকৃত পরিচয় জ্ঞাপন করে পুষ্পককে ঐ কাজ থেকে বিরত করলেন এবং প্রচুর ধনরত্ন প্রদান করে তার মনোকামনা পূর্ণ করলেন। প্রভূকে ধরার চেষ্টার কারণে এই স্থানের (থুনাক সন্নিবেশ) নাম রাখা হয়েছিল পাকুড়। অতঃপর প্রভূ ঐ স্থান থেকে চলতে চলতে সুরভীপুরে (সাহেবগঞ্জ) তথা মোরাখ আশ্রমের নিকট মোহনতৌড় হতে দ্বিতীয় চার্তুমাস উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে রাজগৃহে উপস্থিত হন।

প্রভূমহাবীর স্বামী তৃতীয় চার্তুমাস চম্পাপুরীতে অতিবাহিত করেন। এরপর প্রভু আবার রাঢ়ভূমিতে বিহার করেছিলেন। এরপর প্রভু সাথী গোশালককে

নিয়ে কুমারগ্রাম যা কুমোরপুরে (কুমারিক সন্নিবেশ) শুভাগমন করেছিলেন। গ্রামের বাইরে সুরম্য নির্জন চম্পক উদ্যানে মহাবীর স্বামী কায়োৎসর্গ তপস্যা করেছিলেন। এরপর দুজনে মিলে চুরিচ্যা গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। এই জায়গার প্রাচীন নাম ছিল চৌরাক সন্নিবেশ। প্রভু এবং গোশালককে গুপ্তচর সন্দেহে পাহারাদাররা বন্দি করে এবং কৌশলে ওঁদের না দেখে হাত পা বেঁধে গর্তে নিক্ষেপ করার দণ্ড ঘোষণা করে। ঐ স্থান 'সন্ন্যাসীদের শূলী নামে আজও পরিচিত। ঐ সময় ঘটনাক্রমে ঐ গর্তের কাছাকাছি জায়গায় পার্শ্বনাথ পরম্পরার দুজন বয়স্কা স্বাধ্বী জয়ন্তী ও সীমা ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রভুকে দর্শন করার পর তাঁদের চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। স্বাধ্বীগণ নগরকোটালের নিকট গিয়ে প্রভু ও গোশালকের যথার্থ পরিচয় জ্ঞাপন করে দুজনের অতিশীঘ্র মুক্তির ব্যবস্থা করেন। নগরকোটাল লজ্জিত হয়ে প্রভুর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হন। অশ্রুবর্ষণের ঐ সিক্ত ভূমি আজও 'বুড়ী ঝুড়ী' নামে অভিহিত হয়ে আসছে এই অশ্রুধারা বিসর্জন স্থানের বিশেষ অলৌকিক গুণের একটি প্রবাদ উক্ত অঞ্চলে প্রচলিত। এখনও ক্রন্দনরত বাচ্চাদের কান্না থামানোর জন্য লোকেরা এই 'বুড়ীঝুড়ী' ঝরণার জলে বাচ্চার চোখ ধুইয়ে থাকে।

বীরভূমিতে এমন বহুস্থান আছে যেখানে প্রভুর সাধনাকালের বিবিধ স্মৃতি আজও বিদ্যমান। এই ক্ষেত্রের নাম প্রভুরই নাম থেকে বীরভূম হয়ে যায়।

বর্তমান বিহারের সাঁওতাল পরগণা, ধানবাদ, সিংহভূমি, হাজারীবাগ এবং মুঙ্গের জেলার কিছু অংশ রাঢ়দেশের অর্ন্তভুক্ত। আচারাঙ্গসূত্রে এই রাঢ়দেশকে বজ্রভূমি এবং সুহ্ম ভূমি এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ আচারাঙ্গসূত্রের সূত্রকারের সময় রাঢ়দেশের দক্ষিণ এবং উত্তরঅংশ যথাক্রমে বজ্রভূমি ও সুহ্ম ভূমি নামে পরিচিত ছিল। চীনা পরিব্রাজক হুয়েনসাং এই বজ্রভূমিকে 'বিজ্জ' বলে উল্লেখ করেছেন। অনেকে মনে করেন এই অঞ্চলে হীরা (বজ্র) ও উন্নতমানের কোয়ার্জ পাথর পাওয়া যেত। এই জন্য এই স্থানের নাম বজ্রভূমি বা বজ্জভূমি হয়েছে। এই বজ্জভূমি-বীরভূমি ভগবান মহাবীরের বিচরণ ভূমি হওয়ার গৌরব অর্জন করে সৌভাগ্যশালী। মহাবীরস্বামীর পাদস্পর্শে পবিত্র হয়ে এই ভূমি আজ পর্যন্ত বীরভূমি নামে নিজেকে পূণ্য ও ধন্য করে রেখেছে।

—আজকী যোগী পহাড়ী

কল্পসূত্র গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে ভগবান মহাবীর একটি বর্ষাবাস পণ্যভূমিতে উদ্‌যাপন করেছিলেন।

"তেণং কালেণং তেণং সমত্রণং সমণো ভগবং মহাবীরে অট্ঠিয় গামং নীসাএ্ পঠমং অন্তরাবাসে বাসাবাসং উবাগএ,। চম্পং চ পিট্ঠিচম্পং চ নীসাএ, তয়ো অন্তরাবাসে বাসাবাসং উবাগএ। বৈশালিং নগরং বানিয়গামং চ নীসাএ, দুবালস অন্তরাবাসে বাসাবাসং উবাগএ। রায়গিহং নগরং নালন্দং চ বাহিরিয়ং নীসাএ, চৌদ্দস অন্তরাবাসে বাসাবাসং উবাগএ। ছ মিহিলিয়া দো ভদ্দিয়াএ, এগং আলভিয়াএ, এগং সাবত্থীএ, (এগং পনীয়-ভূমিএ), এগং পাবাএ মজ্ঝিমাত্র হস্থি পালগস্স রন্নো রজ্জুসভাএ অপচ্ছিমং অন্তরাবাসং বাসাবাসং উবাগত্র।

কল্পসূত্র ।। ১২১।।

অর্থাৎ: 'ঐ কাল ও ঐসময় শ্রমণ ভগবান মহাবীর অস্থিক গ্রামে প্রথম বর্ষাবাস-চর্তুমাস উদ্‌যাপন করেন। চম্পানগরী ও পৃষ্ঠচম্পায় ভগবান তিনটি চার্তুমাস পালন করেন। বৈশালী নগরে এবং বাণিজ্য গ্রামে ভগবান বারটি চার্তুমাস পালন করেন। রাজগৃহ নগরে এবং তার বাহিরে নালিন্দ পাঠক (নালন্দা) স্থানে নিশ্রাতে ভগবান চৌদ্দটি চার্তুমাস পালন করেন। মিথিলা নগরে ছয়বার, ভদ্রিকা নগরে দুবার, আলম্বিকা নগরে একবার পণিতভূমি নামক অনার্যদেশে চার্তুমাস পালন করেছিলেন, এবং শেষ চার্তুমাস পালন করেন মধ্যপাবার রাজা হস্থিপালের কাছারিঘরে স্বাগত হয়ে।"

এই পণিত ভূমির অবস্থান কোথায় এই বিষয়ে হরিপ্রসাদ তেওয়ারী এবং নৃসিংহপ্রসাদ তেওয়ারী মহোদয়দের গবেষণা অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ। উনারা লাঢ় এবং পণীয় ভূমি একই অঞ্চল অথবা পণীয় ভূমি লাঢ় দেশের কোন বিশেষ অংশের নাম, এই ধারণা সম্বল করে পণীয় ভূমির খোঁজ এই বজ্জভূমি এবং সুহ্ম ভূমির মধ্যবর্তী অঞ্চলে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। তাঁরা সমস্ত রেভেনিউ সেটেলমেন্ট এর রেকর্ড অনুসন্ধান করেছেন, কিন্তু পণীয়ভূমির কোন উল্লেখ পান নাই। এরপর জিওলজিক্যাল সার্ভে ডিপার্টমেন্টের সমস্ত প্রাচীন রেকর্ড অনুসন্ধান করার পর তাঁরা এখানেই পণীয়ভূমির সন্ধান পান।

অজয় নদীর তটবর্তী বর্তমান বীরভূমির সন্নিকটে বর্দ্ধমান জেলার কয়লাখনি অঞ্চলের এক কয়লা স্তরের নাম পণীয়তি কয়লাস্তর। এটি কেবল জিওলজিক্যাল সার্ভের কাগজের মধ্যে আবদ্ধ নেই, স্থানীয় লোকজন আজও এই অঞ্চলকে পনিয়তি বলে অভিহিত করে থাকেন। এই অঞ্চলের এক ধরণের কয়লাখনি এবং একপ্রকার বর্ক সাপের নাম পনিয়াতি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন কয়লা স্তরের ও বিভিন্ন নাম রয়েছে। প্রত্যেক কয়লা স্তরের নামকরণ ঐ এলাকার

কয়লাস্তরের যেখানে আরম্ভ হয়েছে সেই এলাকার গ্রামের নাম দিয়ে। কিন্তু পনিয়তি নামে কোন গ্রামের অথবা মৌজার বর্তমান নাম পাওয়া যায়না। এইজন্য এটি মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে এই অঞ্চলের নামের জন্য এই অঞ্চলের কয়লাস্তরের নাম পনিয়তি কয়লাস্তর হওয়া সম্ভব।

অজয় উপত্যকা অঞ্চলে যে কেবল এক কয়লাস্তরের নামে আজও পনিয়ভূমি অথবা পণিতভূমি নামে টিকে আছে তা নয়, একসময় সমগ্র পশ্চিম মুঙ্গের পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল এই নামে পরিচিতি ছিল। এই সকল অঞ্চলে আজও প্রাচীন শ্রাবকদের বংশধরেরা কয়েক পুরুষ ধরে বসবাস করে আসছে। রাঢ় দেশের এই বজ্জভূমির এই পনিয়তি বা পনিত ভূমি কে কেন্দ্র করে ভগবান মহাবীর তাঁর দীর্ঘ সাধনার ছয় ছয়টি বৎসর এই অঞ্চলের কোন না কোন অঞ্চলে ভ্রমণ করতে করতে কেবল জ্ঞান বা চরম জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তেওয়ারী ভ্রাতৃদ্বয়ের মতে ভগবান মহাবীরের কেবল জ্ঞান প্রাপ্তির স্থানও এই অঞ্চলেই ছিল। কল্পসূত্রে ভগবানের কেবল জ্ঞান প্রাপ্তির স্থানের বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়:-

‘तेरसमस्स संवच्छरस्स अंतरा वट्टमाणस्स जे से गिम्हाणं दीच्चे मासे चउत्थे पक्खे वइसाहसुद्धे तस्स णं वइसाहसुद्धस्स दसमीपक्खेणं पाईणगामिणीए छायाए पीरिसीए अभिनिवट्टाए पमाणपत्ताए सुव्वएणं दिवसेणं विजएणं मुहुत्तेणं जंभियगामस्स नगरस्स बहिया उजुवालियाए नईए तीरे वेयावत्तस्स चेईयस्स अदूरसामंते सामागस्स गाहावइस्स कट्ठकरणंसि सालपायवस्स अहे गोदोहियाए उक्कुडुयनिसिज्जाए आयावणाए आयावेमाणस्स छट्ठेणं भत्तेणं अपाणएणं हत्थुत्तराहिं नक्खत्तेणं जोगमुवागएणं झाणं तरियाए वट्टमाणस्स अणंते अनुत्तरे निव्वाधाए निरावरणे कसिणे पडिपुण्णे केवलवरनाणदंसणे समुप्पन्ने।। ২০২।।

-কল্পসুত্র।

অর্থাৎ : “ত্রয়োদশ বর্ষের মধ্যভাগে যখন গ্রীষ্ম ঋতুর দ্বিতীয় মাস, বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষ চতুর্থী ছিল, তখন বৈশাখ শুক্ল দশমীর দিন, যখন ছায়া পূর্বদিকে প্রলম্বিত হতে শুরু করেছে, এক প্রমাণ পৌরুষ আর্বিভূত হয়েছিল। ঐ সময় সুব্রত নামক দিবসে, এক বিজয় মুহূর্তে জৃম্ভিকা নামে একটি গ্রামের বাহিরে, ঋজু বালিকা নদীর কিনারে, জীর্ণোদ্ধারের অযোগ্য চৈত্যের অনতিদূরে, শ্যামাক নামে

এক গৃহস্থের খেতের মধ্যে, শাল বৃক্ষের নীচে, গোদোহিকা আসনে উৎকটরূপে আসীন অবস্থায়, প্রখর তাপ প্রবাহের মধ্যে তপস্যা রত অবস্থায়, ছয়দিন নির্জলা উপবাস দুবার করার পরে, ধ্যানমগ্ন ভগবানের হস্তোত্তরা (উত্তর ফাল্গুনী) নক্ষত্র যোগ আসার পর অনন্ত সর্বোৎকৃষ্ট, ব্যাঘাত রহিত, আবরণ রহিত, সমগ্র ও পরিপূর্ণ কেবল জ্ঞান এবং কেবল দর্শন উৎপন্ন হয়েছিল।"

কল্পসূত্রের রচয়িতা মহাবীরের কেবল জ্ঞান লাভের স্থানের নির্দেশ অনেক স্পষ্টরূপে দিয়েছেন, যার উপর গবেষণা করতে গিয়ে শ্রী হরিপ্রসাদ তিওয়ারী লিখেছেন :

"ভগবান মহাবীর রাঢ় দেশের বজ্জভূমি-পনিয়ভূমি অঞ্চলে পরিভ্রমণ কালীন সময়ে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এই কারণে একথা বলা যেতে পারে যে এ অঞ্চলে ঋজুপালিকা নদী প্রবাহিত ছিল যার উৎপত্তি এ অঞ্চলের কঠিন মালভূমি অঞ্চলেই ঘটেছিল। অতএব ঋজুপালিকার গতিপথের পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। ঋজুপালিকা আজও প্রবাহিত রয়েছে, তার এই পুরানো পথ ধরেই, তবে তার নাম পরিবর্তিত হয়েছে। প্রাচীন কালে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়ার জন্য বিশেষ করে পায়ে হেঁটে যেতে গেলে দুই প্রকার পথনির্দেশ মানা হত। এক ছিল রাজপথ অন্যটি ছিল নদীপথ। রাজপথ দিয়ে সাধারণত: সৈন্যসামন্ত এবং ব্যবসায়ী, বণিকগণ যাতায়াত করত। নদীপথে জলযান না চললেও নদীপথের নির্দেশিকা কে অনুসরণ করে নদীর কিনার বরাবর নিকটবর্তী অঞ্চলের রাস্তা ধরে যাতায়াত চলত। এই প্রকার নদীপথ তীর্থযাত্রী এবং সাধুসন্তগণের পক্ষে সুবিধা জনক পথ ছিল। কারণ, এর দ্বারা প্রথমত: রাজপথের ভীড় ও দণ্ডধারীদের অবাঞ্ছিত জিজ্ঞাসার ঝুঁকি এড়ানো যেত। দ্বিতীয়ত: এই ধরনের পথে জল পান করার সুবিধাও মিলত। তৃতীয়ত: রাস্তাভুলে গেলেও কোন চিন্তার কারণ থাকত না। চতুর্থত: নিশ্চিন্তে সাধন-ভজনের কাজও অব্যাহত থাকত। ভগবান মহাবীর যখন নালন্দা থেকে দুর্গম বজ্জভূমি অঞ্চলে পরিভ্রমণ করতেন তখনও নিশ্চয় তিনি কোন রাজপথের ভিড় এড়ানোর জন্য কোনো নদীর পাড় অবলম্বন করে যাত্রা করতেন এবং ঐ নদীর নাম ঋজুপলিকা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ভগবানের পনিয়ভূমি তথা রাঢ়ভূমিতে পরিভ্রমণের সময় যে সকল গ্রাম-নগরীর পরিচয় প্রাচীন জৈন গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায় উক্ত সকল স্থান এই নদীর নিকটবর্তী অঞ্চলেই হওয়া উচিৎ এবং ঐ নদীরও উৎসমুখ নালন্দার আশ-পাশ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।"

অনুসন্ধান করে দেখতে গিয়ে জানা যায় অজয় নদই এই পুণ্যসলিলা

ঋজুবালিকা বা ঋজুপালিকা নদী। ভগবান বজ্জভূমির যে যে স্থানগুলিতে পরিভ্রমণ করতেন সেই সকল স্থানের সন্নিকটে ছিল অজয় নদের অবস্থান,বিশেষকরে এই মালভূমির উষর উঁচুনীচু অঞ্চলের উপর দিয়ে এই নদ প্রবাহিত ছিল। এই কথা আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে যে ভগবান তাঁর কর্মক্ষেত্র রচনা করার জন্য এই প্রকার দুর্গম ভূমিতে এসেছিলেন, সমতল ভূমির শষ্যশ্যামল অঞ্চলে সুখে জীবন-যাপন করতে আসেন নি। ভগবতীসূত্রানুসারে উনি ছয় বৎসর পণিয়ভূমি অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেছিলেন। অতএব তাঁর কেবল জ্ঞান প্রাপ্তির ক্ষেত্র অজয়নদের তটবর্তী মালভূমি অঞ্চলেই হবে, কোন সমতল ক্ষেত্রে নয়।

অজয়নদ যেখানে বিহারের সীমান্ত ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে প্রবেশ করেছে ওখানে একটি গ্রাম পাওয়া যায়, যার নাম চিচুরবিল (সাঁওতাল পরগণা)। ওখান থেকে তিনমাইল নিম্নে (পুর্বদিকে) নদের অন্যপারে আরও একটি গ্রাম রয়েছে। এর নামও চিচুরবিল (বর্ধমান)। এমন কি হ'তে পারে না যে অজয়নদ একটি গ্রামকে দুভাগে ভাগ করেছে? কারণ দুটি গ্রামের অবস্থান পরস্পরের বিপরীতে। আর দুটি গ্রামের অবস্থান চিচুরবিলের যথেষ্ট দূরে। দুটি চিচুরবিল গ্রামে অজয়নদের বিল বর্তমান। বর্ষাকালে অজয়নদের দুটি বিল পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং সারাবছর বিলদুটিতে জল থাকে।

এই চিচুরবিল শব্দের উদ্ভব ঋজুর বিল কথা থেকে, অর্থাৎ, ঋজুবালিকা নদের নাম থেকে। ঋজু নদ থেকে উৎপন্ন বিলদুটি ক্রমশ: চিচুরবিল নামে পরিবর্তিত হয়ে যায়। ঋজুর বিল-চিচুরবিল। বিল শব্দের অর্থ হল গর্ত বা নিম্নভূমি, যেখানে জল বর্হিগমনের প্রনালী নেই। অত:পর ঋজুপালিকা নদের নাম পরিবর্তন হওয়ার পরেও নদ তটবর্তী দুচারটি গ্রাম আর নদ সংলগ্ন বিল নাম পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে আবর্তিত হওয়ার পরও ঋজুপলিকা নদী সম্পর্কের সাক্ষী হিসেবে এখনও বর্তমান।

ভাষাতত্বের দিকদিয়ে বিচার বিবেচনা করলে জানা যাবে, সাধারণ মানুষজনের 'ঋ' র উচ্চারণ 'উ', যেমন 'ঋষভ' নাম 'উষভ' বা 'উসহ' অনেক জায়গায় পাওয়া যায়। এই প্রকারে সংস্কৃত ভাষায় 'ঋজু' কে প্রাকৃত ভাষায় 'উজু' বলা হয়ে থাকে। বাংলার গ্রামাঞ্চলে 'ঋ' র জায়গায় 'উ' র উচ্চারণ খুবই সাধারণ ঘটনা। আজও গ্রামের লোকেরা 'রামপুর হাট'কে চলতি কথায় 'আমপুর হাট' বলে থাকে। অতএব 'ঋজু' থেকে 'উজু' এবং 'অজ' এবং অজ থেকে 'অজয়' নামের বিবর্তন খুব স্বাভাবিক বিষয়।

কল্পসূত্র কার এই (ঋজু পালিকা) নদীর সন্নিকটস্থ নগর বা গ্রামে (মহাবীর

স্বামীর) সিদ্ধভূমির স্থান নির্দেশ করেছেন। কল্পসূত্রানুসারে জম্ভীয় গ্রাম খুব ছোট গ্রাম ছিল না। রাঢ় দেশের বজ্জভূমি তথা পনিয়ভূমির শুষ্ক প্রান্তে ঋজুপালিকা নদের নিকটবর্তী গ্রামের অনতিদূরে কোন অঞ্চলেই হওয়া উচিৎ।

অজয় উপত্যকায় অবস্থিত পনিয়তি অথবা পনিয়ভূমির উপর পাওয়া যায় জম্ভীয় গ্রাম, বর্তমানে যার নাম জাম গ্রাম, যা ঋজুপালিকা (অজয় নদ) নদের সন্নিকটে গড় দিগম্বর (গড়দেমো) পাহাড়ের পাদদেশে, অবস্থিত, যা ঋজুরবিল (চিচুরবিল) গ্রামের চার মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। বস্তুত: জামগ্রামের তুলনা আজও কোন নগরের সঙ্গে করা যেতে পারে। আয়তনের দিক দিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বসতির সন্নিবেশ থেকে এবং বিভিন্ন মহল্লার অবস্থান থেকে এর প্রাচীনত্বের কারণে একে জামগ্রাম নগর বলা যেতে পারে। গ্রামটিকে দেখলে আজও একে চার পাঁচটি গ্রাম বলে ভ্রম উৎপাদন হবে, এবং এর একটি মহল থেকে অন্য মহলের দূরত্ব এক থেকে দুই মাইল হবে। গ্রামের আয়তন প্রায় ১৫-৩০ বর্গ কি:মি:,এবং এত বড় মৌজা অতদঞ্চলে বিরল। গ্রামের উত্তরে এক প্রাচীন মন্দিরের (দেবতা বিহীন) অস্তিত্ব এবং অন্য একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ জামগ্রামের প্রত্নভূমির অস্তিত্বের বিষয়ে আজও সাক্ষ্য বহন করছে। এই ধ্বংসাবশেষের উপর কিছুদিন পূর্বে কোনো এক গ্রামবাসী একটি ছোট শিব মন্দির নির্মাণ করে। মন্দিরে শিবলিঙ্গ বর্তমান, নাম সিদ্ধিনাথ। এই শিবলিঙ্গটি কোন সাধারণ শিবলিঙ্গ নয়, কিছুটা ভিন্ন ধরণের।

পরিত্যক্ত মন্দিরের অভ্যন্তরে দেওয়ালে প্রোথিত প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ লিপি এখনও বর্তমান। এই লিপির পাঠোদ্ধারের প্রচেষ্টা আজও অব্যাহত, তবে মন্দিরের গঠনশৈলী থেকে এর প্রাচীনত্বের প্রমাণ যথেষ্ট। অন্য মন্দিরটি, যার ধ্বংসাবশেষের উপর নতুন একটি মন্দির নির্মিত হয়েছে, সেটাই বৈয়াবৃত্ত চৈত্য।

জম্ভীয় গ্রাম থেকে মন্দির পর্যন্ত একটি কল্পিত সরল রেখা অঙ্কন করলে এবং তা সাথে সাথে উত্তর দিকে বৃদ্ধি করলে সামাগের কৃষিক্ষেত্র এবং উজুবালিয়া নদ পাওয়া যাবে, যা ওখানেই ছিল। এই মন্দির থেকে মাত্র ৫০ গজ উত্তর দিকে এগিয়ে গেলে উজুবালিয়ার উজ্জ্বল বালুকারাশির রজতশুভ্র স্রোতের উজ্জ্বল উপস্থিতি নজরে পড়বে। জম্ভীয় গ্রাম (বর্তমান জাম গ্রাম), এর উত্তরে পরিত্যক্ত মন্দির থেকে নদীর দূরত্ব প্রায় এক-দেড় মাইল। এক সময় এই নদী গড়দিগম্বর পাহাড়ের সন্নিকটে প্রবাহিত হত, যা পাহাড়ের উত্তরের পার্শ্বের খাড়া উঁচু অবস্থান দেখলেই বোঝা যায়। বর্তমাণে নদী নিজের উত্তর দিকের বিলগুলোকে গ্রাস করে

আরও উত্তরের দিকে সরে গেছে। এই মন্দির এবং নদীর মধ্যবর্তী এলাকার নাম সামাপুর, ওখানে কোনো গ্রাম নেই, কেবলমাত্র কৃষি ক্ষেত্র। সাঁওতাল জাতির লোকেরা এই অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল ৩০০ থেকে ৪০০ বছর আগে। এই কৃষিক্ষেত্র এর আগেও বর্তমান ছিল। কিন্তু এখানে কোন মানুষের বসবাস ছিল না। অতএব সামাগের কৃষিক্ষেত্র সামাপুর নাম নিয়ে আজও বর্তমান।

ইতিহাসের বর্ণনানুসারে দ্বাদশ শতাব্দীতে অজয় পাল নামে এক বিদ্বেষ মনোভাবাপন্ন অসহিষ্ণু রাজা ছিলেন, যিনি অনেক জৈন মন্দির এবং স্থান ধ্বংস করেছিলেন। রাজা অজয়পালের ধর্মান্ধতার চিহ্নস্বরূপ আজও অজয়নদের তটে ধর্মশিলার (ধর্মশিলা কিন্তু ধর্মঠাকুর নয়) শিলা-প্রাঙ্গনে পশুবলি প্রচলিত। গড় দিগম্বরপুরের (গড়দেমো) শীর্ষে বিশাল সমতল প্রাঙ্গণে-কুণ্ডেশ্বরের (ভগবান মহাবীরের ভগ্ন সিংহ লাঞ্ছনের সম্মুখে (বর্তমান কুণ্ডেশ্বর শিব) এখন প্রচলিত পশুবলি। অজয় উপত্যকার এলাকাতেঅজয়ের দুই তীরেই পশুবলির বহুল প্রচলন আজও দেখা যায়, সেখানে কোনো দেবতা থাক বা না থাক। আসলে জৈনধর্মের স্থানগুলিতে রাজা অজয়পালের ধর্মবিদ্বেষ নীতির কারণে এই ধরণের পশুবলির প্রচলন আজও অব্যাহত। "এই অনাচার ও অত্যাচারের ফল স্বরূপ ধীরে ধীরে এই দুর্গম অঞ্চলে জৈন তীর্থের সঙ্গে শ্রমণদের এবং শ্রাবকদের সঙ্গে শ্রমণ সংস্কৃতির যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। পবিত্র কেবল জ্ঞান প্রাপ্তির স্থান এবং অন্য তীর্থগুলির অবস্থান বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যায়। কিছু কিছু স্থানে অবশ্য ভগবান মহাবীর ব্রাহ্মণ সমাজের রক্ষণাবেক্ষণে ভৈরব নামে পরিবর্তিত হয়ে পূজিত হয়ে আসছেন।

-তিখোয়র সরাক বিশেষাঙ্ক

গোসালকের তেজোলেশ্যায় দগ্ধ হওয়া সর্বানুভূতি অনগার মহাবীরস্বামীর সাধন ক্ষেত্রের অধিবাসী ছিলেন, যা ভগবতীসূত্রে উল্লেখিত :

তেণং কালেণং তেণং সমত্রণং সমণস্স ভগবও মহাবীরস্স অন্তেবাসী পাঈণজাণবএ সব্বাণুভূঈ ণামং অণগারে পগইভ, জাব চিণীয়, ধম্মায় রিয়াণুরাগেণং ত্রয়ভট্ঠং অসদ্দহমাণে উট্ঠাএ উট্ঠেই, উ০ ২ উট্ঠিত্তা জেনেব গোসালে মংখলিপুত্তে তেণেব উবাগচ্ছই, তে০২ গচ্ছিত্তা গোসালং মংখলিপুত্তং এবং বয়াসী-জে বি তাব গোসালা...তত্র ণং সে গোসালে মংখলিপুত্তে সব্বাণুভূহং অণগারং ভবেণং তেপণং এগাহচ্চ কুডাহচ্চ ভাসরাসিং করিত্তা দোচ্চং পি সমণং ভগবন মহাবীরং উচ্চাবয়াহিং আউসণাহিং আউসই,জাব সুহং নত্থি।

-ভগ ০ শ ১৫/প্র ১০৪ ১০৬ পৃ. ৬৮১

অর্থাৎ : ঐ কালে ঐ সময়ে শ্রমন ভগবান মহাবীরের সঙ্গে জন্মসূত্রে পূর্বদেশের (অধিবাসী) সর্বানুভূতি অনগার অবস্থান করছিলেন। প্রকৃতিগতভাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র ও বিনয়ী মানুষ। নিজ ধর্মগুরুর প্রতি অনুরাগবশত: তিনি গোসালকের বচনের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে গোসালকের নিকট গিয়ে বলতে শুরু করেন,-হে গোসালক।....” সর্বানুভূতি অনগারের কথা শুনে গোসালক অত্যন্ত কূপিত হয়ে, নিজের তপতেজ দ্বারা অগ্নি প্রজ্জলন করে সর্বানুভূতি আনগারকে এক প্রহারে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিয়েছিল।

জৈন সাহিত্যে কোটিবর্ষে কিরাত রাজার বর্ণনা পাওয়া যায়: কোন এক সময় ভগবান মহাবীরের সময়ে বাংলার কোটিবর্ষের রাজা কিরাত বর্ণিক জিনদেবের সঙ্গে মূল্যবান রত্নের খোঁজে সাকেত (অযোধ্যা) এসেছিলেন, যেখানে তখন ভগবানের প্রবচনসভা চলছিল। তাঁরা তখন ভগবানের প্রবচন শুনতে লাগলেন, ভগবান তাঁর প্রবচনে বলেন, সংসারে রত্ন দুপ্রকার হয়, ভাবরত্ন এবং দ্রব্যরত্ন। সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক চারিত্র অর্থাৎ তত্ত্বশ্রদ্ধা,তত্ত্বের জ্ঞান আর এর অনুকূল আচরণ হল ভাবরত্ন। দ্রবরত্ন যতই মূল্যবান হোক না কেন এর প্রভাব এই জন্মে সীমাবদ্ধ, কিন্তু ভাবরত্নের প্রভাব অসীম, জন্ম জন্মান্তরে এর প্রভাবের ফল পাওয়া যায়। কিরাতরাজ ভগবানের প্রবচন শুনে ভগবানের নিকট ভাবরত্ন পাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে নিজের সকল ধনরত্ন, রাজ্য, ঐশ্বর্য ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন।

—আবশ্যক হরিভদ্রীয়বৃতি প: ৭১৫-৭১৬।

এখানে যে কোটিবর্ষ রাজ্যের কথা বলা হয়েছে এর বিষয়ে প্রসিদ্ধ ইতিহাসবিদ্ পন্ডিত শ্রী কল্যাণ বিজয়জী মহারাজ লিখেছেন যে মুর্শিদাবাদ জেলার ভাগীরথীর দক্ষিণ তটবর্তী অঞ্চলে যেখানে রাঙামাটি নগর অবস্থিত, যেখানে সপ্তম শতাব্দীতে বাংলার রাজধানী কর্ণসুবর্ণ অবস্থিত ছিল। ভগবান মহাবীরের সময়ে এখানে কর্ণসুবর্ণই অবস্থিত ছিল। ভগবান মহাবীরের সময়ে এখানে কর্ণসুবর্ণই কোটি বর্ষের নামে প্রসিদ্ধ ছিল, যা ছিল রাঢ় দেশের রাজধানী। জৈন সাহিত্যে রাঢ় দেশের গণনা সাড়ে পঁচিশ আর্যদেশ হিসেবে পরিগণিত হত। বিভিন্ন তীর্থ-কল্পের মধ্যে, বাংলার প্রমুখ তীর্থস্থান গুলির মধ্যে কোটিবর্ষের উল্লেখ পাওয়া যায়। টলেমীও কিরাত জনজাতির বিবরণ দিয়েছেন এবং চতুর গ্রাম মানে চট্টগ্রাম অঞ্চলে কিরাত জাতির প্রভাবের কথা বলেছেন। উনি কিরাত অর্থাৎ জাতকে বাংলায় ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন জাতির মধে সবচাইতে প্রাচীন এবং সবচাইতে

সংখ্যাধিক জাতিরূপে বর্ণনা করেছেন।

'The Kirrhadia of Ptolemy, a country mentioned also in the 'Periplus' as lying west from the month of the Ganges and the Skyritai of Megasthenes are Centons of Kirata, one of the branches of the orginal race the widest spread in Gangetic India, and the most anciently known."

- Ancient India.

বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন যুগে কিরাতজাতিকে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের সঙ্গে সম্বন্ধিত বলে বর্ণনা করেছেন। রামায়ণ অনুসারে-

'The Kiraatas with their hair down up in knots shining like gold and pleasant to look upon bold enough to move under water, terrible, veritable tiger men, so are they famed."

-East Himalayan Culture.

জিয়াগঞ্জের কিরাত আজিমবাগের মন্দির ও দাদাবাড়ীর স্থান, যা প্রথমে আজিমগঞ্জে ছিল গঙ্গার ভাঙ্গনের কারণে তা আজ নদীগর্ভে বিলীন, কিন্তু অন্য প্রান্তে জিয়াগঞ্জের দিকে তার অস্তিত্ব জেগে ওঠে। নিজের পুরাতন পরিচয়কে জীবন্ত রাখতে গিয়ে আজও একে লোকে কিরাতবাগের মন্দির বলে থাকে। আজিমগঞ্জ, জিয়াগঞ্জ, প্রভৃতি স্থান ভগবান মহাবীরের সময়ে কোটিবর্ষের মধ্যে অর্ন্তভূক্ত ছিল। এই সব কারণে কোটিবর্ষ তীর্থরূপে চিহ্নিত হয়েছিল, যার অস্তিত্ব চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত বহাল ছিল। নেপালের রাজগুরু শ্রী হেমচন্দ্র শর্মা তাঁর সুলিখিত 'কাশ্যপ সংহিতা'র ভূমিকার ১৩৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে কোটিবর্ষ বর্তমান কাটোয়া থেকে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সকল অঞ্চলে আজও একটি জাতির মানুষ বাস করেন যাঁরা রাতে কোন আহার গ্রহণ করেননা, জমির অভ্যন্তরে উৎপন্ন দ্রবাদি ব্যবহার করেননা। তাঁদের রীতি-ব্যবহার শ্রমণ সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ভাগীরথীর তীরবর্তী অঞ্চলে প্রাচীন নগর এবং মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় আজও পড়ে আছে। স্থানীয় লোকেরা ভাগীরথী নদীতে স্নান করার সময় ডুব দিতে গিয়ে অনেকসময় নদীতলে প্রথিত অনেক মূর্তির খোঁজ পেয়ে থাকেন। আমাদের পরিবারের কোন সদস্য এই ধরণের মূর্তির খোঁজ পেয়েছিলেন। ঐ সব অঞ্চলের কিছু লোক এই ধরণের মূর্তির সন্ধান করে বিদেশে অনেক অর্থ উপার্জনের জন্য পাচার করে থাকে। এইভাবে ঐ সকল লোক

নিজের দেশের প্রাচীন গৌরব নষ্ট করে জাতীয় অপরাধের কাজ করে চলেছে।

এই অঞ্চলের নিকটবর্তী অজিমগঞ্জের নিকটে কিরীটেশ্বরের মন্দির। মুর্শিদাবাদ শহরের বিপরীত দিশায় ভাগীরথীর পশ্চিমতটবর্তী অঞ্চলে ডাহাপাড়া, যেখানে একসময় অনেক সময় অট্টালিকায় সজ্জিত নগরের অস্তিত্ব ছিল, যা মুর্শিদাবাদের রাজধানীর অন্তর্গত, তার সাতক্রোশ পশ্চিমে কিরীটকোন নামে এক গ্রামের অবস্থান যা বাস্তবে তীর্থকোন ছিল। মেজর রেনেলের কাসিমবাজার দ্বীপের মানচিত্রেও তীর্থকোন নাম লেখা হয়েছে। যেভাবে কর্ণসুবর্ণের নাম কানা-সোনায় বদলে যায়, তেমনি তীর্থকোন ও কিরীটকোনায় বদলে যায়। আজও ওখানে ঘন জঙ্গল ও অনেক প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ রয়েছে যা কিরাত জাতির প্রাচীন গৌরব কোটিবর্ষ তীর্থের স্মৃতিকে জীবন্ত অবস্থায় ধরে রেখেছে। মূলমন্দিরের নিকটে আরও দুটি মন্দির রয়েছে যেখানে রয়েছে তীর্থঙ্কর বিমল নাথজীর লাঞ্ছন। অতএব, কিরীটেশ্বর ত্রয়োদশতম তীর্থঙ্কর শ্রী বিমলনাথ স্বামী। এই মন্দির গুপ্তযুগ পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল। ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধির পর এর মূল স্বরূপকে নষ্ট করে এর নতুন মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়েছিল এবং ধীরে ধীরে সপ্তম শতাব্দীতে শশাঙ্কের শাসনকালে যখন জৈন ধর্মাবলম্বীদের ঐ সকল স্থান থেকে পলায়ন করতে হয়েছিল, ঐ সময় ঐ স্থান সম্পূর্ণভাবে ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তির অধীনে চলে যায়। আজও বাংলার অনেক জায়গায় জৈনমূর্তিকে দেবতা রূপে বা ভৈরব রূপে পূজো করা হয়ে থাকে, যে বিষয়ে পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করা হবে।

প্রাচীন বৌদ্ধসাহিত্যে অঙ্গ বঙ্গ ও কলিঙ্গে গৌতম বুদ্ধ ধর্মপ্রচারে জন্য এসেছিলেন, এমন কোন উল্লেখ নেই, কিন্তু বৌদ্ধ সাহিত্য 'দিব্যবদান' তথা অশোকাবদানে একটি আখ্যান পাওয়া যায় যে, গৌতম বুদ্ধ তাঁর নিজ শিষ্য অনাথপিন্ডদের পুত্রী সুমঙ্গধার অনুরোধে তাঁর শ্বশুরালয়ের জৈন নির্গন্থদের অশুভ-প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য আকাশপথে পুন্ড্রবর্দ্ধন নগরে,আগমন করেছিলেন। এই ধরনের কাহিনীর কোন ঐতিহাসিক সারবত্তা নেই, উপরন্তু এখানে পঞ্চম ও ষষ্ঠ খ্রী: পূর্বাব্দে জৈন নিগ্রন্থ প্রভাবের বিষয় সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

"In the Divyavadana and the Asokavadana, there is a legend which states that the Buddha, on an urgent request of Sumagadha, daughter of Anathapindada, the marchant disciple of the Buddha arrived at Pundravardhana by an aerial route to

rescue her father-in-law's family from the evil influence of the sky-clad Nirganthas (jains)who were then most powerful in Pundravardhana."

-R.L.Mitra, Nepalese Buddhist Traditior,12 P.237.

পার্জিটর সাহেবের মতানুসারে পুণ্ড্র এবং পৌণ্ড্র আলাদা স্থান। গঙ্গার উত্তরাঞ্চলের নাম পুণ্ড্র, পৌণ্ড্রদেশ গঙ্গার দক্ষিণে বর্তমান বীরভূম জেলায়।

ভগবান মহাবীর কেবল একবার নয়, বারংবার এখানে এসেছিলেন, এমন বর্ণনা জৈনসাহিত্যে মজুত রয়েছে। ভগবতী সূত্রের যে ১৬ জনপদের বর্ণনার মধ্যে রয়েছে অঙ্গ, বঙ্গ তথা কলিঙ্গের নাম সবার উপরে।

The Jaina literature from the earliest time shows deep knowledge and intimacy of Bengal. Thus among other instances, the Bhagavati Sutra mentions Vanga as one of the 16 important Principalities, the Mahajanapadas, which flourished in India during the advent of Mahavira in the 6th century B.C.

'প্রজ্ঞাপনা' নামক পঞ্চম উপাঙ্গ গ্রন্থে ভারতবর্ষের আর্য-অধিবাসীগণকে নয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যেখানে ক্ষত্রিয়দের উল্লেখ করতে গিয়ে প্রথমে অঙ্গ, দ্বিতীয়ে বঙ্গ, তৃতীয় কলিঙ্গ এবং চতুর্থস্থানে রাঢ় ক্ষেত্রের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ্য বৈদিক সাহিত্যে এই ক্ষেত্রকে অনার্যভূমি বলে ঘোষণা করা হয়েছিল, কেননা এখানকার অধিবাসীগণ জৈনধর্মানুসারী ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় ছিল। বৌদ্ধ সাহিত্যেও এই ক্ষেত্রকে উপক্ষো করা হয়েছে, যদিও জৈন-সাহিত্যে এই অঞ্চলকে আর্যক্ষেত্র বলে মানা হয়েছে। বাস্তবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, এই অঞ্চলের আর্যীকরণ প্রক্রিয়ায় ভগবান ঋষভদেব থেকে সুরু করে ভগবান মহাবীর এবং তাঁদের শিষ্য-প্রশিষ্য পরম্পরার বিরাট অবদান রয়েছে। বর্দ্ধমান এবং বীরভূমের নামকরণ তীর্থঙ্কর ভগবান মহাবীরের নাম থেকেই প্রচলিত হয়েছে।

"Sir R.G Bhandarkar, the doyen of Indian Indologists was of the opinion that Bengal was brought within the Aryan fold as a result of proselytising activities of Mahavira, the last Tirthankara of Jainism and other Jainas,"

জৈনসাহিত্যে তাম্রলিপ্ত সহ অন্যান্ন বিশিষ্ট জনপদ :

তাম্রলিপ্ত :

ভগবান মহাবীরের পূর্বেও তাম্রলিপ্ত বাংলার এক গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্র বন্দর ছিল, যেখান থেকে মগধ সাম্রাজ্যের বাণিজ্য অন্যদেশের সঙ্গে প্রচলিত ছিল। ভগবতীসূত্রের বিভিন্ন স্থানে তাম্রলিপ্তির উল্লেখ পাওয়া যায়।

" In case of Tamralipta it is to be noted that at the famous port of Tamralipta live the Merchant Tamali Mangoputta,who became a Jaina recluse apparently in Mahavira's life-time-From the account of Bhagavati Sutra it is known that it was a famous centre of Jainism, and the devotees of Jainism probably inhabited in this place."

তাম্রলিপ্তির নাম সুবিখ্যাত ছিল সুদূর অতীতেও।

মহাভারতে 'ভীমের দিগ্বিজয়' বর্ণনা প্রসঙ্গে তাম্পলিপ্তির সঙ্গে কর্বট দেশেরও নাম পাওয়া যায়।

"তাম্রলিপিং চ রাজানং কর্বটাধিপতিংতথা,"

সভাপর্ব, ৩০ অধ্যায়, ২২৪।

বরাহমিহিরের 'বৃহৎসংহিতা'য়া লেখা রয়েছে-

"ব্যাঘ্রমুখ সুমহ কর্বট চান্দ্রষ্টপুরা":(১৪৫)

মার্কেন্ডয়পুরাণেও কর্বট শাসন নাম থেকে মানবাচলের পরে চন্দ্রশেখরের নাম।(৫৮,১১) এই থেকে অনুমেয় কর্বট সমূহ ক্ষেত্রগুলি তাম্রলিপ্তের অদূরেই ছিল। মেদিনীপুরের নিকটেই কর্বট দেশ।

"But some Jaina texts represent the allied peoples of Anga and Vanga in a good light. Sylvain Levi observes, "For the Jainas , Anga is almost a holyland. The Bhagavati places Anga

and Vanga at the head of a list of sixteen Janapadas, before the Magadha. One of the Upangas, the Prajnapana, classes Anga and Vanga in the first group of Arya peoples whom it calls the Ksatriyas". The list also includes Tamalitti, i.e.the people of Tamralipta in West Bengal (Radh). (P.C. Bagchi, Pro-Aryan and Pre-Dravidian in India (Calcutta,1929), P. 73) Pg.125

ঐতিহাসিক মাহাত্যবর্ণনাকারী শ্লোকগুলি বিশ্লেষণ করলে জানা যাবে,ভগবান মহাবীর আপন সাধনকালের অধিকাংশ সময় রাঢ় দেশের বজ্রভূমি ও পণিয়ভূমিতে অতিবাহিত করেছেন। অতএব, যে সকল স্থান তাঁর পবিত্র পাদস্পর্শে ধন্য হয়েছে তা রাঢ়ের এতদ অঞ্চলেই হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও বৌদ্ধ সূত্র থেকে কিছু দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, যা থেকে এই রাঢ় ভূমিতে নির্গ্রন্থ প্রভাব দৃঢ়ভাবে সুস্পষ্ট হয়। ভগবান মহাবীরের বিচরণক্ষেত্রগুলির মধ্যে প্রমুখ কিছু স্থানের পরিচয় এখানে দেওয়া হল।

অস্থিকগ্রাম : ভগবান মহাবীর গৃহত্যাগ করার পর সর্বপ্রথম অস্থিকগ্রাম বা অট্ঠীয় গ্রামে এসেছিলেন, যেখানে শূলপাণি যক্ষের মন্দির ছিল। বৈদ্যনাথ ধাম অথবা দেওঘর রাঢ়দেশের একমাত্র প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র যার সঙ্গে কেবল নাম বাদ দিলে অস্থিকগ্রামের শূলপাণি মন্দিরের পূরো সাদৃশ্য রয়েছে। অস্থিক শব্দটির অর্দ্ধমাগধী রূপ অট্টিয় । জৈন শাস্ত্রগুলিতে অস্থিক গ্রামকে অট্টিয় গ্রাম বলা হয়েছে । আশ্চর্যের বিষয় হলো দেওঘর এবং দেওঘর সন্নিহিত সাঁওতাল পরগণা জেলার এক বৃহৎ অংশ আজও আঠগাঁও পরগণার অন্তর্গত। আঠগাঁও অট্টিয় গ্রাম থেকেই উদ্ভূত। কালক্রমে শিবের নামানুসারে এবং এক দৈবস্থান রূপে এর নাম পরিবর্তিত হয়ে বৈদ্যনাথধাম বা দেওঘর হয়ে যায়। স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে এর সত্যতা প্রমাণিত । এছাড়াও রেভেনিউ ও সেটেলমেন্টের নথিতেও দেখা যায়, দেওঘর আটগাঁও পরগনার অর্ন্তগত। জম্ভীয় গ্রাম থেকে দেওঘরের দূরত্ব ৪০/৪২ মাইল এবং অজয়নদী দেওঘর থেকে ৪/৫ মাইল দূরে অবস্থিত ।

ব্রাহ্মণ গাঁও : জৈন শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ গ্রামের উল্লেখ রয়েছে। ওখানে পাঠক নন্দ উপানন্দ বাস করতেন। বর্তমানে ব্রাহ্মণ গ্রাম ব্রাহ্মণগাঁও নামে অজয়নদের তটবর্তী এক অঞ্চল; মধুপুর থেকে ১০-১২ মাইল পূর্বে সাঁওতাল পরগনায় অবস্থিত।

এটি একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম।

চম্পা: জামতাড়ার তিন মাইল পূর্বে সাঁওতাল পরগনায় অজয়নদের তটবর্তী স্থানে অবস্থিত। বর্তমান সময়েও এর নাম চম্পাপুর। জম্ভীয়গ্রামের পশ্চিমে ২৫-২৬ মাইল দূরে অবস্থিত।

পত্রকালয় (পত্তকালয়) : মধুপুরের সাতমাইল পূর্বে সাঁওতাল পরগনায় অজয়নদের তীরে অবস্থিত। বর্তমানে এর নাম পাতরোল।

নাঙ্গলা : অজয়নদ থেকে ৭ মাইল এবং জম্ভীয় গ্রামের পশ্চিমে ১৫-১৬ মাইল দূরে অবস্থিত। এর বর্তমান নাম নলা (নাঙ্গলী-নঙ্গলা-নংলা-নলা।)

পূর্ণকলশ : জামতাড়া থেকে ৩-৪ মাইল উত্তর-পূর্বে সাঁওতাল পরগনার অজয় নদের তটবর্তী অঞ্চল, যা জম্ভীয় গ্রাম থেকে ২৫-২৬ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত । বর্তমান এর নাম পূর্ণঘটী।

কলম্বুকা : লাদা গ্রামের বিপরীতে অজয় নদের উত্তরতট বাহী কলম্বুকা সাঁওতাল পরগনাতে অবস্থিত। মাঝে মাঝে ওখানে মেলা বসে এহং মেলাগুলোতে পশুবলি খুব জনপ্রিয়। এখানে কোন দেব-দেবীর উপস্থিতি নেই। এটি জম্ভীয় গ্রাম থেকে তিনমাইল উত্তরে অবস্থিত।

ভাদিয়া বা ভাদ্দিলা : বর্তমান নাম ভাদুলিয়া (বীরভূম)। জম্ভীয় গ্রাম থেকে ১২ মাইল উত্তর-পূর্বে অজয়নদ থেকে ৪-৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত।

কদলীসমাগম : কেঁদুলী বা কেন্দুলী যা একদা কদলী সমাগম ছিল। এখানে মেলাতে প্রচুর কলা আমদানী হতে দেখাযায়। এই অঞ্চলের অন্য কোন মেলাতে এত কলা বিক্রী হতে দেখা যায় না। বর্তমানে কেঁদুলী জয়দেবের কেঁন্দুলী রূপে প্রসিদ্ধ। বীরভূম জেলা অজয় তটবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। এটি জম্ভীয়গ্রাম থেকে ৩২ মাইল পূর্বে।

মরদনা : বর্তমানে মদনপুরা। জম্ভীয়গ্রাম থেকে ৩ মাইল পূর্বে এখানে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ বর্তমান। অজয় নদ থেকে ২ মাইল দক্ষিণে এবং জম্ভীয় গ্রাম থেকে ২ মাইল পূর্বে বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত।

জৈনসাহিত্যে তাম্রলিপ্ত সহ অন্যান্ন বিশিষ্ট জনপদ :

গৌভূমি: বর্তমান খাল ডাঙ্গা। সাঁওতাল পরগনায় অবস্থিত। জম্ভীয় গ্রাম থেকে ১২-১৩ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত।

সিদ্ধার্থপুর : বর্তমান নাম সিদ্ধপুর, জেলা বর্দ্ধমান। জম্ভীয় গ্রাম থেকে আটমাইল পূর্বে অজয়নদের তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। এখানে একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান।

ব্রজগ্রাম : এর বর্তমান নাম ব্রজডিহি। অজয়ের উত্তর তটবর্তী সিদ্ধপুরের বিপরীত বীরভূম জেলায় অবস্থিত।

কুমারপুর: কুমারডি। সিদ্ধপুর থেকে ৩ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে বর্ধমান জেলায় অবস্থিত।

মোঁটিয়াগ্রাম : বর্তমান মালডিহা অথবা মানডিয়া। সাঁওতাল পরগনার অজয়নদের তটবর্তী অঞ্চলে জম্ভীয় গ্রাম থেকে ৬-৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত।

শ্বেতাম্বিকা : শ্বেতকি অম্বিকা। বর্তমানে শতকি এবং অম্বা নামক দুটি গ্রাম কাছা-কাছি সাঁওতাল পরগনাতে অবস্থিত। জম্ভীয় গ্রামথেকে এটি আট মাইল উত্তর- পূর্বে অবস্থিত।

সুবর্ণ বালুকানদী : শ্বেত অম্বিকার পাশ দিয়েই প্রবাহিত। বর্তমান নাম হিঙ্গুলা বা হিংলা। হিঙ্গুলার অর্থ হল সুবর্ণ। অজয় এবং জম্ভীয় গ্রামের ৬ মাইল উত্তরে প্রবাহিত।

মৌরাক সন্নিবেশ : মৌরাক -মোর-আঁখি অথবা মৌর আঁখ, অর্থাৎ ময়ূরাক্ষী। ময়ূরাক্ষীর উৎস স্থল সাঁওতাল পরগণার এই ডিহার নিকট।

অনার্যদেশ : জৈন সাহিত্যে ভগবান মহাবীরের অনার্যদেশে বিহার এবং অনার্যভূমিতে ছয় বার বর্ষা চার্তুমাস অনিয়মিত রূপে অতিবাহিত করার কথা জানা যায়, এই অনার্যভূমি পশ্চিমবাংলার রাঢ় অঞ্চল এবং বীরভূম আদি অঞ্চলকেই বোঝায়।

আলতিকা : (আলভিয়া) - এই নগরীর বাইরে শঙ্খবন নামক এক উদ্যান ছিল। আলভিয়ার তৎকালীন রাজার নাম ছিল জিতশত্রু। মহাবীরের প্রসিদ্ধ ১০ শ্রমণোপাসক দের মধ্যে ৫ জন উপাসক গাথাপতি, চুল্লশতক প্রভৃতি এই নগরের অধিবাসী ছিলেন। ভগবানের ঋষিভদ্র প্রমুখ অন্য একজন প্রসিদ্ধ উপাসক এই নগরীর বাসিন্দা ছিলেন, যাঁর অনেক প্রশংসা ভগবানের মুখে শোনা যায়। এখানে ভগবান মহাবীর পোগ্গল প্রব্রাজককে নির্গ্রন্থ প্রবচন উপদেশ দিয়ে আপনার শ্রমণ শিষ্য করেছিলেন।

কলম্বুকা (কলম্বুয়া) : এখানে মহাবীর এবং গোসালক কালহস্থির হাতে ধরাপড়েন এবং পরে কালহস্থির ভাই মেঘের নিকট নিয়ে গেলে উনাদের মুক্তি মেলে। কলম্বুকা অঙ্গদেশের পূর্বপ্রদেশ ছিল, যেখানে মহাবীর কিছুদিন অতিবাহিত করার পর সোজা রাঢ় দেশে যাত্রা করেন।

কোটিবর্ষ (কোডিয়াবরিস) : এই নগর একসময় রাঢ়দেশের রাজধানী নগর ছিল। এখানকার রাজা কিরাতরাজ সাকেত বা অযোদ্ধানগরে ভগবান মহাবীরের নিকটে গিয়ে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। মহাবীরের সময় কোটিবর্ষ ছিল কিরাত জাতির রাজ্য এবং যখন মহাবীর এখানে পরিভ্রমণ করতেন তখন এই প্রদেশকে অনার্যদেশ বলা হত, পরন্তু জৈনসূত্র গুলিতে রাঢ়দেশকে আর্যদেশ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এই সূত্র থেকে জানা যায় যে এখানকার রাজা মহাবীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পর জৈন সংস্কৃতির ও জৈন ধর্মের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের জন্য এই দেশকে আর্যদেশ হিসেবে গণ্যকরা হতে থাকে। অন্য একটি ব্যাখ্যানুযায়ী আর্য হওয়াসত্ত্বেও জনসংখ্যার নিরীখে অনার্য জনজাতির সংখ্যা অধিক থাকার জন্য মহবীর ছদ্মবেশে ভ্রমণের সময় এই দেশকে অনার্যদেশ হিসেবে বলতে শুনেছেন,পরন্তু উনার ধর্মদেশনা ও প্রচারের প্রভাবে ক্রমশ এই ভূমি জৈন ধর্মের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। পৌরাণিক গ্রন্থাদিতে কোটি বর্ষের নাম কর্ণসুবর্ণ বলা হয়েছে। এই কর্ণসুবর্ণ দেশটি আজকের পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলা শহরের নিকটবর্তী অঞ্চলেই অবস্থিত। পুরাতত্ত্ববিদগণও এই ধারণা পোষণ করেন।

কোমিলা : বাংলার উত্তরপূর্ব প্রান্তে চট্টগ্রাম বিভাগে গোমতী নদীর কিনারে টিপরা জেলা সদরে কোমিলা নামে এক প্রাচীন নগর ছিল। পৌরাণিক কাল থেকে এর নাম কোমিলা বলে বিভিন্ন নথিতে উল্লেখ আছে। মহাবীরের নির্বাণের

পর বহু সময় ধরে কোমিল্লা জৈনধর্মের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র রূপে পরিগণিত হয়ে আসছে। কল্পসূত্রের থেরাবালীতে জৈন শ্রমণদের যে সকল প্রাচীন শাখার নাম ছিল খেমিলিজ্জিয়া। বাস্তবে এই খেমিলিজ্জিয়া কোমিলিয়ার প্রাকৃত রূপ এবং এর উদ্ভব কোমিলা থেকে । কোমিল্লার ময়নামতী নামক স্থানে খননকার্যের সময় অনেক জৈন অবশেষ পাওয়া গিয়েছে।

চৌরাক সন্নিবেশ :(চৌরায় সন্নিবেশ) - বর্দ্ধমান জেলায় এই সন্নিবেশ বা প্রশাসনিক আস্তানার নিকট মহাবীরস্বামীকে গুপ্তচর সন্দেহের বশবর্তী হয়ে নগররক্ষীরা আটক করলে তিনি বন্দী হন। এই ঘটনার কিছু সময় পরে সীমা এবং জয়ন্তী নামে দুইজন পরিব্রাজক স্বাধ্বী মহাবীর স্বামীর প্রকৃত পরিচয় প্রদান করলে পরে তিনি বন্দীদশা থেকে মুক্ত হন। মহাবীরস্বামী একবার এই চৌরাক ঘাটিতে গোসালক গোষ্ঠী-মণ্ডলীর দ্বারা নিগৃহীত হয়েছিলেন।

জম্ভীয় গ্রাম (জম্ভুকগ্রাম)- এই স্থান ঐ জম্ভিয়গ্রাম, যেখানে ইন্দ্র মহাবীরের গুণগান করেছিলেন এবং কেবলজ্ঞান প্রাপ্তির সময় পূর্বে ঘোষণা করেছিলেন। এই জম্ভীয়গ্রামের বাইরে চৈত্যের নিকট ঋজুবালিয়া নদীর উত্তর তটস্থ শ্যামাক গৃহীর শস্য ক্ষেত্রে শালবৃক্ষের নীচে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় মহাবীরের কেবল জ্ঞান প্রাপ্তি ঘটেছিল।

তাম্রলিপ্তি (তামলিপি) - একময় তাম্রলিপ্তি বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল বলে জৈনসূত্রে উল্লেখ রয়েছে। তাম্রলিপ্তির নিকটবর্তী প্রদেশকে কোথাও কোথাও সমতট বলা হয়েছে,কারণ এই জায়গা সমুদ্রতট সীমানাবর্তী। এই স্থান প্রসিদ্ধ বন্দর রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। বর্তমান মেদিনীপুর জেলায় যেখানে তমলুক শহর ওখানে পূর্বে তাম্রলিপ্তি নগর ও বন্দর ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েনসাং-এর ভারত পরিক্রমার সময় (৬৩০ খ্রীষ্টাব্দের পর কোন সময়) তাম্রলিপ্তির অবস্থান সামুদ্রিক বন্দরের নিকট ছিল। পরে সমুদ্র প্রায় ৬০ মাইল দূরে অপসৃত হয়ে যায়। তাম্রলিপ্তি নগরে মহাবীর স্বামীর পরিভ্রমণের বিষয়ে জৈন সাহিত্যে উল্লেখ রয়েছে ।

মোসলি - এই গ্রাম মহাবীরের উপসর্গ পীড়িত জায়গাগুলির মধ্যে একটি। এখানে তাঁকে সাতবার ফাঁসীতে চড়ান হয় কিন্তু প্রত্যেকবারই দড়ি ছিঁড়ে যায়, তখন

তাঁকে নির্দোষ ঘোষণা করে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।
রাঢ় (লাঢ়) : মুর্শিদাবাদ তথা এর আশপাশ অঞ্চলকে প্রথমে পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চল বলা হত, যার রাজধানীর নাম কোটিবর্ষ। জৈনসূত্র গুলিতে রাঢ় কে সাড়ে পঁচিশ আর্যদেশের মধ্যে গণ্য করা হ'ত।

রূপ্যবালুকা - দক্ষিণ বাচালা এবং উত্তর বাচালা নামে দুটি জনবসতির মাঝখান দিয়ে যে নদী বয়ে চলেছে তার নাম রূপ্যবালুকা।

লোহার্গলা - এটি বর্তমানে লোহাগারা। অজয় নদের ৫ মাইল উত্তরে সাঁওতাল পরগনায় অবস্থিত। এখানে গুপ্তচর সন্দেহে মহাবীর বন্দী হয়েছিলেন,পরে উনি মুক্তিলাভ করেন। লোহার্গলার তৎকালীন রাজার নাম জিতশত্রু বলে উল্লিখিত।

বঙ্গ- পূর্বে বঙ্গ শব্দটি দক্ষিণবঙ্গকে বোঝাত, যার রাজধানী ছিল তাম্রলিপ্ত, যা আজকার তমলুক নামে প্রসিদ্ধ। পরে ধীরে ধীরে বাংলার সীমা বৃদ্ধি পায় এবং ৫ ভাগে বিভিন্ন নামে এর পরিচিতি ঘটে। বঙ্গ (পূর্ব বাংলা) সমতট (দক্ষিণ বঙ্গ), রাঢ় অথবা কর্ণসুবর্ণ (পশ্চিমবঙ্গ), পুন্ড্র (উত্তর বঙ্গ), কামরূপ (আসাম)।

বজ্রভূমি - বাংলার বীরভূম প্রদেশ, যাকে মহাবীরের সময়ে অনার্যদেশ বলা হত, আজও ওখানে সাঁওতাল প্রভৃতি জনজাতির লোকেদের বাসস্থান।

বর্ধমানপুর - এর বাইরে বিজয়বর্ধন উদ্যান ছিল যেখানে মনিভদ্র নামে যক্ষের মন্দির ছিল। তৎকালীন (মহাবীরের সময়ে) রাজার নামছিল বিজয়মিত্র। বর্তমানে বাংলার এক আধুনিক নগর বর্ধমান, যা কোলকাতা থেকে ৬৭ মাইল পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। এই বর্ধমান বর্ধমানপুর হওয়াটা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়।

বালুকাগ্রাম - এখানে সংগমদেব ভগবান মহাবীরের উপর অনেক প্রকার উপদ্রব করেছিলেন।

বিজয় বর্ধমান - এই উদ্যান বর্ধমানপুরের সন্নিকটে অবস্থিত ছিল।

বিজয়পুর- উত্তর বঙ্গের গঙ্গার কিনারে অবস্থিত আজকের বিজয়নগর;তৎকালীন বিজয়পুর, যা একটি প্রাচীন নগর ছিল। এর আশেপাশের অঞ্চল প্রথমে পুণ্ড্রদেশ নামেও প্রসিদ্ধ ছিল।

বীরভূম - প্রাচীন রাঢ়দেশের কিয়দংশ বীরভূমি নামে পরিচিত ছিল, যা জৈন সূত্রানুসারে বজ্জভূমি বা বজ্রভূমি নামে উল্লিখিত। ছদ্মাবস্থাতে কিংবা এর পরে ভগবান মহাবীর ঐ সকল স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন। বীরভূমির উত্তর-পশ্চিমে সাঁওতাল পরগণা, পূর্বে মুর্শিদাবাদ এবং দক্ষিণে বর্ধমান।

বেগবতী - এই নদী অস্থিক গ্রামের নিকটবর্তী অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত ছিল।

শুদ্ধভূমি : প্রাচীন রাঢ়দেশের যে ভূমিতে অধিক সংখ্যক আর্য জনজাতির সুহ্ম লোকেদের বসবাস ছিল সেই স্থানকে বোঝাত। সম্ভবত এই স্থান বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার ভূমি বিভাগের অন্তর্গত ছিল।

শূলপানি চৈত্য : অস্থিক গ্রামের সন্নিকটে এক যক্ষের মন্দির, যেখানে মহাবীর প্রথম বর্ষাচার্তুমাস অতিবাহিত করেছিলেন এবং প্রথম রাতেই যক্ষ উনাকে বিবিধ প্রকারে কষ্ট দিয়েছিল।

সমতট : বাংলার একটি অংশকে প্রথমে সমতট হিসেবে অভিহিত করা হত। তবে কিছু কিছু বিদ্বান ব্যক্তি পূর্ববঙ্গ কে সমতট বলতে চাহেন। আবার অনেকে দক্ষিণবঙ্গে নিম্নসমতল ভূমিকে সমতট বলে অনুমান করেন।

সালুলটিয় গ্রাম : এই গ্রামের বাহিরে ভগবান মহাবীর ভদ্র, মহাভদ্র এবং সর্বতোভদ্র মন্ত্র দৃঢ়পণ পূর্বক ধ্যান করেছিলেন, যার প্রশংসা ইন্দ্র পর্যন্ত করেছিলেন।

সুবর্ণবালুকা : এই নদী বাচালা নগরীকে দুই ভাগে বিভক্ত করে বয়ে যেত। এই নদীর পাড়ে মহাবীর পরিহিত বস্ত্রের অর্ধেক অংশ ছিন্নকরে এক ব্রাহ্মণকে দান করেন।

সুহ্ম : কোন কোন বিদ্বান ব্যক্তি হুগলী ও মেদিনীপুরের মধ্যবর্তী অংশকে সুহ্ম বলে থাকেন যা উড়িষ্যার সীমান্তবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁদের মতে দক্ষিণ-বঙ্গ, যার রাজধানী ছিল তাম্রলিপ্ত, সুহ্ম নামে পরিচিত। এই বক্তব্যের তাৎপর্য হল হাজারিবাগের পূর্বাংশের দেশকে ভঙ্গী দেশ বলা হত, এর পূর্বের দেশ রাঢ়ের দক্ষিণ-পশ্চিমের কিছু অংশ এবং দক্ষিণ বঙ্গের কিছু পশ্চিমের ভূভাগ প্রথমে সুহ্ম নামেই প্রসিদ্ধ ছিল।

পুন্ড্রবর্ধন : মালদহ জেলার মালদহ থেকে ছয় মাইল উত্তরে উত্তরবঙ্গের রাজধানী পুন্ড্রবর্ধন নগর অবস্থিত ছিল। আজকার পাণ্ডুয়া অথবা পড়ুয়া পুন্ড্রবর্ধনের অপভ্রংশ। পুন্ড্রদেশে যেখানে রাজধানী পুন্ড্রবর্ধন ছিল, এর সঙ্গে রাজশাহী, দিনাজপুর,রংপুর নদিয়া, বীরভূম, জঙ্গলমহল, পাঞ্চেত এবং চুনার জেলা সংযুক্ত ছিল।

জৈন শ্রমণদের প্রাচীন শাখাগুলির একটির নাম ছিল পৌণ্ড্রবর্ধনিয়া,যা পুন্ড্রবর্ধন থেকে উদ্ভূত। পুন্ড্রবর্ধন এক সময় জৈন ধর্মের এক মুখ্য কেন্দ্র ছিল।

জম্বুস্বামী:

বাংলায় মহাবীর স্বামী জ্ঞানের যে গঙ্গা প্রবাহিত করেছিলেন তার ধারা শিষ্য-প্রশিষ্য পরম্পরায় শত শত বছর ধরে আজও প্রবাহিত। ভগবান মহাবীরের গণধর সুধর্মাস্বামীর শিষ্য জম্বুস্বামী ছিলেন অন্তিম কেবলী। কলিকাল সর্বজ্ঞ হেমচন্দ্রাচার্য এই মহান সন্তের বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা পরিশিষ্ট পর্বে রেখেছেন। এই বর্ণনানুসারে তাঁর নির্বাণ ভগবান মহাবীরের নির্বাণের ৬৪ বছর পরে ঘটেছিল। তাঁর ভ্রমণ, প্রচার এবং নির্বাণ কোথায় ঘটেছিল এই বিষয়ে আগমসাহিত্যে কোন উল্লেখ নাই। দিব্যাবদান ও অশোকাবদানের আখ্যান থেকে জানা যায় যে উত্তর বঙ্গের পুণ্ড্রবর্দ্ধন, মধ্য বঙ্গের কোটিবর্ষ এবং দক্ষিণ-বঙ্গের তাম্রলিপ্ত প্রাচীনকাল থেকে নির্গ্রন্থদের প্রধান কেন্দ্র ছিল। কিছু পারম্পরিক কাহিনী এবং লোকশ্রুতি অনুযায়ী জম্বুস্বামীর নির্বাণ কোটপুরে ঘটেছিল এবং ঐখানেই তাঁর সমাধিস্থল নির্মিত হয়েছিল। কোটপুর আজ দেবীকোট নামে পরিচিত যা পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণদিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরের উপকণ্ঠে অবস্থিত।

Legends embedded in Divyavadana and Asokavadana reveal that from the days of Gautama Buddha to the days of king Asoka, Pundravardhana was mostly dominated by the Jainas. On the Other hand, another old tradition reveals that there were two ancient Jaina holy places at Pundravardhana, one at Pundraparvata and other at Kotapura later Known as Devakotta. Kottapura/ Koti Tirtha was considered to be the most holy place because here mahamuni Jambusvami attained nirvana and cast his mortal body. All classes of Jainas whether monks or lay-devotees used to come to kottapura/ kotitirtha to worship the monument or the mausoleum of the great saint from far and near."

- Chitta Ranjan Pal

কিছু পন্ডিত ব্যক্তি মনে করেন জম্বুস্বামীর নির্বাণ মথুরার চৌরাশিয়ায় ঘটেছিল। প্রাচীন জৈনাচার্যগণ মথুরাতে জম্বুস্বামীর নির্বাণের বিষয়ে অজ্ঞাত ছিলেন। বপ্পভট্টসূরি নবম শতাব্দীতে মথুরায় জৈনমন্দিরের পুনরুদ্ধার করেছিলেন কিন্তু চৌরাসিয়া ক্ষেত্রের বিষয়ে অজ্ঞাত ছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে হেমচন্দ্রাচার্যও মথুরার চৌরাসিয়ার এই বিষয়ে কোন বিবরণ দেন নাই। চতুর্দশ শতাব্দীতে জিনপ্রভ সূরিজী মথুরা যাত্রা করেছিলেন কিন্তু তিনি চৌরসিয়ার বিষয়ে কোন উল্লেখ করেন নাই । ষোড়শ শতাব্দীতে আকবরের শাসনকালে এই স্থানে নির্বাণ ক্ষেত্র স্থাপিত হয়েছিল। "হীর সৌভাগ্য" কাব্যে সাহ টোডরমল দ্বারা ১৫৭৪ খ্রী: রাজমহল তথা ১৫৮৪ খ্রী:, এবং জিনদাস দ্বারা লিখিত বিবরণ থেকে চৌরসিয়ার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় নি।

৯৩১ খ্রী: হরিসেনসূরি দ্বারা রচিত 'বৃহৎকথাকোশ' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে ভগবান মহাবীরের চতুর্থ পট্ট গোবর্দ্ধনাচার্য কোটপুর তীর্থ দর্শন করে যখন ফিরছিলেন তখন ওখানকার শহরের বাইরে ভদ্রবাহুকে খেলতে দেখেছেন।

"On the basis of discussions made above, it is to be concluded that the tradition of Jambuswami's association with Chaurasia is a mid-Sixteenth century invention. On the contrary, Jambusvami's association of Kottapur seems to be of older origin. In the Brihatkatha Kosa (931 A.D) Harisena Suri had made a hint to that direction. Regarding Bhadravahu's first acquaintance with Govardhancarya, the fourth Srutakevalim, found Bhadravahu at play with other playmates and took him to his disciplehood."

-Mahamuni Jambu Svami and Bengal

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন উল্লেখ করেছেন যে, দেবচন্দ্র আচার্য তাঁর নিজের কন্নড়ভাষায় লেখা পুস্তক "রাজবলী কথাতে" উল্লেখ করেছেন, "গোবর্ধনাচার্য (চতুর্থ শ্রুতকেবলী) ৫০০ সাধু সন্তদের সাথে জম্বুস্বামীর সমাধিস্থল দর্শন করে ফিরে আসার সময় ভদ্রবাহুকে কোটপুরের বাইরে ক্রীড়ারত অবস্থায় দেখেছিলেন"। প্রসিদ্ধ কন্নড় পন্ডিত ড: হম্পানাগরাজাইয়া এই বিষয়ে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে দেবচন্দ্র আচার্য কেবল একজন বিদ্বান নয়, একজন শ্রাবকও ছিলেন, এবং তাঁর পুস্তকের নাম 'রাজবলী কথাসার', যেখানে উনি উল্লেখ করেছেন, ভদ্রবাহু জন্মসূত্রে কোটপুরের অধিবাসী ছিলেন। একবার জম্বুস্বামী

নির্বাণ স্থল বন্দনা করতে গিয়ে গোবিন্দাচার্য ভদ্রবাহুস্বামীকে কোটপুরের বাইরে ক্রীড়ারত অবস্থায় দেখেছিলেন। এই সকল তথ্যাদি পর্যালোচনা করলে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, একসময় কোটপুর জৈনদের এক পুরাতন তীর্থস্থান ছিল,যেখানে মথুরার চৌরাসিয়া ষষ্ঠদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তীর্থক্ষেত্র হিসেবে উত্থাপিত হয়েছিল। এই সকল বিবরণ থেকে এ কথা সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় যে বাংলায় মহাবীর স্বামী এবং তাঁর অনেক অনুসরণকারী শ্রমণ সংস্কৃতির প্রচার করেছিলেন, এবং মহাবীরের নির্বাণের ৬৪ বছর পরে জম্বুস্বামীর নির্বাণলাভ ঘটেছিল এই বাংলার কোটপুরেই। তাঁর স্মৃতিকে দীর্ঘজীবী করার জন্য কোটপুরকে এক তীর্থস্থানে মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে শ্রী চিত্তরঞ্জন পাল উল্লেখ করেছেন: "The discussions made above tend us to believe that Kotitirtha Kottapur is an older pilgrimage centre, probably had its origin in the Pre-Christian centuries while Chaurasia as a pilgrimage centre for the Jainas came into existence during the mid-Sixteenth century. And as such there is no difficulty in assuming that Jambusvami's association with Kottapur or Kotitirtha made it a holy Pilgrimage centre for the Jainas since the time of the Fourth Srutakevalin or even earlier."

- Chitta Ramjan Pal

পাহাড় পুরের জৈন সংস্কৃতি:

অবিভক্ত বঙ্গদেশের রাজশাহী জেলায় বদলগাছী থানার অর্ন্তগত এবং কোলকাতা থেকে ১৮৯ মাইল উত্তরে জামালগঞ্জ স্টেশন থেকে ৫ মাইল পশ্চিমে পাহাড়পুরের অবস্থান। এখানে এক প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ৫১ বিঘা জায়গা জুড়ে বিদ্যমান, যার চর্তুদিক ইটদ্বারা নির্মিত ও প্রাচীর দ্বারা বেষ্ঠিত। এর মধ্যস্থলে একটি দীর্ঘমাপের বিশাল টিলা থাকার জন্য গ্রামবাসীরা একে 'পাহাড়' বলে থাকে এবং এই পাহাড় নাম থেকেই এই জায়গার নাম পাহাড়পুর।

এই স্থান থেকে গুপ্তযুগের (৪৭৮ খ্রী:) ১৫৯ টি তাম্রপত্র পাওয়া গিয়েছে। পুরাতত্ত্ববিদ কে.এন. দীক্ষিতের মতানুসারে পাহাড়পুর প্রথমে এক জৈন বিহার ছিল, যা পরে বৌদ্ধ বিহারের নামে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। এখানকার প্রাপ্ত একটি তাম্রফলক থেকে জৈন বিহারের কথা জানা যায়। এখানে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের বিভিন্ন গ্রামের ভূমি ক্রয় করে এক ব্রাহ্মণ দম্পতির বটগোহালীতে জৈন বিহার নির্মাণের জন্য ভূমিদানের কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে । পাহাড়পুরের সন্নিকট পশ্চিমদিকে অবস্থিত এই বটগোহালী গ্রাম যার বর্তমান নাম গোয়ালভিটা, এবং এই গ্রামে ঐ মন্দিরের কিছু অংশ আজও অবস্থিত।

১৮০৭ খ্রী: ডাক্তার বুকানন হ্যামিলটন এই টিলাকে (যার ভিতরে এক মন্দির রয়েছে গোয়ালভিটার পাহাড় বলে উল্লেখ করেছেন। এই লিখিত বিবরণ অনুযায়ী বটগোহালীর জৈন বিহার নিশ্চিতরূপে পাহাড়পুরের এই মন্দিরের মূলস্থানের উপর অবস্থিত ছিল, আর বটগোহালীই গোয়ালভিটা একথা পরিষ্কার বোঝা যায়।

খ্রী: পূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে উত্তরবঙ্গ মৌর্য শাসনাধীনে ছিল আর পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে প্রান্তীয় শাসকের নিবাস ছিল। গুপ্তযুগেও বাংলার এই প্রান্তের রাজধানী শহর ছিল পুণ্ড্রবর্দ্ধন । বর্তমান যে স্থান মহাস্থান গড় নামে প্রসিদ্ধ, এ স্থানও প্রাচীনকালে পুণ্ড্রবর্দ্ধন নামে পরিচিত ছিল। পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়ের উত্তর পশ্চিমে আরও ২৯ মাইল দূরত্বে বানগড় থেকে দক্ষিণপূর্বে আরও ৩০

মাইল দূরত্বে অবস্থিত। এই দুই প্রধান নগরের অনতিদূরে মন্দিরস্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল নগরের কোলাহল বর্জিত নির্জন স্থানে, মুনিজনদের নিভৃত পরিবেশে নগরের বাইরে শান্তিময় পরিবেশে আরাধনা ও জ্ঞানচর্চা করা, যা থেকে নগরবাসীগণের ও সাধুসংসর্গের সুবিধা থাকে। অপরদিকে ঐ সময় পুণ্ড্রবর্দ্ধন এবং কোটিবর্ষ জম্বুস্বামীর নির্বাণস্থল হওয়ার দরুণ এই স্থান জৈনাচার্যদের নিকট প্রধান পট্টস্থান বা প্রধান কেন্দ্র ছিল। ঐ সময় ঐ অঞ্চলে জৈনদের পূর্ণ প্রাধান্য ছিল।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্ত শাসনের প্রভাব ক্ষীণ হতে থাকে এবং সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে বাংলায় মহারাজ শশাঙ্কের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা পায়। শশাঙ্ক শৈব ধর্মাবলম্বী ছিলেন। উনি জৈন ও বৌদ্ধদের অনেক পীড়ার কারণ হয়ে উঠেছিলেন। তথাপি এখানে জৈনরা শক্ত ভিত্তির উপর পূর্ণরূপে বিরাজ করতে থাকে। এরপর সপ্তম শতাব্দীতে যে অরাজকতার ঘনঘটা বাংলায় দেখা গিয়েছিল তা উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পায়, এবং এর ফলে ধীরে ধীরে বাংলা থেকে জৈন ধর্ম অপসারিত হতে শুরু করে। বট গোহালীর "শ্রী গুহনন্দী জৈনবিহার" পুণ্ড্রবর্দ্ধন এবং কোটিবর্ষের জৈন কেন্দ্রগুলির স্বাভাবিক রীতি রেওয়াজে ছন্দপতন ঘটতে থাকে। অষ্টম শতাব্দীতে যখন পুনরায় ওখানে শান্তির পরিবেশ ফিরে আসে পাল সাম্রাজ্যের উত্থানে ও তার দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, তখন ঐ সময় ঐ স্থান সোমপুর বৌদ্ধ বিহার নামে প্রখ্যাত হয়ে যায়।

পাল নৃপতিগণের রাজত্ব প্রায় ৩৫০ বছর ধরে চলেছিল, কতিপয় পাল রাজা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। এঁদের আমলে জৈনদের প্রাধান্য নষ্ট হয়ে যায় এবং বৌদ্ধদের প্রভাবের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়, আর এই জৈন বিহার (পাহাড় পুর) বৌদ্ধ বিহারের অধিকারভুক্ত হয়ে যায়। খ্রীষ্টিয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ কিংবা নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে পাল বংশের দ্বিতীয় সম্রাট মহারাজ ধর্মপাল এই নির্গ্রন্থবিহারের উপর বৌদ্ধ মহাবিহার নির্মাণ করেছিলেন। এর পর থেকে এই জায়গা ধর্মপালদেবের 'সোমপুর মহাবৌদ্ধ বিহার' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ্-এর, এর আগমনের ১৫০ বছর পূর্বের তাম্রলেখের প্রাপ্তি কেবল জৈন প্রভাবের বিষয়েই সমর্থন দেয় না বরং এও প্রমাণ করে যে এই জৈনবিহার ছিল বাংলার অতিপ্রাচীন জৈন সংস্কৃতির এক বৃহৎ কেন্দ্র।

পাহাড়পুর জৈন বিহারের তাম্রফলক:

পাহাড়পুর থেকে প্রাপ্ত তাম্রপত্রটির পঙক্তিগুলির কিছু অক্ষর খননকার্যের সময় মজদুরদের অসাবধানতার কারণে ঘেসটে গিয়েছে, শ্রমিক এর উপরের দিকে দক্ষিণ-কোণে একটি ছিদ্রও তৈরী হয়েছে। তথাপি এই তাম্রপত্রের অবস্থা বেশ ভাল । এই তাম্রপত্রের আকৃতি ৭$\frac{১}{৪}$ X ৪$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি এবং এর ওজন ২৯ তোলা। এর লিপি পঞ্চম শতাব্দীর, ভাষা সংস্কৃত। এর শেষ পাঁচ পঙক্তি যা অমঙ্গল দূরীকরণের উদ্দেশ্যে সংযুক্ত পদ্যে লিখিত (যা এখানে পরিবেশিত হয় নি) এছাড়া সমস্ত লেখটি গদ্যে লিখিত।

পাহাড়পুরের তাম্রশাসন:

গুপ্তাব্দ ১৫৯ (সন্ ৪৭৯), এর দ্বিতীয় ,অষ্টম এবং চৌদ্দতম শ্লোকে জম্বুদেবের বর্ণনা রয়েছে।

- অগ্রভাগ -

১। স্বস্তি (ll) পুণ্ড্র [বদ্ধ] নাদ = আয়ুক্তক: আর্য্য-নগরশ্রেষ্ঠি পুরোগংচ = অধিষ্ঠান্-অধিকরণম্ দক্ষিনাংশক-বিথেয় নাগিরট্ট

২। মাণ্ডলিক-পলাশাট্ট-পার্শ্বিক-বট-গোহালী-জম্বুদেব-প্রাবেশ্য-পৃষ্টিম-পোত্তক -গোষা-টয়ুংজক-মূল-নাগিরট্ট-প্রাবেশ্য-

৩। নিত্য-গোহালীযু ব্রাহ্মণ্-ও ত্তরান্ = মহত্তর আদি কুডম্বিন: কুশলম-অনুবরাণ্য = আনুবোধয়ন্তি (l) বিজ্ঞাপয়ত্য = অস্মান = ব্রাহ্মণ - নাথ -

৪। শর্ম্মা এতদ্ - ভার্য্যা রামী চ (l) যুষ্মাকম্ ইহ = অধিষ্ঠান্ অধিকরণে দ্বি-দীনারিক্কয়-কুল্যবাপেন শশ্বত্-কাল্-ওপভোগ্য-আক্ষয়-নীবী-সমুদয়-বাহ্য-আ-

৫। প্রতিকর-খিল-ক্ষেত্র-বাস্তু-বিক্রয়া= নুবৃত্তম = তদ্ = অর্হথ্ = আনেন্ =এব = বক্রমেণ=আবয়োস্ =সকাশাদ্-দীনার = এয়ম = উপসংগৃহ্য = আবোয়(স) =স্ব-পূণ্য-আপ্যা-

৬। থনায় বট-গোহাল্যাম্ = অব = আস্যাং = কাশিক-পঞ্চস্তূপ নিকায়িক-নিগ্রন্থ শ্রমণ্-আচার্য্য-গুহনন্দী-শিষ্য-প্রশিষ্য-আধিষ্ঠিত-বিহারে।

৭। ভগবতাম্-অর্হতাম-গন্ধ-ধূপ-সুমনো-দীপ্-আদ্য-অর্থন্ = তল-বাটক-নিমিও ঞ -চ অ (৩) এব বট গোহালীতো বাস্তু-দ্রোণবাপম্-অধ্যর্দ্ধান্= জ-

৮। (জ)ম্বুদেব-প্রাবেশ্য- পৃষ্টিম = পোত্তকেত্ ক্ষেত্র দ্রোণ বাপ চতুষ্টয়ম গোষাটপুংজাদ্ =দ্রোণবাপ- চতুষ্টয়ম্ মূল নাগিরট্ট-

৯। প্রাবেশ্যা- নিত্ব- গোহালীত: অর্দ্ধ- ত্রিক -দ্রোণবাপন্=্ইত্য= এবম্ = অধ্যর্দ্ধম = ক্ষেত্র - কুল্যবাপম্ =অক্ষয়- নীব্যা দাতুম = হ (ত্য = অত্র) য়ত: প্রথম-

১০। পুস্তপাল -দিবাকরনন্দি-পুস্তপাল-ধৃতিবিষ্ণু-বিরোচন-রামদাস হরিদাস শশিনন্দি-যু-প্রথমনু.....(না)ম্ অবধারণ-

১১। য় = আবধৃতম্-অস্ত্য=অস্মদ্ অধিষ্ঠান- আধিকরণে দ্বি দীনারিক্কা- কুল্য বাপেন শশ্বতকাল্ ওপোভোগ্য-আক্ষয়-নীবী সমু (দয়-বা)হ্য আপ্রতিকর-

১২। (খিল)-ক্ষেত্র-বাস্তু-চিক্রয়ো = নৃবৃত্তস্ = তদ্= যুষ্মাম্= ব্রাহ্মণ = নাথ=শর্ম্মা এতদ্ ভার্ত্যা রামী চ পলাশাট্ট- পার্শ্বিক-বট-গোয়ালীস্থ (?) -য়

১৩। (কাশি)----- ক--- পঞ্চস্তূপ --কুল-- নিকায়িক-- আচার্য- নিগ্রন্থ-- গুহনন্দি--শিষ্য-প্রশিষ্য--আধিষ্ঠিত-সদ্-বিহারে অরহতাম্ গন্ধ (ধূপ)-আদ্য উপযোগায়

১৪। (তল-ব) আটক - নিমিতাঞ্ = চ তত্র্-এব বট-গোহাল্যাং বাস্তু দ্রোণবাপম্ -অধ্যর্দ্ধ ক্ষেত্রাঞ = জম্বুদেব- প্রাবেশ্য = সৃষ্টিম-পোত্তকে দ্রোণ- বাপ- চতুষ্টয়ং

১৫। গোষাট পুজ্জাদ্=দ্রোণবাপ-চতুষ্টয়ং মূল নাগিরট্ট-প্রাবেশ্য নিত্ব গোহালীতো দ্রোণবায়-দ্বয়ম=আঢ়বা (প-দ্ব) যূ যূআধিকম্=ইত্য=এবম= অ-

১৬। ধ্যর্দ্ধ ক্ষেত্র- কুল্যবাপম্ প্রার্থদতে = ঞন কশ্চিদ্ =বিরোধ: গুণস্ =তুযত্ =পরম-ভট্টারক-পাদানাম্=অথ= ওপচয়ো ধর্ম্ম-ষড় -ভাগ্ আপ্যায়-

১৭। নঞ-চ ভবতি তদ্ এবন = ক্রিয়তাম = ইত্য= অনেন্= আবধারনা-বক্রমেন-আস্মাদ-ব্রাহ্মণ-নাথ-শর্ম্মত এতদ্ ভার্য্যা রামি পাশ চ দীনার ত্র

পাহাড়পুরের তাম্রশাসন:

১৮। য়ম্= আর্যাকৃত্য=এতাভ্যাং বিজ্ঞাপিতক-ক্রম ওপযোগায়= ওপরিনির্দিষ্ঠ= গ্রাম-গোহালি-কেষ: তল বাটব বাস্তুনা সহ ক্ষেত্রং

১৯। কুল্যবাপ অধ্যর্দ্ধো = ক্ষয়- নীবী ধর্ম্মেণ দত্ত:কু (১) দ্রো ৪ (১) তদ্ = যুষ্মাভি: স্ব-কর্ম্মণ্ আবিরোধিস্থানে ষটক্- নডের্ = অপ-

২০। বিঞ্চচ্ছ্য দাতব্যো = ক্ষয় নীবী ধর্মেন চ শশ্বদ্- আচন্দ্র - আর্ক্ক-তারক-কালম্ =অনু - পালয়িতব্য ইতি(১) সম্ ১০০-৫০৪

এই তাম্রলেখটির বিষয়ে অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন পালের অভিমত, এই লেখাটিতে জম্বূদেবের নামোল্লেখ জম্বূদেবের এই স্থানে আগমন এবং নির্বাণ লাভের প্রতীক স্বরূপ এখানে চৈত্য স্মারক, কিংবা স্তূপ নির্মিত হওয়ার সম্ভাবনা একপ্রকার সুনিশ্চিত করে, যার অন্যথা হতে পারেনা। প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ্ অধ্যাপক সত্যরঞ্জন বন্দোপাধ্যায় মহোদয় একথা স্বীকার করেন, যে এই জম্বুদেব ভগবান মহাবীরের গণধর সুধর্মাস্বামীর প্রমুখ শিষ্য এবং শেষ কেবলী জম্বুস্বামী হওয়াই সম্ভব। কারণ শ্রমণ পরম্পরায় তীর্থঙ্কর এবং আচার্যের নামের পরে 'স্বামী' অথবা 'দেব' দুইএর সংযুক্তিকরণের প্রচলন ছিল। ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদের প্রভাব বাংলায় আনুমানিক চতুর্থ শতাব্দীর পর কিংবা কাছাকাছি সময় থেকে সূচিত হয়েছিল। এই তাম্রলেখের প্রাপ্তি তথা জৈনবিহারের বৌদ্ধ বিহারে পরিবর্তন আমার এই ধারণাকে দৃঢ়তর করছে যে বাংলার বহু জৈন স্তূপ হয় ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে অথবা পরিবর্তিত করে এর বাস্তবিক স্বরূপ বদলানোর অপপ্রচেষ্টা করা হয়েছে।

ভদ্রবাহুস্বামী

পঞ্চদশ শতাব্দীতে রত্ননন্দী তাঁর ‘ভদ্রবাহু চরিত্র’ গ্রন্থে ভদ্রবাহু প্রসঙ্গে একটি বিবরণ পরিবেশন করেছেন। রত্ননন্দীর মতানুসারে, এই পুণ্ড্রবর্দ্ধন দেশে কোট্টপুর নামে একটি নগর ছিল। এই নগর একটি সুবর্ণখণ্ডের মত সৌন্দর্যময় ছিল। বৃহৎ সুরম্য অট্টালিকা, পরিখা, প্রাকার এবং নগরতোরণ, সারিবদ্ধ অট্টালিকার বিস্তারের দ্বারা এই নগরের শোভা বর্দ্ধিত হত।

তত্র কোট্টপুর রম্য দয়োততে নাকখণ্ডবৎ।
অগাধীত্তুঙ্গ সাট্টালে : খালিকা-শাল গোপুরৈ:।।

তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে শ্রী গোবর্দ্ধনাচার্য পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের কোট্টপুরে এসেছিলেন। প্রতিভাশালী ভদ্রবাহুকে দেখে গোবর্দ্ধনাচার্য এতই প্রসন্ন হয়েছিলেন যে তাঁকে নিজের শিষ্য করতে চেয়েছিলেন। ভদ্রবাহুর পিতা মাতা এই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিলেন। গোবর্দ্ধনাচার্য একজন জৈনাচার্য ছিলেন। ভদ্রবাহুও জৈন ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

আচার্য হেমচন্দ্রের “ত্রিষষ্টি শলাকাপুরুষ চরিত্র” গ্রন্থে ৬৩ মহাপুরুষের চরিত্র বর্ণিত হয়েছে। এর শেষভাগে স্থবিরাবলী চরিত্রের মধ্যে ভদ্রবাহুর চরিত্রও বর্ণিত হয়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছদের শেষভাগে হেমচন্দ্র ভদ্রবাহুর প্রতি নিজের ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

“অমরপুরের চাইতেও মনোরম কোট্টপুর নগরে সোমশর্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে সুশ্রী সোমশ্রীর গর্ভে বহু গুণসম্পন্ন পুত্ররূপে যিনি জন্ম গ্রহণ করে যোগ্য গুরুর আশ্রয়ে নির্মল জ্ঞান-দুগ্ধ-সমুদ্র উত্তীর্ণ গণনেতা ভদ্র এবং মহাগুরু ভদ্রবাহু আমার মনের মুকুরে চির দীপ্যমান”।

য: শ্রীকোট্টপুরে জিতামরপুরে সোমাদিশর্মদ্বিজা
দাসীদেক গুণাকরোৎ তঙ্গজবর: সোমশ্রিয়াং সুশ্রিয়াম্।
প্রীত্তীর্ণোত্মলবোধ দুগ্ধজলধি শ্রীত্বা গরীয়ো গুরু

ভদ্রোস্মৌ সম, ভদ্রবাহুগণযেঃ প্রদ্যোততাং মানস।। ।।১৭২।।

যেখানে রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমূখ বিদ্বজ্জনেরা অনেকে মনে করেন যে ভদ্রবাহুর নির্বাণ-স্থল কোটিপুর পুণ্ড্রবর্দ্ধনের কাছে না হয়ে রাঢ়ের অন্য কোন অঞ্চলে হতেপারে, সেখানে আরও অনেক বিদ্বজ্জন পুণ্ড্রনগরের দেবীকোটকেই ভদ্রবাহুর নির্বাণস্থলের মান্যতা দিয়েছেন। ভগবান মহাবীরের সময় কোটপুর কোটিবর্ষ, আর জম্বুস্বামীর নির্বাণস্থল কোটপুর একই জায়গা, এমন মতও অনেক পন্ডিত পোষণ করেন।

মহাবীরের পর খ্রী: পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে বিখ্যাত জৈন আচার্য এবং অন্তিম শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহু কর্ত্তৃক বাংলার জৈনধর্মের প্রচার উল্লেখযোগ্য । ভদ্রবাহুর জন্ম দেবকোটে হয়েছিল। তাঁরসময় দেবকোটের নামছিল কোটিপুর। কোটিপুর উত্তর বাংলার মধ্যবর্তী স্থান, বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুর জিলার বানগড় (যা অধুনা গঙ্গারামপুর মহকুমার অর্ন্তগত)। কোটিবর্ষ বিষয়ে আমি পুরাতন তাম্রপত্রগুলিতে আরও কিছু উল্লেখ পেয়েছি, যেখানে কোটিপুরকেই কোটিবর্ষ বলা হয়েছে। বঙ্গদেশে প্রাপ্ত অনেক তাম্রপত্রে কোটিবর্ষের নাম পাওয়া গিয়েছে। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে দিনাজপুর জেলার অর্ন্তগত আমগাছি গ্রামে তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের একটি তাম্রপত্র পাওয়া যায়। এই পত্র থেকে জানা যায়, পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভূক্তির অন্তর্গত ছিল কোটিবর্ষ বিষয় (২৪ পংক্তি)। দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত বানগড়ের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে প্রথম মহিপাল দেবের একটি তাম্রপত্র পাওয়া যায়। এই তাম্রপত্র থেকে জানা যায়, পরম সৌগত রাজা মহিপালদেবের রাজত্বের নবম বর্ষে পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তর্গত কোটিবর্ষ বিষয়ে (৩০-৩৯ তম পংক্তি) চুটপল্লিকা বর্জিত কুরট পল্লিকা গ্রাম বুদ্ধভট্টরাজের উদ্দেশ্যে মহাবিষ্ণুসংক্রান্তির দিন কৃষ্ণাদিত্যদেবশর্মাকে দান করা হল।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে দিনাজপুর জেলার মনহলি গ্রামে পুষ্করিণী খননের সময় মদনপালদেবের একটি তাম্রপত্র পাওয়া যায়। যেখান পরম সৌগত রাজা মদনপালদেব তাঁর রাজত্বের অষ্টমবর্ষে মহারানী চিত্রমতিকাদেবীকে মহাভারত শোনানোর দক্ষিণা বাবদ চন্দ্রাহট্টি গ্রাম নিবাসী বটেশ্বর স্বামী শর্মাকে পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির কোটিবর্ষ বিষয়ের হলাবর্তমন্ডলের অর্ন্তগত কোষ্টগিরি গ্রামে ভূমিদান করেছিলেন। এই তাম্রপত্রে প্রদত্ত বিবরণী থেকে একথা স্পষ্ট হয় জম্বুস্বামীর নির্বাণ স্থান এবং আচার্য ভদ্রবাহুর জন্ম স্থান পুণ্ড্রবর্দ্ধনেই ছিল। ভদ্রবাহু তাঁর

আমলে সবচেয়ে অধিক প্রভাবশালী ধর্মপ্রচারক ছিলেন। একথা সুবিদিত যে তিনি মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের গুরু ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত এঁরই প্রেরণা ও প্রভাবে জৈনধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

কল্পসূত্রে ভদ্রবাহুর শিষ্য গোদাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। গোদাসের শিষ্যসম্প্রদায়ের চারটি শাখার সঙ্গে বঙ্গদেশের সম্বন্ধের কথা জানা যায়, যেমন তাম্রলিপ্তিয়া (তমলুক শহর), কোটিবর্ষিয়া (দিনাজপুরের নিকটে বানগড়) পুণ্ড্রবর্দ্ধনিয়া (বগুড়ার নিকট মহাস্থানগড়) এবং দাসী খর্বটিয়া (মেদনীপুরের নিকটে)। খর্বটকে কিছু পন্ডিত কোমিলার সঙ্গে যুক্ত বলে মনে করেন। যাইহোক এই সকল শাখা বঙ্গদেশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

"The Jaina religion was firmly established in Bengal in the Mauryan period more than two thousand years ago. The Kathakosa preserved a tradition that the Jaina Preceptor and saint Bhadravahu, who was a contemporary of Chandragupta Maurya, was born at Devkot, also Known as Kotivarsa, in north Bengal. The Place is identified with ancient Bangarh in West Dinajpur District. After Bhadravahu his disciple Godas, established an order known as Godasagana. Among the branches of this order split up from the main church, the three named as Tamraliptika, Kotivarsiya and Pundravardhaniya evidently belonged to Bengal. While Tamraliptika refers to the ancient city-port, Tamralipta,which lies buried at modern Tamluk on the Rupnarayan in Midnapur district, the other two obviously belonged to the northern parts of Bengal covering the ancient Kotivarsa and Pundravardhana.

-J.J volxvii.No-3,pg 82

ময়নামতি:

অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত ময়নামতী অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে প্রাপ্ত প্রাক-মৌর্যকালের খোদাই করা মুদ্রা এবং গুপ্তযুগের জৈন বিহারের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে। "One Monastic recluse of the Jainas is said to have been found at Mainamati now in Bangladesh.

-Smt. Bandana Saraswati, Jainism In Bengal

বাংলাদেশের নরসিংহডির উৎখননে খ্রীষ্টপূর্ব ৪৫০ বছর পূর্বের সভ্যতার অবশেষ পাওয়া যায়, যা থেকে অনুমান করা যায় যে ঐ সময় ওখানকার লোকেরা দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া এবং রোমের সঙ্গে বাণিজ্য করত। এই স্থান ঢাকা থেকে ৭৫ কি.মি. দূরে বারী এবং বটেশ্বর গ্রামের মধ্যবর্তী নরসিংডী জেলায় অবস্থিত। এখানে খননের ফলে অত্যন্ত প্রাচীন একটি কেল্লার অবশেষ পাওয়া যায় এবং ৬০০ খ্রী:পূ: খোদিত রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া যায়, যা থেকে অনুমান করা যায় যে এখানে একসময় একটি মহাজনপদ ছিল। আমরা এই সভ্যতাকে গঙ্গারিডই সভ্যতা বলে মনে করতে পারি। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ এই স্থানকে সোনাগড় নামে অভিহিত করেছেন। এখানকার প্রাপ্ত অবশেষ থেকে ২৫০০ বছরের প্রাচীন উন্নত হস্তশিল্পকলার নিদর্শন পাওয়া গেছে।

"A site dated to 450 B.C has been excavated in Narasingdi, Bangladesh. It may lead to the discovery of a part of the Brahmaputra civilization. The archaeologists, however, erroneously are trying to fit it into the Mauryan Empire, which came into existence more than a century later. They also assume that the people of the site traded with South-West Asians and the Romans. This site is older than Pundravardhan site, which has been dated to 370 B.C and some other ancient Bengal sites".

-January 8th,2002 News source

মহাস্থানগড়:

সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার পর যে নগর সভ্যতা আমাদের সব চাইতে আগ্রহের সৃষ্টি করে থাকে তা হল বাংলাদেশের মহাস্থানগড়। ওখানে খননকার্যের ফলে প্রাপ্ত অবশেষ থেকে জানা যায় যে, বাংলার কলা ও শিল্পসম্ভাবগুলির সিন্ধুসভ্যতায় প্রাপ্ত শিল্পকলার সাথে গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। "There is remarkable similarities of arts and crafts of Bengal with the artifacts found in Mohenjodaro and Harappa."

-Dr. D.C. Sarkar

১৯২৮-২৯ খ্রী: প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিদ্ কে.এন. দীক্ষিত এবং বগুড়ার প্রভাতচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক ওখানে এক প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে একটি গড়ের অস্তিত্বের আবিষ্কার হয়। এখানে প্রাপ্ত ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পাল যুগের পূর্বে গুপ্ত রাজাদের সময়ে ওখানে মন্দির এবং শহর ছিল। নিকটবর্তী অঞ্চল, যেমন, বসুবিহার, হলুদবিহার, সীতাকোট, জগদ্দল ইত্যাদি স্থানে অনেক টেরাকোটার মূর্তি এবং অনেক সামগ্রী পাওয়া গেছে। জৈনসাহিত্যে পুণ্ড্রবর্দ্ধন জনপদের যে বিবরণ-পাওয়া যায় তা এখানকার বলেই প্রতীয়মান হয়। সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েন সাংও পুণ্ড্রনগরের বিবরণ দিয়েছেন। অতএব এটি নিশ্চিতরূপে বলা যেতে পারে যে, পুণ্ড্রজনপদের মধ্যেই রাজশাহী, বগুড়ার মহাস্থানগড় তথা পাহাড়পুর, আদি ক্ষেত্রের অবস্থান ছিল।

মেগাস্থিনিসের বিবরণ:

প্রসিদ্ধ গ্রীক পন্ডিত তথা রাজদূত মেগাস্থিনিসের বিবরণে বাংলার অনেক মহত্বপূর্ণ স্থানের বিবরণ পাওয়া যায়। উনি জিন নামক অনার্য জাতির কথা বর্ণনা করেছেন। উনি বাংলার বঙ্গ এবং পুণ্ড্র জাতির কথা উল্লেখ করেছেন। এই অনার্যজাতির বিষয়ে মেগাস্থিনিস লিখেছেনঃ

1. All the Indians are free and none of them is a slave. They do not even use aliens as slaves and much less a countryman of their own.

2. They live frugally. They observe good order. Theft is a very rare accurrence. Their manners are simple. They have no suits about pledges or deposits. They confide in each other. Their houses and property they generally live are guarded. They possess good, sober sense.

3. Indians neither, put out money at usuary not known how to borrow. They do not do or suffer wrong. They neither make contracts nor suffer securities.

মেগাস্থিনিসের এই বর্ণনা শ্রমণ সংস্কৃতির সঙ্গে সংযুক্ত লোকেদের সার্বিক জীবনচর্যার প্রকৃতিকে প্রকট করে। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন:

" জৈনদের ধর্মগ্রন্থ কল্পসূত্র এবং বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ 'বোধিসত্বাবদান কল্পলতা' ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে খ্রী:পূর্ব সময় থেকেই পুণ্ড্রবর্দ্ধন সহ সমগ্র প্রাচ্যদেশ জৈন ধর্মের সর্বপ্রধান কেন্দ্র ছিল"।

মৌর্যকাল:

মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত শ্রমণসংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, যার বিবরণ জৈনসাহিত্য থেকে পাওয়া যায়। এ ছাড়াও শ্রবণবেলগোলায় চন্দ্রগিরি পর্বতে উৎকীর্ণ শিলালেখ থেকেও এ বিষয়ে জানা যায়। চন্দ্রগিরি পর্বতে বিন্দুসার দ্বারা নির্মিত মন্দিরাদি ও এই বিষয়ে আমাদের ধারণার পুষ্টিসাধন করে। আমি ইতিপূর্বে এ বিষয়ে উল্লেখ করেছি যে, চন্দ্রগুপ্তের গুরু ভদ্রবাহু স্বামী বাংলার অধিবাসী ছিলেন । তাম্রলিপ্তের উপর কলিঙ্গের অধিকার অশোকের কলিঙ্গ আক্রমণের প্রমুখ কারণ ছিল। বৌদ্ধধর্মগ্রন্থগুলি থেকেও আমরা মৌর্য আমলে বঙ্গভূমিতে নির্গ্রন্থ ধর্মের প্রভাবের কথা জানতে পেরেছি। এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য যে "মৌর্যরাজগণ যে সময় পাটলীপুত্র থেকে বঙ্গদেশ শাসন করেছেন, সেই সময়ে বঙ্গদেশে জৈনধর্মের প্রভাব এতই গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল যে পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।"

—বঙ্গাল মে জৈনযুগ কী স্মৃতি, শ্রী গোপেন্দ্রকৃষ্ণ ব্যাস।

চন্দ্রকেতু গড়ের প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে প্রাপ্ত মৌর্য যুগের জৈন অবশেষ এই ধারণারই পুষ্টি সাধন করে। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৪৯০ অব্দে বিম্বিসার শ্রেণিকের পুত্র অজাতশত্রু এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। তাঁর সৈন্যবাহিনীতে ৩০০০ হস্তীর এক বাহিনী ছিল। গ্রীকদের রচনা থেকেও জানা যায় যে, বাংলার রাজার কাছে ৪০০ নিপুন রণহস্তী ছিল। এ থেকে প্রতীয়মান হয়,বাংলার রাজা যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন। অজাতশত্রু যখন বৈশালীকে খণ্ড-বিখণ্ড করছিলেন তখন ওখানকার গণপতি চেতকের পুত্র শোভন রায় কলিঙ্গ পলায়ন করেন এবং নিজের জিনমূর্তিটি, যা তিনি নিয়মিত পূজো করতেন, সঙ্গে নিয়ে চলে যান। এই জিনমূর্তিটিকে মগধের নন্দরাজ কলিঙ্গ আক্রমণ করে মগধে ফেরৎ এনেছিলেন। অবশেষে কলিঙ্গ রাজ খারবেল মগধের রাজা পুষ্যমিত্রকে পরাজিত করে এই মূর্তিকে পুনরায় কলিঙ্গে ফেরৎ এনে প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রেণিক, অজাতশত্রু এবং নন্দরাজগণের সময় বাংলা যথেষ্ট শক্তিশালী রাজ্য ছিল। কলিঙ্গরাজ সম্রাট খারবেলের প্রভাব বাংলায়ও বিস্তৃতি ছিল। বঙ্গের এক বৃহদংশ কলিঙ্গের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। দক্ষিণবঙ্গ এবং কলিঙ্গের সংস্কৃতি প্রায় সম পর্যায়ে ছিল। হাতিগুম্ফা

শিলালেখ থেকে এটি পরিষ্কার হয় যে উড়িষ্যার রাজা খারবেলের অধীনে বাংলার অনেক ক্ষেত্র শাসিত হত । প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন :

'There is an indirect evidence to show that Jainism had established its influence in the 4th century B.C. The Hathigumpha inscriptions of Kharavela tell us that this king had brought back an image of the Jinas of Kalinga which had been taken away by Nanda. He was evidently a king of the Nanda dynasty who ruled over the Gangaridi or Gangaridai and the Prasioi, mentioned by the Greek Writers. Inspite of the loose manner in which these two terms are used by them, it may be reasonably inferred from the statements of the Greek and Latin writers that about the time of Alexander's invasion the Gangaridai were a very powerful nation ruling over the territory about the mouth of the Ganges, and either formed a dual monarchy with the Prasioi or were otherwise closely associated with them on equal terms in a common cause against the foreign invader. The Nanda King who carried the Jaina image from Kalinga may be taken as the ruler of the Gangetic Delta, and the carrying away of the Jaina image to preserve it with care (for it existed unimpaired for 2 or 3 centuries when Kharavela took it back to Kalinga) undoubtly shows a leaning for Jainism either on the part of the king, or of the people, or perhaps of both. Kharavela himself was a Jaina, and his own action shows how much the king yearned for the possession of a sacred image of a sect to which he was attached and it would not be unreasonable to take the same view about the Nanda king . It may of course be argued that if the Nanda King in question had a very extensive territory outside Bengal, his own religious feeling might not have reflected that of Bengal. But as the Gangaridai were the people of Bengal primarily, and the Kalinga was adjacant to this region, the view that the carrying away of the Jaina Image by the king of Gangaridai indicates the Jaina Influence in Bengal has a great degree of

probability.”

আজ পর্যন্ত যা জানা গেছে আলেকজান্ডার মগধের শক্তির ভয়ে ভীত হয়ে ভারত বিজয়ের স্বপ্ন অধরা রেখে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, কিন্তু গ্রীক ঐতিহাসিক গণের অনুমান বিবেচনা করলে বোঝা যায়, কেবল মগধ নয় বাংলার বিশাল আয়তনের সামরিক শক্তির ভয়ে ভীত হয়ে আলেকজান্ডার পশ্চাদপসরণ করেছিলেন।

“The first Western reference comes from Alexander’s invasion of India. Alexander had conquered much of the “known world” and had defeated the western kingdoms of India. They were stopped at the Magadha empire. The Greek Historians suggest that Alexander retreated fearing valiant attacks of the mighty Gargaridai and Prasioi empires which were located in the Bengal region. Alexander’s Historians refer to Gangaridai as a people who lived in the lower Ganges and its tributaries. These empires attest the level of organisation of the peoples of Bangla region.”

ঐতিহাসিক ডায়োডোরাসের রচনাতে উক্ত নামদুটির (গঙ্গারিডই ও প্রাসিঅই) উল্লেখ রয়েছে। “ These names are again mentioned by Diodorus. He describes Gangaridai as a nation beyond the Ganges whose king had four thousand trained and equipped elephants. Later Periplus and Ptolemy also indicate that Bengal was organised into a powerful kingdom at the onset of the first millennium A.D.”

‘Periplus of the Erythracan Sea’ গ্রন্থে বাংলার কিছু বিবরণ পাওয়া যায়:

“ When Greek historian Periplus talks about India in the first century A.D. apparently he speaks of Bengla. He says,“There is a river near it called the Ganges “(Ganga)”....On its bank is a market town which has the same name as the river, Ganges (ganga). Through this place are brought malabathrum and Gangetic Spikenard and pearls and Muslins of the finest sorts, which are called Gangetic.”

মৌর্যকাল:

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময় গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিস পাটলিপুত্র রাজদরবারে এসেছিলেন, যার বিবরণ তাঁর নিজের লেখা গ্রন্থ 'ইন্ডিকা'তে পাওয়া যায়, যেখানে তিনি তৎকালীন বিভিন্ন জাতি এবং স্থানের উল্লেখ করেছেন। উনি 'জিন' অনার্য জাতিদের সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে বঙ্গ ও পুণ্ড্রদের বর্ণনা দিয়েছেন। পুণ্ড্র এবং পৌণ্ড্র ভিন্ন ক্ষেত্র হিসেবে বলেছেন। গঙ্গার উত্তরের দেশ পুণ্ড্র এবং গঙ্গার দক্ষিণের দেশ পৌণ্ড্র।

অজয় নদ:

যে অজয় নদীর অববাহিকা অঞ্চলের বিবরণ আমরা ভগবান মহাবীরের বিচরণ ক্ষেত্র এবং কেবলজ্ঞান প্রাপ্তির স্থান রূপে দেখতে পেয়েছি মেগাস্থিনিস একে এ্যামিস্টিস রূপে বর্ণনা করেছেন। "The city Katadupa which this river passes,Wilford would identify with Katwa or Cutwa, in Lower Bengal,which is situated on the western branch of the delta of the Ganges at the confluence of the Adji. As the Sanskrit form, of the name of Katwa should be Katadvipa ('dvipa'an island) M.D st. Martin thinks this conjecture has much probability in its favour. The Amystis may, therefore, be the Adji, or Ajavati as it is called in Sanskrit,"

-Ancient India P.189.

ঝাড়খন্ড এবং বাংলায় অজয় নদকে একটি গুরুত্বপূর্ণ নদ হিসেবে মান্য করা হয়। মুঙ্গেরের, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ৩০০ মিটার উঁচু পাহাড় থেকে এর উৎপত্তি যা সিমজুরী, চিত্তরঞ্জনের নিকট বাংলাতে প্রবেশ করেছে। ঝাড়খন্ড, বর্দ্ধমান এবং বীরভূম সীমানার মধ্য দিয়ে কাটোয়াতে এসে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে এই নদ। এর দৈর্ঘ ২৮৮ কিলোমিটার যার মধ্যে বাংলায় এর দৈর্ঘ্য ১৫২ কিলোমিটার। পাহাড়ী রাস্তা অতিবাহিত করে বর্দ্ধমান জেলার আউসগ্রামে সমতল ভূমিতে নেমে আগে বাড়তে থাকে। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী নিম্ন খাত ধরে ঘন জঙ্গল এবং বড় বড় শালবৃক্ষের অরণ্য ভেদ করে অজয় একদিন প্রবাহিত হত। এই ঘন অরণ্য ও শাল বৃক্ষরাজি আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে।

বর্তমানকালে অজয় নদের নিকটে পাণ্ডুরাজার ঢিবির উৎখননে প্রাচীন সভ্যতার অনেক অবশেষ পাওয়া গিয়েছে, যা সিন্ধুউপত্যকা সভ্যতার সাময়িক বলে অনুমিত। এই স্থান অধুনা কাটোয়া শহরের সন্নিকটেই বলা যায়।

গঙ্গারিডি:

মেগাস্থিনিস তাম্রলিপ্তির লোকদের টেলেক্টো এবং মালদার নিবাসীদের মোলিন্ডী নামে উল্লেখ করেছেন। 'গঙ্গারিডি' বা 'গঙ্গারীদেশ' আধুনিক কালের নিম্ন বঙ্গদেশকে বোঝায় যার রাজধানীর নাম 'গঙ্গা' বলে উল্লেখ করেছেন। যা কোলকাতার নিকটবর্তী কোন অঞ্চলেই হওয়া সম্ভব। টলেমী ও লিখেছেন "এই নদী গঙ্গারিডি জাতির পূর্ব সীমা। এই জাতির হস্তিবল অসীম। এই কারণে এদের রাজ্য কোন বিদেশী রাজা জয় করতে পারেন নি। এমনকি অন্য সকল জাতি এই জাতির সৈনবাহিনীর অতিকায় আকার ও সংখ্যার আধিক্যে ভয়ে সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকত।"

চন্দ্রকেতুগড়:

ভগবতীসূত্রে যে ১৬ টি জনপদের বিবরণ পাওয়া যায় এর মধ্যে বঙ্গজনপদ এক বৃহৎ জনপদ ছিল যার সীমানা পূর্বে বাংলাদেশের ময়নামতী থেকে বিক্রমপুর বারীবটেশ্বর (ঢাকা), যশোর, খুলনা, চন্দ্রকেতুগড়, ২৪ পরগণা থেকে পশ্চিমে তাম্রলিপ্ত তথা মেদিনীপুর জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সকল জনপদের অস্তিত্ব ভগবান পার্শ্বনাথের সময়েও ছিল। ভগবান পার্শ্বনাথ এই সকল জনপদে বিচরণ করতেন। প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিকগণ এই সকল জনপদকে গঙ্গারিডি নামে উল্লেখ করেছেন, যার রাজধানীর নাম ছিল গঙ্গা, যা কোলকাতার সন্নিকটে দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। এই প্রসঙ্গে গবেষণা করলে দেখা যাবে কোলকাতা থেকে ৩৮ কিলোমিটার উত্তর- পূর্বে ২৪ পরগণা জেলায় চন্দ্রকেতুগড় অবস্থিত, যার অর্ন্তগত বেড়াচাঁপা, দেবালয়, শান্তপুর, হাদিপুর, জিক্রা, রানাখোলা, ঘোড়াপোটা,ধানপোটা, চুপড়িঝাড়া, মট্টবাড়ী, এবং গাজিয়াতলা। এখানে বেড়াচাঁপায় উৎখননে খ্রী:পূর্ব ৩০০ শতাব্দীর সভ্যতার অবশেষ পাওয়া গিয়েছে যা মৌর্যযুগের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এটি গঙ্গার তটবর্তী একটি বন্দর শহর ছিল। এখান থেকে বিদ্যাধরী নদী ১০ মাইল দূরে অবস্থিত, যা আজ মৃতপ্রায়। কিন্তু এখানে সমুদ্রে যাওয়ার জন্য একটি বাণিজ্যিক পথ-ছিল। ওখানে উৎখননের ফলে টেরাকোটা নির্মিত যক্ষিনী মূর্তির আবিষ্কার হয়েছে, এবং এখানে চীনামাটির পাত্র পাওয়া গিয়েছে যেখানে ব্রাহ্মী এবং খরোষ্টী লিপিতে লেখ পাওয়া গিয়েছে। এছাড়াও ওখানে একটি মহত্বপূর্ণ জিনমূর্তি ও একটি হস্তিমূর্তিও আবিষ্কৃত হয়েছে।

এই বিষয়ে শ্রী গৌরীশংকর দে লিখেছেন:

"Both the literary and archaeological evidences indicates that Bengal had an early associatian with Jainism. Jainism flourished in Bengal long before the Christian era and continued in its full form at least up to the 7th century A.D. Yet, the predominance of Jainism at one time in Bengal" is hardly in keeping with the very small number of images found representing that religion. Hence any and every discovery of Jaina relics from this province deserves attention of archaeologists, historians, art lovers and by men alike. In this connection the

torso of a Tirthankara found in the ruins of Chandraketugarh, a well known archacological site of West Bengal deserves special mention.

The figure was originally found by Mr.Yar Ali Mandal living in the vicinity of 'Khana-Mihir Dhibi Mr. Mandal found it on a marshy land (Beder Bil). Mr. Mandal also told me that he also found small stone elephant from the marshy land and made it over to an unknown person-I do not know if the said elephant was any part of the torso in my possession. Perhaps, it could give, if properly examined an elephant for the identification of the image since elephant is the cognisance of Ajitanatha.

This is a torso of a Tirthankar with Srivatsa marks on the chest. Its nudity, the stiff straight rose of its arms hanging down by its sides, indicative of the Kayotsarga attitude, characteristic of the Jainas, unmistakably prove that it is the image of one of the Tirthankaras."

"In the above mentioned contexts, the torso from Chandraketugarh, which has the closest resembrance with the Lohanipur Torso, represents the oldest Jaina image extant in Bengal. So the importance of the said image is indeed great."

পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা জেলাতে প্রাচীন জৈনমূর্তির আবিষ্কার উল্লেখযোগ্য। এই বিষয়ে লিখিত বিবরণ এই প্রকার:

"The present 24 Parganas represent one of the oldest parts of Bengal and was the meeting ground of different faiths. A considerable number of Jaina images have been discovered from both the northern and southern parts of the district. It is probable that some Jaina viharas also existed here in the past."

"Late D.K. Chakravorty of the State Archaeological Gallary,West Bengal, referred to a terracotta seal depicting a stupa and torana with a seated peacock upon it. He could not confidently associate the seal with Jainism as no definite Jaina

objects were yet found from Chandraketugarh or its neighbourhood. But now there is no doubt that Chandraketugarh was a centre of Jainism.”

-J.J. Volxvii

দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘি অঞ্চলে আদিনাথ, পার্শ্বনাথ এবং নেমিনাথের নবম শতাব্দীর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। মিহিরটিবির খাত থেকে তীর্থশিখর, গর্ভগৃহ এবং মন্ডপের অংশ বিশেষ পাওয়া গিয়েছে যা প্রমাণ করে যে এখানে একসময় কোন প্রাচীন মন্দির ছিল। হরিনারায়ণপুর, দেউলপোতা, বোড়াল, আটঘরা, নলগোড়া প্রভৃতি জায়গায় জৈন অবশেষের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে। অনেক জায়গায় অম্বিকা দেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। সুন্দরবনের গঙ্গার কিনারে অনেক পঞ্চতীর্থ মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল যা বাইরে পাচার হয়ে গিয়েছে। ‘ অশোকাবদান’ ও ‘দিব্যাবদান’ বৌদ্ধ-গ্রন্থথেকে জানা যায় রাজা অশোকের সময় পুণ্ড্র বর্দ্ধনে নিগ্রন্থ ধর্মের অবস্থান অনেক শক্তিশালী ছিল। অশোক পুণ্ড্রবর্দ্ধনের ১৮০০০ নির্গ্রন্থদের হত্যা করিয়েছিলেন বলে এমন বর্ণনা রয়েছে।

“That Jainism was in a flourishing condition in Pundravardhana in the 3rd century B.C. during the reign of Asoka is evident from another legend embodded in the “Divyavadana”. This legend relates that the lay divotees of the Jaina community of Pundravardhana had painted a picture which had shown the Buddha falling at the feet of Jaina. Being enraged at this news Asoka killed 18 thousand Ajivikas in a day (in Chinese translation in place of Ajivikas,Nirgranthas have been mentioned.)”

মৌর্যযুগে বাংলায় নির্গ্রন্থ ধর্ম অনেক প্রভাবশালী ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার ফারাক্কাতে খননকার্যের ফলে জৈন আয়াগপট্ট পাওয়া গিয়েছে যেখানে ধর্মচক্র এবং ত্রিরত্ন চিহ্ন অঙ্কিত ছিল। এই বিষয়ে ড:পি.সি. দাসগুপ্ত লিখেছেন:-

“ Thus, it will be found that the Nirgranthas gained a strong ground in Bengal as early as the age of the Imperial Mauryas. As an Emperor ruling from Patalipura Asoka was well aware of the popularity of the religion of the Nirgranthas and the institution of the Ajivikas. He honoured diverse religious schools with a prediction for the doctrine of Buddha in

a country distinguished by the age-old civilization of deva-worshippers. As for Bengal the 'Divyavavadana' refers to the Nirgranthas of Pundravardhana during the life time of Asoka. It may be noted that very recently a terracotta votive plaque visualizing the sacred wheel and the triratna flanked by what appears to be a goose has been unearthed at Farakka in Murshidabad district. On stylistic and stratigraphic grounds the object is datable to the Maurya-Sunga period. The plaque recalls the symbolic motifs of the Jaina Ayagapattas."

Jainism in Ancient Bengal
J.J.vol.xvii No.3.pg.82

মুরণ্ড রাজত্ব কাল:

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে পূর্বভারতে মুরণ্ড রাজাদের রাজত্বকালের আধিপত্য আনুমানিক ২৪০ বৎসর পর্যন্ত বহাল ছিল। জৈন, গ্রীক এবং চৈনিক সাহিত্যে, এই রাজাদের বিবরণ পাওয়া যায়। এই রাজারা ছিলেন জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষক। খ্রী: পূর্ব ২০০ শতাব্দীতে ভারহুত থেকে একটি বৈদিক লিপিতে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের উল্লেখ পাওয়া যায়। মথুরাতে একটি শিলালেখ পাওয়া গেছে, যেখানে রাঢ়দেশের কোন অধিবাসী কর্তৃক তীর্থঙ্কর মূর্তি উৎসর্গ করার কথা বলা হয়েছে। এই বিষয়ে Dr. R.C. Majumdar লিখেছেন:

" An inscription discovered at Mathura but now in Calcutta Museum, records the erection of a Jaina image in the Year 62 at the request of a Jaina monk who was an inhabitant of Rara. Rara is very probably Radha, a well known variant of Radha (in Bengal) and the date is to be referred to the kushana era and therefore, equivalent to about 150 A.D"

গুপ্তরাজত্বকাল:

পাহাড়পুর থেকে প্রাপ্ত গুপ্তযুগের তাম্রপত্র গুপ্তযুগে বাংলায় জৈনধর্মের প্রভাব দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করে, কারণ এখানে ভূগর্ভ থেকে ২৬ টি বিভিন্ন আকারের জৈন স্তূপ ছাড়া তাম্রপত্র ও পাওয়া গিয়েছে। এই বিষয় ড: আর.সি. মজুমদার লিখেছেন :

" One of the most important records on Jainism in Bengal is the Copper Plate incription from Paharpur (Rajshahi) in Bangladesh. Dated in the Gupta era 159 (478-79)A.D. it records a gift of land by a Brahmin couple for a Jaina Vihara at Vata Gohali. The Vihara,i.e. the monastic establishment, belonged to the Nirgrantha Acarya Guhanandin of the Pancastupa section of Banaras. On the site of this ancient Jaina Vihara was later on erected a Buddhist monument of outstanding plan and design which has been laid bare by excavction at Paharpur. It is possible that great temple with the terracces and the paved platform in the centre was inspired by the symbolic construction of a Jaina shrine conforming to the architactonic type of a Caumukha. Such a suggestion was made by K.N. Dikshit, the excavator. " In this connection," says Prof. S.K. Saraswati," We should also take into account a particular type of temples at Pagan in Burma, which may be described as an adaptation of Caumukha shrines of the Jainas."

The History of Bengal, edited by
Dr. R.C. Majumder, Dacca,1943p.507.

বিশ্ববিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ কে.এন দীক্ষিতের মতানুসারে পাহাড়পুরে জৈনবিহার ছিল। বাংলাদেশের পুরাতত্ত্ববিদ মহম্মদ শফিক আলমের মতানুসারে:

" The recently excavated structures were built in pre-Pala period. "Most probably the structure of a temple was built by followers of Jaina religion"-Pahapur Monastery."

জৈন কল্পসূত্র এবং অন্যান্য আগম সাহিত্যে গুপ্তযুগে কুমারগুপ্তের রাজত্বকালের বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। ঐ সময় তাম্রলিপ্ত, কোটিবর্ষ, পুন্ড্রবর্দ্ধন ও খর্বট দেশ জৈন ধর্মের প্রমুখ কেন্দ্র ছিল। বাংলার রাজশক্তিকে পরাভূত করে গুপ্ত সম্রাট বাংলাকে গুপ্ত সাম্রাজ্যাধীন করেছিলেন। ঐ সময় বাংলায় বর্মণ রাজাদের আধিপত্য ছিল। এই বর্মণ রাজারা ভারতীয় ইতিহাসে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। এই বর্মণরা কারা এবং কোথা থেকে বাংলায় এসেছিলেন, এই বিষয়ে ইতিহাস মৌন। কতিপয় বিদ্বান ব্যক্তি মনে করেন, এরা দক্ষিণ ভারতের কোন জাতি, এবং এদের পূর্বপুরুষ সিন্ধু উপত্যকা প্রদেশ থেকে কোন একসময় এসেছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের অর্ন্তভুক্তির পর বাংলাও এক শক্তিশালী রাষ্ট্রের অধীন হয়ে যায় এবং তাম্রলিপ্ত বন্দর বর্হিবাণিজ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে থাকে।

“ In the early phase of Gupta expansion, they defeated Bengal and annexed her, Two Varman kings of Bengal are defeated. This is the first mention of the Varmans. As Bengal came under their rule, Tamralipta again served as a major port. Once again under the Guptas, India became a great nation, in strength, culture, spirituality and science.

The Varmans as will be seen are very active throughout Indian history. They come from Dravir lineage in Bengal, and south India.

একথা অনেকে মনে করেন যে সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত বাংলার মোহানা দিয়ে তটবর্তী প্রদেশ অতিক্রম করে দাক্ষিনাত্যে সমর অভিযান করেছিলেন।

শশাঙ্ক :

৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রাপ্ত লিপি থেকে জানা যায়, গৌড়, যা বর্তমান মুর্শিদাবাদের রাঢ় ও বাগড়ী অঞ্চল, গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। যখন, মৌখরী, কলচুরী এবং কামরূপ রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহে গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে যায় তখন এই সময় শশাঙ্ক, যিনি শেষ গুপ্তসম্রাট মহাসেনগুপ্তের অধীনে এক সামন্ত রাজা ছিলেন, প্রভাকর বর্দ্ধনের সময়ে বাংলায় এক শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। মুর্শিদাবাদের সন্নিকটে অবস্থিত কর্ণসুবর্ণে শশাঙ্ক রাজধানী নির্মাণ করেছিলেন, এবং খুব দ্রুত বাংলার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে সমগ্র উড়িষ্যাও, জয় করেছিলেন। কিছু কিছু বিদ্বান ব্যক্তি বিশেষের মতানুসারে শশাঙ্ক মহাসেন গুপ্তের পুত্র কিংবা ভাতুষ্পুত্র ছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে উনি মহাসেন গুপ্তের নৌসেনাধ্যক্ষ ছিলেন।

" Sasnka accupies a prominent place in the history of Bengal. He is the first known king of Bengal who extended the kingdom beyond the geographical boundaries of the present state of West Bengal. He was a vassal chief of the Maukharies of Magadha. It has been said that he was either a son or a nephew of Mahasena Gupta, thereby a later Gupta himself. But most scholars think that he was a vassal chief under Mahasengupta though not related to the latter by kingship ties . There is hardly any doubt that the whole of Radha, including some portion of Vanga, like Bagri, were within his domains."

কিছু ঐতিহাসিক মনে করেন সপ্তম শতাব্দীতে শশাঙ্ক বৌদ্ধদের অপেক্ষা জৈনদের উপর অনেকবেশী অত্যাচার করেছিলেন।

" King Sasnka of Gouda has been accused for persecuting both the Buddhist and the Jains. However, from a perusal of the evidence of Aryamanjusrimulakalpa, it seems that the

torture and persecution suffered by the Jainas were more painful than that suffered by the Buddhists. Perhaps the numerical superiority of the Jainas to the Buddhists was the cause of heavier punishment for the Jainas,"

-J.J.volxvi No.3

কতিপয় বিদ্বজ্জন মনে করেন যে শশাঙ্ক প্রথমে জৈন ছিলেন, পরে তিনি শৈব ধর্ম গ্রহণ করেন। এর তুলনা, প্রসিদ্ধ পল্লব রাজ মহেন্দ্র বর্মন প্রথমে জৈন ছিলেন, পরে তিনি শৈব ধর্ম গ্রহণ করে হাজার হাজার জৈনদের হত্যা করেছিলেন। আসলে কেউ যখন কোন ধর্ম থেকে বেরিয়ে আসে, সে ঐ ছেড়ে আসা ধর্মের কট্টর শত্রু হয়ে যায়।

"But Sasanka was a bitter enemy of the Jainas. The author of Arya-Manjusri-Mula Kalpa states that Sasanka has destroyed the rest houses of the Jainas throughout the world i.e.his kingdom. The fact that Sasanka was a follower of the sect founded by Mahavira (i.e.Jainism) and that he persecuted the Jainas should not stand in the way of the proposed hypothesis or suggestions. The famous Pallava king Mahendra Varman was originally a Jaina, but when he was converted to Saivism by the saint called Appar, he did not hasitate to slay thousand of Jainas who refused to follow him in matter of religion. It is also a well-Known fact that in India Hindus converted to Islam persecuted their former co-religionists more severely than the born-Muslims.

JJvol/xvi N0-3

যখন প্রভাকরবর্দ্ধন নিজ রাজ্যের সীমানা দক্ষিণ এবং পশ্চিমে বাড়াতে সচেষ্ট হলেন, তখন বঙ্গদেশ এবং অসমে দুটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটে। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পতনের পর গৌড়রাজ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পর কর্ণসুবর্ণে শশাঙ্ক রাজধানী স্থাপন করেন, যা মুর্শিদাবাদের সন্নিকটে অবস্থিত এবং শীঘ্রই তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন । উনি প্রভাকরবর্দ্ধনের জামাতা মৌখরীরাজ গ্রহবর্মনকে হত্যা করে প্রভাকরবর্দ্ধনের পুত্র রাজ্যবর্দ্ধনকেও নিধন করেন। রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর সহোদর হর্ষবর্দ্ধন কনৌজের সিংহাসন গ্রহণ করে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে কামরূপরাজ ভাস্করবর্মার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন

করেছিলেন। কিন্তু শশাঙ্ক যতদিন জীবিত ছিলেন হর্ষবর্দ্ধন শশাঙ্ককে পরাস্ত করতে সমর্থ হন নি । শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হর্ষবর্দ্ধন বাংলার পশ্চিমাংশ জয় করেছিলেন, আর দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর বঙ্গ কামরূপ রাজ ভাস্করবর্মার হস্তগতহয়েছিল। চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাং এর সঙ্গে হর্ষবর্দ্ধনের সাক্ষাৎ এই বঙ্গের পশ্চিম অংশে কোথাও ঘটেছিল। হুয়েনসাং হর্ষবর্দ্ধনের অনেক প্রশংসা করেছিলেন। হুয়েন সাং যখন বাংলায় এসেছিলেন তখন শশাঙ্কের মৃত্যু হয়ে গেছে। তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে জানা যায়, জৈনদের উপর ব্যাপক অত্যাচার সংগঠিত হওয়ার পরেও বাংলার অনেকস্থানে জৈনদের সংখ্যা সর্বাধিক ছিল। এই সকল জায়গার মধ্যে ছিল পুণ্ড্রবর্দ্ধন ও সমতট। শশাঙ্কের রাজধানী শহর কর্ণসুবর্ণের সন্নিকটে মুর্শিদাবাদ জেলায় রক্তমৃত্তিকা নামক এক বৌদ্ধবিহারের অস্তিত্ব ছিল, যার বিবরণ হুয়েন সাং তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ করেছেন।

হুয়েন সাং এর ভ্রমণ বৃত্তান্তে কর্ণসুবর্ণ

HIUEN TSANG'S ACCOUNT OF KARNASUVARNA

" Karnasuvarna was one of the ancient capital of Sasanka, the first independent ruler of Bengal, who ruled over the kingdom of Gouda (Old name of Bengal) from 600-638 AD. It also contains the ruins of the ancient University of Raktamrittika Mahavihara, a leading educational institute of its time visited by the famous chinese traveller Hiuen Tsang.

The account left by Hiuen Tsang in his itinerary Si-Yu-Ki, is the only written record of the flourishing urban settlement of Karnasuvarna and Raktamrittika Vihar. According to his account Hiuen Tsang moved from Tamralipta (Tan-mo-li-ti), currently Tamluk in Medinipur to Raktamrittika (Lo-to-mi-chih) Vihar.

Hiuen Tsang gives a graphic description of Karnasuvarna, which acquaints us with the locality and its people. According to him, "The country was well inhabited and the people were very rich. The land was low and moist, farming operations were regular; flower and fruits were abundant, the climate was temperate and the people were of good character and were patrons of learning," This description indicates the prosperous state of the country,"

বৌদ্ধসাহিত্য আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্প অনুযায়ী শশাংক শৈব ধর্মাবলম্বী ছিলেন যিনি বৌদ্ধ ও জৈনদের বাংলা থেকে পলায়ন করতে বাধ্য করেছিলেন। তাঁর অত্যাচারের ফলস্বরূপ বাংলার জৈনদের রাজস্থান কিংবা গুজরাটে পুর্নবাসন গ্রহণ করতে হয়েছিল। জৈনদের উপর ক্রমবর্দ্ধমান অত্যাচারের ফলে জৈনরা প্রাচ্যদেশ ক্রমশ: পরিত্যাগ করতে শুরু করে, এবং ঐ সময় মগধ সহ রাঢ় অঞ্চলের মহান তীর্থক্ষেত্রগুলিতে প্রতিষ্ঠিত জৈন প্রতিমাগুলি পশ্চিম ভারতে নিয়ে আসা হয় ; এবং নতুন করে তা বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠা করা হয় । প্রতিমাগুলি যে সকল স্থানে

পুন:প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল তথাকার নামকরণ পূর্বাঞ্চলের তীর্থস্থানের নামেই করা হয়েছিল, যেমন—

১। নন্দীবর্দ্ধন প্রতিষ্ঠিত ক্ষত্রিয় কুণ্ডের ভগবান মহাবীরের মূর্তি "নন্দিয়া" নামে প্রতিষ্ঠিত হয়।

২। ব্রাহ্মণকুণ্ডের জিনমূর্তি 'ব্রাহ্মণবাড়া" নামে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩। ভগবান মহাবীরের দীক্ষাস্থলের মূর্তি "মুণ্ডস্থল"।

৪। দীপাবলীর দিন যে স্থানে ভগবান মহাবীরের নির্বাণ লাভ ঘটেছিল ঐ পাবাপুরীর জিনমূর্তি দিয়ানাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

৫। বর্ধমানের প্রতিমা "বড়বাণ" এ প্রতিষ্ঠিত হয়।

৬। কোটিবর্ষ নগরের কোটিকগচ্ছ এর জিন প্রতিমা "কোটয়ার্ক খড়ায়তা" বীজপুর এ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

৭। ঋজুবালিকার ভগবান মহাবীরের সিদ্ধস্থানের মূর্তি নানা (নাড়া) তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

-জৈন পরম্পরার ইতিহস, প্রকরণ ৩৫,পৃ: ১৮২

বাংলায় যে জৈন নিদর্শন বেঁচে গিয়েছিল তা অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা হয় নষ্ট করেদিয়েছিল কিংবা মূর্তিগুলির স্বরূপ বিকৃত করে বৌদ্ধ বা শিবরূপে পরিবর্তিত করে দেওয়া হয়েছিল।

" We shall not be far wrong, if we suppose, that the torture and the persecution suffered by the Nirgranthas or Jainas were not less severe than that experienced by the Buddhists. For the Gouda king had destroyed all the 'Vasatis' or living places and rest houses of the Jainas throughout the world i.e.throghout his kingdom and expelled them (i.e Nirgranthas or Jainas) therefrom. Further, it is this persecution, which is one of the many factors that lie behind the sudden eclipse of

Jainism from Bengal for a period spreading over a century or more."

JJ,July 191,P.12

. এই রাঢ় অঞ্চলের সঙ্গে জৈন তীর্থঙ্কর এবং শ্রমণদের যুগযুগ ধরে সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য ছিল এবং এই অঞ্চল প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে তীর্থঙ্করগণ পরিভ্রমণ করে আসছিলেন এবং অন্তত: নির্বাণ প্রাপ্তির সময়েও এই স্থানের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন। পরবর্তীকালে জৈনেরা এই সকল স্থানের সঙ্গে সম্পর্ক জুড়ে রাখতে অসমর্থ হয়।

-তিত্থয়র, জুলাই ১৯৮৫

শশাঙ্ক পরবর্তী বাংলা:

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলায় রাজনৈতিক অরাজকতা বা ডামাডোল সূচিত হয়েছিল। স্বল্পকালের মধ্যে হর্ষবর্দ্ধন এবং ভাস্করবর্মা সমগ্র বাংলা জয় করেন। অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে শৈলবংশের রাজা পৌণ্ড্র উত্তর বাংলা জয় করেন।। কনৌজের রাজা যশোবর্মন বাংলার উপর বিজয় পতাকা উড়িয়েছিলেন। এরপর কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যও বাংলা পর্যন্ত তাঁর রাজত্ব বিস্তার করেছিলেন। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে হর্ষ নামে কামরূপের এক রাজা বাংলা জয় করেছিলেন, এর পরে চরম অব্যবস্থা প্রকট হলে গোপাল নামে এক ব্যক্তিকে রাজা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছিল, যিনি সমগ্র বাংলাকে পুনরায় সংগঠিত করে বাংলায় পাল রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গোপালের পর ধর্মপাল রাজা হয়েছিলেন, যিনি বিক্রমশিলা মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর শাসন কালে পাল সাম্রাজ্য প্রসিদ্ধির চরম শিখরে পৌঁছেছিল। তাঁর অধীনে যে সকল মণ্ডল অধিপতিরা ছিল, এদের মধ্যে একজন ছিল ব্যাঘ্রতটীমণ্ডলের' যা পুণ্ড্র বর্দ্ধন-ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল । এই ব্যাঘ্রতটীমণ্ডল হল মুর্শিদাবাদের 'বাগড়ী' ক্ষেত্র; এ কথা কানিংহাম সাহেবও মনে করেন। দশম শতাব্দীর উত্তরার্দ্ধে রাজা বিগ্রহ পালের সময় কম্বোজ দেশীয় রাজা বাংলা জয় করেছিলেন, কিন্তু বিগ্রহপালের পুত্র মহিপাল তা পুনরায় পাল বংশের অধিকারে আনতে সমর্থ হন। পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে একথা জানা যায় যে মহিপালের অধীনে এসেছিল উত্তররাঢ়ও , যার মধ্যে ছিল বর্তমান মুর্শিদাবাদ। আজীমগঞ্জ থেকে পাঁচমাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে সাগরগদীঘি থানা, যা জঙ্গীপুর মহকুমার অর্ন্তভুক্ত, এর নামও মহিপাল। ওখানে একটি বড় স্তূপ পাওয়া গেছে। সেখানে খনন কার্যের ফলে টেরাকোটা এবং প্রস্তর নির্মিত মূর্তি, প্রভৃতি প্রত্নবস্তুর খোঁজ পাওয়া গেছে, যা পাল ও সেনযুগের বলে অনুমিত হয়েছে। ঐতিহাসিকদের মতে এখানে ছিল মহিপালের রাজধানী। সাগরদীঘি যা আজিমগঞ্জ থেকে দশ মাইল পশ্চিম-উত্তর দিকে এবং মহিপাল গ্রাম থেকে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে একটি বিশাল ঝিল রয়েছে যার দক্ষিণ কিনারে

কোন এক মুসলিম সন্ত্ এর এক দরগাহ, যা দেখলেই পরিষ্কার বোঝা যায় এখানে পূর্বে কোন মন্দির ছিল। আনুমানিক ৭০ সাল আগে নিখিলনাথ রায় একটি প্রস্তরখন্ডের উপর লিখিত লিপির সন্ধান পেয়েছিলেন, যা আজ ওখানে অবশিষ্ট নেই। একথা জনশ্রুতিতে রয়েছে যে এই লেখাটি মহিপালের নির্দেশে লেখা হয়েছিল।

আজিমগঞ্জ থেকে সাতমাইল দূরে উত্তদিকে লালবাগ মহকুমার অন্তর্গত গিয়াসবাগ, যাকে প্রথমে বদ্রীহাট নামে ডাকা হত। মহিপাল গ্রাম থেকে এই স্থান পাঁচমাইল দূরে; ওখানেও একটি মুসলিম রীতির গম্বুজ দেখা যায়, যেখানে কোন পাথর পালযুগের কোন মন্দিরের অংশবিশেষ মনে হয়। লেয়ার্ড এর মতে এই সব প্রমাণ ওখানে প্রাচীন নগরের উপস্থিতির আভাস দেয়, যা শ্রমণ সংস্কৃতির অনুসারী হওয়া সম্ভব। বেলাবার তাম্রলেখ থেকে জানা যায়, মহীপালের অধীনে বাংলাদেশের অনেক ক্ষেত্র শাসিত হত। কিছু পাল রাজা ছাড়া বাকীরা সব শ্রমণ সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন এবং এই সময় বহু জৈনমন্দির এবং মূর্তি নির্মাণ হয়েছিল।

কান্দী থানার জেমো গ্রামে অনেক মন্দির আছে যা আজ শৈব মন্দিরে পরিবর্তিত। রাজবাড়ীডাঙ্গা থেকেও অনেক নবম-দশম শতাব্দীর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। অমরকুণ্ড গ্রামেও অনেক জিন মূর্তি আজ বিষ্ণুরূপে পূজিত হচ্ছে। মহিপালের পুত্র নয়পালকে গঙ্গইদেব পরাজিত করেছিলেন। গঙ্গইদেবের পুত্র কর্ণ পশ্চিম রাঢ় ও পূর্ববঙ্গ জয় করেছিলেন। নয়পালের পুত্রদের মধে পরস্পর মনোমালিন্য ও বিভেদের কারণে কৈবর্তজাতির রাজা দিব্যোক বাংলায় নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তখন পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহের ফলে বাংলায় ছোটোছোটো অনেক রাজ্যের উত্থান ঘটে। রামপাল অবশেষে পৈত্রিক রাজ্য উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই সময় দক্ষিণ বঙ্গ চন্দ্রবংশীয় রাজাদের দখলে চলে যায়। সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে পশ্চিমবাংলায় মল্লরাজদের রাজত্বের সূচনা হয়েছিল। জগৎমল্লের সময় এঁদের রাজধানী বিষ্ণুপুরে ছিল।

সেন আমলে বাংলা:

রামপালের পুত্র মদনপালকে পরাজিত করে রাঢ়দেশের সামন্ত রাজা বিজয়সেন বাংলায় সেনসাম্রাজ্যের সূচনা করেন। বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন এবং বল্লালসেনের পর তাঁর পুত্র লক্ষণ সেন সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং

এলাহাবাদ পর্যন্ত নিজের সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। লক্ষণসেন তাঁর পিতামহ এবং পিতার নিকট সমরবিদ্যায় দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন, কারণ তিনি গৌড়,কামরূপ এবং কলিঙ্গ অভিযানে পূর্বসূরীদের সঙ্গী ছিলেন। এই সকল রাজ্য জয় করতে গিয়ে নিজ শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন এবং সম্ভবত: নিজে বিজয়ী না হয়েও উত্তরাধিকার সূত্রে তা প্রাপ্ত হন। কিন্তু সিংহাসনে আরোহনের পর তাঁকে স্বয়ং কঠিন সৈন অভিযানে নেতৃত্ব দিতে হয়েছিল। দক্ষিণে উড়িষ্যা অভিযানে তিনি কিছু সফলতা অর্জন করেন এবং পুরীতে নিজের বিজয়স্মারক স্থাপন করেন। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে কঠিন যুদ্ধ হয়েছিল গাহড়বাল রাজাদের সঙ্গে। এই যুদ্ধে উনি বিশেষ সফলতা অর্জন করেছিলেন এবং তাঁর বিজয়ী সৈন্যরা বারাণসী থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত বিজয়কেতন উড়িয়েছিল। বলা হয়ে থাকে, এই দুই জায়গায়ও উনি বিজয় স্তম্ভ নির্মাণ করিয়েছিলেন। নি:সন্দেহে বিহার তাঁর অধীনস্থ ছিল। উত্তর বিহারে আজও পর্যন্ত লক্ষ্মণ সম্বৎ নামক এক সম্বত প্রচলিত আছে। লক্ষণসেনের পরেও এই সম্বৎ প্রচলিত থাকার লিখিত প্রমাণ রয়েছে। নবদ্বীপে খুব সম্ভবত লক্ষণসেনের স্থানীয় স্কন্ধাবার বা শিবির ছিল।

লক্ষণসেন কবি-সাহিত্যিকদের আশ্রয়দাতা ছিলেন। তাঁর রাজদরবারে অনেক কবির সমাগম ঘটেছিল, যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কবি জয়দেব। লক্ষ্মণসেন স্বয়ং একজন কবি ছিলেন এবং পিতার এক অসমাপ্ত জ্ঞানগর্ভ পুস্তকের পূর্ণতা দান করেছিলেন। তাঁর সমসাময়িক এক মুসলমান ইতিহাসকার তাঁর দানশীলতা এবং বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি অনেকগুণের ভূরিভূরি প্রশংসা করেছেন। উনি তাঁকে ভারতীয় শাসকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলেছেন, যেমন মুসলমান দুনিয়ার খলিফাদের স্থান। তাঁর, মৃত্যুর পর তাঁর আত্মার মুক্তির জন্য তিনি প্রার্থনাও করেছিলেন। এক মুসলমান দ্বারা অমুসলমান সম্বন্ধে এই উক্তি নিশ্চয় একটি অসাধারণ ঘটনা। কিন্তু তাঁর বৃদ্ধ বয়সে বখতিয়ার খিলজীর চতুরতা পূর্বক আক্রমণে লক্ষণ সেনকে পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে নবদ্বীপ থেকে পলায়ন করতে হয়েছিল। অন্যদিকে উড়িষ্যার রাজা তৃতীয় অনঙ্গ ভীমের পুত্র প্রথম নরসিংহ ১২৪৩ খ্রী: বাংলায় মুসলিম শাসকদের আক্রমণ প্রতিহত করে তাদের পরাস্ত করেন, কিন্তু পরে তিনি পশ্চাদপসরণ করেন। তাঁর পুত্র দ্বিতীয় নরসিংহ মুসলমানদের পরাজিত করেছিলেন।

লক্ষণসেনের রাজধানী লক্ষণাবতী নগরী ও তাঁর মন্ত্রনালয়ের অনেক কাহিনী মেরুতুঙ্গাচার্য তাঁর রচিত 'প্রবন্ধচিন্তামণি' গ্রন্থে খুব সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন। রাজার চণ্ডাল কন্যার প্রেমে আসক্তির বিষয়ে কবি উমাপতি ধর যে

শ্লোক দ্বারা তাঁকে সাবধান করেছিলেন তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

১৩৫০ খ্রী: রাজশেখর সুরিকৃত 'প্রবন্ধকোষ' গ্রন্থে লক্ষণাবতী নগরীর বর্ণনা পাওয়া যায়। এই বর্ণনায় রাজা লক্ষণসেন ও তাঁর দুর্ভেদ্যদুর্গ প্রাকারের কথা জানা যায়।

জৈনাচার্যদের রচনা ব্যাতিরেক রাজপুতানার ডিঙ্গল সাহিত্যে লক্ষণসেনের নাম পাওয়া যায়। ১৪৫১ খ্রী: কবি দামো 'লক্ষণসেন পদুমাবতী চ উপর্হদ' নামে এক কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন। এখানে লক্ষণসেন ও পদুমাবতীর মধ্যে প্রেম কাহিনীর বর্ণনা রয়েছে।

'প্রবন্ধকোষ' গ্রন্থানুযায়ী গৌড়দেশে লক্ষণাবতী নগরে ধর্ম নামে এক রাজা ছিল। তাঁর রাজসভায় কবিরাজ বাকপতি একজন সভাসদ্ ছিলেন। জানা যায় জৈনাচার্য বপ্পভট্টীর পাণ্ডিত্য এবং গুণের জন্য সন্তুষ্ট হয়ে লক্ষণাবতীর রাজা তাঁকে অনেক সম্মান প্রদর্শন করতেন।

বপ্পভট্টী রাজা ধর্মের আগ্রহে লক্ষণাবতী নগরে বসবাস করেত থাকেন। গোপগিরির রাজা অম তাঁকে ফিরিয়ে আনার জন্য লক্ষণাবতী গিয়েছিলেন। অম রাজা ছদ্মবেশে রাজা লক্ষণসেনের রাজধানীর বারবণিতাদের গৃহে রাত্রি যাপন করেছিলেন। ঐ সময় গৌড় লক্ষণাবতী নগরে এক অসাধারণ বৌদ্ধপণ্ডিত ছিল। বপ্পভট্ট তাঁকে বিদ্যাবলে পরাজিত করা অসম্ভব জেনে কৌশলে তাঁকে পরাভূত করেছিলেন।

রাজা যশোধর্ম লক্ষণাবতী জয় করে রাজা ধর্মকে হত্যা করেন এবং কবি বাকপতি কবিরাজকে বন্দী করেন। বন্দীগৃহে থাকাকালীন বাকপতি 'গৌড়বধ' কাব্য রচনা করেন। এখান থেকে মুক্তিলাভ করে তিনি বপ্পভট্টীর নিকট গমন করেন এবং ওখানকার রাজা অমকে 'মহামোহ বিজয়' নামক একটি প্রাকৃত কাব্য শ্রবণ করিয়ে সন্তুষ্ট বর্দ্ধন করেন। এর ফলে তিনি যথেষ্ট পুরষ্কৃত হয়েছিলেন।

সম্ভবত বাকপতি প্রথমে মহাভারত কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, কিন্তু দ্বৈপায়ন এসে তাঁকে ভারত রচনা এবং সংস্কৃত ভাষায় রচনা করতে নিষেধ করেন। অত:এব উনি 'গৌড়বধ' নামক প্রাকৃত গ্রন্থ রচনা করেন। পূর্বদেশে লক্ষণাবতী নগরে লক্ষ্মণসেন নামক প্ররাক্রমশালী ও ন্যায়পরায়ণ রাজা ছিলেন। তাঁর একজন মন্ত্রী ছিলেন, নাম প্রজ্ঞাবিক্রমভক্তিসার কুমারদেব। বারাণসীরাজ গোবিন্দ চন্দ্রের পুত্র জয়চন্দ্র লক্ষণাবতী আক্রমণ করলে কুমারদেবের বুদ্ধিবলে লক্ষণসেনের সঙ্গে জয়চন্দ্রের শত্রুতা মিত্রতায় পরিবর্তিত হয়েছিল।

জৈন গ্রন্থাদিতে এই বিষয়ে অনেক আখ্যান পাওয়া যায়, যা থেকে গৌড়-লক্ষণাবতীর অনেক বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।

এই সমস্ত কাহিনী থেকে অনুমিত হয় যে সেনবংশের সময় জৈনদের সঙ্গে গৌড়বঙ্গের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কিছু অবশিষ্ট ছিল।

মায়া নির্যুক্তি :

একাদশ শতাব্দীতে ২০ শ্লোকবিশিষ্ট একটি পদ্যে রচিত গ্রন্থ পাওয়া যায়, যার নাম 'মায়ানির্যুক্তি'। তিব্বতীয় অনুবাদ অনুসারে এটি বৌদ্ধধর্মের একটি শাখা বজ্রযান বিষয়ক, যার রচনাকার অদ্বয়বজ্র। রচনাকারের নিবাস স্থান ছিল উত্তরবঙ্গের দেবীকোট বিহার, যা বর্তমান দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সদর বালুরঘাট থেকে চল্লিশ কি.মি দূরে অবস্থিত। অধ্যাপক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'মায়া নির্যুক্তির' ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন-

"It (Mayanirukti) treats of illusion and speaks of maya as magic. Some consider it to be magic and some think it to be true. For the satisfaction of illusions, the Yogin may enjoy all good, things of the world which come to him of their own accord, because he enjoys them as maya.".

"But a true Yogi should have the Earth for his bed, the quarters for his cloth and alms for his food. He should have forbearance all phenomena because they are not produced and his benevolence should be perennial."

" মায়ানির্যুক্তির' মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক সৎ যোগীর জীবনচর্যার আচার-বিচার যা একজন জৈন সাধুর জীবনচর্যার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং একথা বলা যেতে পারে, এই শ্লোকগুলি লেখার সময় অদ্বয়বজ্রের সামনে যেন কোন জৈন সাধুর জীবনচর্যার দৃশ্যভূমি উপস্থিত। অদ্বয়বজ্রের নিবাস স্থল দেবীকোট (বানগড়) ছিল জৈনধর্মের প্রাচীন একটি অতি মহত্বপূর্ণকেন্দ্র। অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন পাল এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন:

"In 'Maya Nirukti,' the criteria set for true Yogin or ascetic by Advayavajra are found in the following couplet :-

" Mahi sayya, diso vaso bhiksa bhaktam ca bhojanan
ajata dharmata ksantih kripana bhagavahini."

So,we may conclude without hesitation that Advayavajra in depicting the characteristics of the Yogins or

ascetics had before him the potrait of the 'Jinakalpi' or advanced Digambara ascetics who were well-known for their hard and strict monastic life and who were, perhaps, very numerous at "Devakota/Devikota at Kotivarsa Visaya in the Bhukti of Pundravardhana (North Bengal) during the eleventh century A.D."

মুর্শিদাবাদ:

ভগবান মহাবীর যে রাঢ়দেশে বিচরণ করেছিলেন এবং যেখানকার ভূমি তাঁর পাদস্পর্শে পবিত্র হয়ে উঠেছিল, সেই সকল অঞ্চলের মধ্যে আজকের মুর্শিদাবাদেরও একটি বড় অংশ বিদ্যমান। ভাগীরথী নদীর উভয় তীরে অবস্থিত মুর্শিদাবাদ জেলার ইতিহাস, ঐ সময়ের কঠিন পরিস্থিতিতে শ্রমণ সংস্কৃতির প্রভাব, ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের বীরত্ব, বৈভব এবং উত্থানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ভগবান মহাবীরের সময় এই স্থানকে কোটিবর্ষ বলা হত। এখানকার কিরাতরাজ ভগবান মহাবীরর নিকট প্রবজ্জা গ্রহণ করেছিল। পরবর্তীকালে উত্তর বাংলার কোটপুরকে কোটিবর্ষ বলা হয়েছে, কিন্তু প্রাচীন কোটিবর্ষ ঐখানেই (মুর্শিদাবাদ) ছিল। এর প্রমাণ, অতি প্রাচীনকাল থেকেই এইস্থানে গুরুত্বপূর্ণ জৈন তীর্থক্ষেত্র হিসেবে পরিচিতি লাভ, এবং বিভিন্ন উৎখননে প্রাপ্ত অতি প্রাচীন সভ্যতার অবশেষ। বৌদ্ধগ্রন্থ 'অঙ্গুত্তর-নিকায়' গ্রন্থে অঙ্গ জনপদের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ অনুসারে অঙ্গ জনপদের পূর্ব এবং উত্তর সীমানা দিয়ে গঙ্গা-ভাগীরথী প্রবাহিতা। বৌদ্ধসাহিত্যে বর্ণিত অঙ্গ জনপদের অর্ন্তভূক্ত ছিল উত্তররাঢ় ক্ষেত্র যা মুর্শিদাবাদকে বোঝায়। মহাভারতে বর্ণিত অঙ্গদেশের মধ্যে বঙ্গও সামিল ছিল, যার পশ্চিমে ভাগীরথী এবং পূর্বে মেঘনা আর পদ্মা নদী। অতএব মহাভারতে বর্ণিত অঙ্গদেশের মধ্যে সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলা সামিল ছিল। শ্রেণিক বিম্বিসার অঙ্গদেশ জয় করেছিলেন, যার অধীনে যুক্ত ছিল রাঢ়ভূমি। নন্দবংশের রাজাদের বিষয়ে ডায়োডোরাসও উল্লেখ করেছেন যে তাঁদের প্রভাব প্রাচী ও 'গঙ্গারেডই' ক্ষেত্রে বিস্তৃত ছিল। খারবেলের হাতিগুম্ফা শিলালেখও এই বক্তব্যের পুষ্টিকরণ করে। মহাস্থানগড় থেকে প্রাপ্ত অশোক-পূর্বযুগের শিলা-লেখ এই ধারণাকে দৃঢ় করে যে, মৌর্যকালেও এই ভূমি মৌর্য শাসনাধীন ছিল। ঐ সময় বাংলা এবং বিহার খনিজ এবং কৃষিজ সম্পদে সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল। মগধরাজ্যের সমস্ত ব্যবসায় বাণিজ্য গঙ্গা নদীর মাধ্যমেই সম্পন্ন হত, এর ফলে বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল বাংলা। মুর্শিদাবাদে কাটোয়া থেকে সাগরদীঘি পর্যন্ত ক্ষেত্র বাণিজ্যের দৃষ্টিকোণ

থেকে পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, তা কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যার উপর যে কোন বড় সম্রাট তাঁর আধিপত্য বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকত। এখানকার কংস শিল্প বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। আজও কাঁসার বাসন-কোষন তৈরীর সঙ্গে যুক্ত কারিগরদের নিবাস এই স্থানেই। কার্পাসজাত তন্তু দিয়ে বস্ত্র নির্মাণে দক্ষ শিল্পীরা ছিলেন এই ক্ষেত্রের মূল নিবাসী, যাঁরা সমৃদ্ধির ভিত্তি রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। রাজা-মহারাজারা এখানে অনেক মন্দির ও মূর্তি নির্মাণ করিয়েছিলেন। আজকের 'কিরিটেশ্বরী দেবী' র মন্দির মৌর্যযুগে একটি জৈনমন্দির ছিল। গুপ্তযুগে গৌড় গুপ্তসাম্রাজ্যের অধীন ছিল এবং গৌড়ের মধ্যে বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার রাঢ় এবং বাগড়ীক্ষেত্র অর্ন্তভূক্ত ছিল।

ফারাক্কাতে প্রাপ্ত মৌর্য ও শুঙ্গ যুগের প্রাচীন জৈন অবশেষ এই ক্ষেত্রে নির্গ্রন্থ প্রভাবের ব্যপকতা প্রমাণিত করে । শশাঙ্কের সাম্রাজ্যের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ এই জেলায় অবস্থিত। হুয়েনসাং এখানকার যে বর্ণনা করেছেন, তা থেকে জানা যায় শশাঙ্কের পর মুর্শিদাবাদ সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্যের অর্ন্তভুক্ত ছিল। এখানে ৫০ টি দেব মন্দির ছিল, যেখানে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল, যা থেকে এই অঞ্চলে জৈনধর্মের গভীর প্রভাবের কথা স্মরণ করায়। মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তরাংশে গৌড় রাজ্য ছিল, যেখানে রাজা ধর্মপাল আচার্য বপ্পভট্ট সুরির সময় বর্তমান ছিলেন । বপ্পভট্টসুরি তাঁর আমলে একজন মহান ও প্রভাবশালী জৈন আচার্য ছিলেন। ইনি শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের মোড়গচ্ছ শাখার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মুনি জিনপ্রভূসূরিজীর মতানুসারে উনি ভগবান মহাবীরের নির্বাণের ১৩০০ বছর পর মথুরার স্তূপগুলির সংস্কার করিয়ে নবকলেবর দান করেছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আচার্য প্রভাচন্দ্র দ্বারা লিখিত 'প্রভাকরচরিত্র' গন্থে, যেখানে ২২ জন আচার্যের চরিত্র বর্ণিত হয়েছে, বপ্পভট্টসূরির বিবিধ ব্যক্তিত্বের দীর্ঘ বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রভাচন্দ্রজীর বর্ণনানুযায়ী বপ্পভট্টসূরির অন্য একটি নাম ভদ্রকীর্তি যাঁকে বাদীকুঞ্জরকেসরী উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল।

" Bappabhattir bhadrakirtir Vadi Kunjarakesari
Brahmacari Gajovaroraja Pujita Ityapt."

The couplet means that Bappabhattisuri had a second name, Bhadrakirti; he was proficient in dialectics, he had vanquished a disputant, obtained for himself the title " The lion who defeated the elephant in debate". He was the greatest

Brahmacari or the most punctilious observer of the vows of chastity among the monks and was honoured by the royal personalities of the time".

১৩৪৮ খ্রী: রাজশেখর সূরি "প্রবন্ধকোষ" গ্রন্থেও বপ্পভট্টসূরির চরিত্রের বর্ণনা পাওয়া যায়। দীক্ষান্তে তিনি গোপগিরির রাজকুমার আমের সান্নিধ্যে আসেন এবং এর ফলে আমের উপর তাঁর প্রভাব অত্যাধিক ছিল। কনৌজের রাজা হওয়ার পর আম তাঁকে নিজের দরবারে নিয়ে আসেন। একদিন উনি চুপিসারে আমের রাজ্য থেকে নির্গমন করে পূর্ব দেশে গৌড়ের রাজধানী লক্ষণাবতী নগরীতে আসেন। তখন ওখানকার রাজা ছিলেন ধর্ম। বাকপতিরাজ, যিনি রাজা ধর্মের রাজদরবারে একজন সভাসদ্ ছিলেন, বপ্পভট্টসূরিকে রাজদরবারে নিয়ে আসেন। রাজ ধর্ম বপ্পভট্ট সূরির পান্ডিত্যে অত্যন্ত প্রভাবিত হন এবং তাঁর প্রভাবে রাজা জৈনধর্ম স্বীকার করেন।

"This attitude of Dharmapala to Bappabhatti and to his faith was construed as conversion of Dharmapala to Jainism. বপ্পভট্টসূরী রাজা ধর্মের সভায় কুঞ্জর নামক এক বৌদ্ধ পন্ডিতকে পরাজিত করেছিলেন, যার ফলস্বরূপ রাজা তাঁকে 'বাদীকুঞ্জরকেশরী' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

"It has been already stated that Bappabhatti was invited by king Dharmapala to enter into a religious debate with a great Buddhist Scholar Vardhanakunjara whom he eventually defeated and earned for himself the grand designation of " Vadi Kunjara Kesari" the lion who defeated the elephent in argument.

Mrs. Stevenson, Heart of Jainism.

বপ্পভট্টসূরীর অনুপস্থিতি রাজা আমকে অনেক পীড়া দিয়েছিল। তখন তিনি তাঁর নিজের কয়েকজন অনুচরকে লক্ষণাবতী প্রেরণ করেন সূরিজীকে ফিরিয়ে আনার জন্য। কিন্তু সূরিজী অসম্মতি জ্ঞাপন করলে স্বয়ং রাজা আম বেশভূষা পরিবর্ত্তন করে ছদ্মবেশে লক্ষণাবতী নগরে আসেন এবং তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে সমর্থ হন। ফিরে আসার পর বপ্পভট্টসূরি নিজের গুরু সন্দর্শনে গমন করেন। আচার্য সিদ্ধসেন নিজের গচ্ছ বা শাখার সকল দায়িত্ব তাঁর উপর সমর্পণ করেন।

বৌদ্ধ পণ্ডিত বর্দ্ধন কুঞ্জর কে ছিলেন এবং এই কাহিনীর কোন ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে কিনা এই বিষয়ে অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন পাল বলেছেন :

" The present writer is of the opinion that Vardhana Kunjara of Jaina tradition and Purnavardhana of Lama Taranath's book is identical and the same person. Lama Taranath in his famous book "History of Buddhism in India" has put up a list of Buddhist preachers, teachers and scholars who illuminated the horizon of Eastern India during the reign of Dharmapala. In that list Purnavardhana accupies a pre-eminent place among the Buddhist Acaryas. And to Purnavardhana Tibetan Tanjur attributes the authorship of a commentary on Abhidharmakosa and an abridged version of the same. It seens that Vardhanakunjara of Jaina tradition and Taranatha's Purnavardhana is one and identicial person and this misfortune being defeated by Jaina Acarya Bappabhattisuri."

ঐতিহাসিকদের মতানুসারে রাজা ধর্ম, যাঁর দরবারে বপ্পভট্টসূরির অনেক সম্মানজনক উপস্থিতি ছিল, তিনি আর কেউ নন পাল বংশের রাজা ধর্মপাল। যদিও বলা হয়ে থাকে ধর্মপাল বপ্পভট্টসূরির প্রভাবে জৈন সংস্কৃতি গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু আমার মনে হয় প্রাথমিক অবস্থায় উনি জৈনই ছিলেন। এই জন্য বপ্পভট্টসূরিকে সমাদর করতেন। ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুযায়ী একজন জৈন রাজাই সর্বধর্মের সংরক্ষণ কিংবা সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সক্ষম।

In fact, the long sojourn of Bappabhatti to Bengal, the vain but bold claim of conversion of Dharmapala to Jaina Faith, the discomfiture of a Buddhist scholar in a religious debate, all these fact unerringly point to the vigorous existence of the Jaina community in an age when Buddhism was in resurgence in Bengal."

-Dr.Chittaranjan Pal

'বসন্ত বিলাস' কাব্যের সর্গে বর্ণিত হয়েছে, চালুক্য রাজের মন্ত্রী বস্তুপাল কর্তৃক 'তীর্থযাত্রা সংঘের' পরিভ্রমণের সূচনা, যার মধ্যে গৌড়দেশের সংঘপতি

যুক্ত ছিলেন। ৮৮৮ খ্রী: প্রাপ্ত তাম্রলেখে 'যশস্তিলক' নামক এক চম্পূসাহিত্যের লেখক সোমদেবকে গৌড়দেশের একজন সাধু হিসেবে বলা হয়েছে। সোমদেব 'যশস্তিলক' গ্রন্থে তাম্রলিপ্তকে গৌড়মন্ডল এর অন্তর্গত বলে উল্লেখ করেছেন। অতএব নি:সন্দেহে মধ্য বঙ্গের রাঢ় অঞ্চল মুর্শিদাবাদ গৌড় সাম্রাজ্যের অর্ন্তভুক্ত ছিল।

একপ্রকার সপ্তম শতাব্দীর পর ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক বড়মাপের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, যখন ভারতবর্ষে বহি:শত্রুর আক্রমণ ও শাসন বিস্তার ও কায়েম করার ব্যপক প্রয়াস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। এর কারণ যদি নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান করা যায়, তখন দেখা যাবে যে এর মূলে রয়েছে আগ্রাসী ব্রাহ্মণ্যবাদের বিস্তার, যা শ্রমণ সংস্কৃতির ক্রমাবনতির সূচনা ঘটায়। অন্যভাবে ব্যাখ্যা করলে যা দাঁড়ায়, তা হ'ল ব্রাহ্মণদের আধিপত্যের বৃদ্ধি ঘটানো ও ক্ষত্রিয়দেয় প্রভূত্ব হ্রাস করা, অস্পৃশ্যতা, জাতিপ্রথা এবং অলৌকিক কর্মকাণ্ড ও বাহ্য আচারের চর্যা বৃদ্ধি পাওয়া। লোকেরা জাগতিক বিষয়-আশয় কে কেন্দ্র করে হোম, যাগ-যজ্ঞ, পশুবলি,মন্ত্র-তন্ত্র, প্রভৃতির দিকে ঝুঁকতে থাকে। সামাজিক বৈষম্য ক্রমশ: বাড়তে বাড়তে চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়। ক্ষত্রিয়দের প্রভাব প্রতিপত্তি কম হওয়ার ফলে প্রজাকল্যাণের ভাবনা ও কার্যে প্রবল ঘাটতি দেখা দেয়। যে ক্ষত্রিয় রাজাদের প্রজাপালনে ব্রতী হওয়ার কথা, তাঁরা ব্রাহ্মণদের প্রভাবে জনহিতকর কর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েন। ব্রাহ্মণদের জন্য সকল প্রজা কল্যাণ ভাবনা সীমিত হয়ে যায়। পরিণাম স্বরূপ ভারতে বিদেশী শক্তির অনুপ্রবেশ ও আক্রমণ বৃদ্ধি পায়। পরম দুর্ভাগ্যের বিষয় যে যেখানে আদিকাল থেকে উচ্চকোটির শ্রমণ পরম্পরার প্রবাহ বিদ্যমান ছিল, তার জায়গায় শুরু হয়ে যায় হিংসা, ভীরুতা, কাপুরুষতা এবং ক্ষুদ্র স্বার্থসর্বস্ব চিন্তা। যে আলেকজান্ডার প্রাচ্যদেশে শ্রমণ সংস্কৃতির প্রভাবাধীন ক্ষত্রিয় রাজাদের বল ও বীর্যের ভয়ে ভীত হয়ে পশ্চাদপসরণ শ্রেয় মনে করেছিলেন, সেই সব ক্ষত্রিয়-রাজন্যগণের উত্তরসূরীরা ধোঁকাবাজি, বেইমানি আর দুরাচারে নিমজ্জিত হয়ে যান। এর ফলে ভুগতে হয়েছিল জনসাধারণ তথা তথাকথিত 'ছোটো জাতের' মানুষদের। বীরদের পৌরুষ ও অহিংসা, কাপুরুষতা ও হিংসায় পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল, যার পরিণাম ছিল ভয়ঙ্কর। যে ভারতে কখনও বৈদেশিক আক্রমণকারীদের আধিপত্য কায়েম হয় নাই, যেখানে ভারতীয় লোকেদের দাসত্বের শৃঙ্খল পরিধান করে শত শত বছর জীবন কাটাতে হয়েছিল। বংলায় এর সূচনা ঘটেছিল বখতিয়ার খিলজির হাতে ছলচাতুরির দ্বারা লক্ষণ সেনের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে।

বখতিয়ার খিলজী দ্বারা নদীয় আক্রান্ত হলে লক্ষণ সেন পূর্ববঙ্গে পলায়ন করেন। তাঁর সঙ্গে ওখানকার শিল্পীগণও পূর্ববঙ্গে চলে যান, এবং কিছু কিছু মানুষ পশ্চিম ভারতেও পাড়ি জমান। নদীয়া দখলের পর বখতিয়ার খিলজী গৌড় এবং লক্ষণাবতী জয় করেছিলেন। ১২০৬ খ্রী: বখতিয়ার উত্তর রাঢ় আক্রমণ করেন এবং ওখানকার অনেক স্থান দখল করে নেন। মুহম্মদ শৈরান খিলজী ঐসব জায়গায় সামরিক শাসক ছিলেন। ১২১৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১২২৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গিয়াসুদ্দীন ইজাজ খিলজীর সময় শেষ হিন্দুরাজা বিশ্বরূপ সেন পরাজিত হন। ১২৫৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে মল্লিক তাজউদ্দিন আরসালাম খান, যিনি দিল্লী সুলতানের অধীনে বিহারের সুবেদার ছিলেন, লক্ষণাবতী অধিকার করেন। তাঁর অধীনে ছিল মুর্শিদাবাদের বাগড়ী অঞ্চল। ঐ সময় পূর্ববাংলার মধ্য ক্ষেত্র চন্দ্রদ্বীপের রাজা দনুজমাধব রায়ের অধিকারে চলে আসে। ১২৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মাগিসুদ্দিন তুঘলক, যিনি লক্ষণৌতির শাসক ছিলেন, নিজেকে স্বয়ং স্বতন্ত্র সুলতান ঘোষণা করে দিল্লীর সুলতান বলবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, কিন্তু তিনি বলবনের কাছে পরাজিত হন। বলবন বুগরা খানকে লক্ষণৌতি, সাতগাঁও এবং ঢাকার সুবেদার নিযুক্তি করেন।

১৩৪৫ খ্রীষ্টাব্দে বুগরা খান পুরো বাংলার উপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন। তাঁর পুত্র সিকন্দর শাহ গৌড়ের আদিনাথ ঋষভদেবের মন্দির বিনষ্ট করে ওখানে এক মসজিদ নির্মাণ করান, যা আজ আদিনা মসজিদ নামে পরিচিত। হাজী ইলিয়াস আলাউদ্দিনকে হত্যা করে ইলিয়াস শাহী বংশের রাজত্বের সূচনা করেন। তাঁর আমলে দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক বাংলা আক্রমণ করেন কিন্তু ব্যর্থ হন । ১৪২৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজা গণেশ লখণৌতির উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে পুনরায় হিন্দুরাজ কায়েম করতে সমর্থ হয়েছিলেন, যা ২৯ বছর পর্যন্ত বহাল ছিল। তাঁর পর হুসেনশাহী বংশের স্থাপনা হয়েছিল। আনুমানিক ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে শেরশাহ সূরি গৌড় দখল করেন এবং উনি বাংলার প্রশাসনিক সংস্কারের ভিত্তি রচনা করেন। ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের সেনাপতি মুনীম খাঁ দাউদ খাঁ করনাণীকে পরাজিত করে সমগ্র বাংলা জয় করেন কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর পুনরায় বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়। অত:পর ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে আকবর তাঁর সিপাহসালার সইদ খানকে বাংলায় প্রেরণ করেন। কিছু ঐতিহাসিকদের মতানুযায়ী তাঁর ভ্রাতা মকসুদখানের নাম অনুযায়ী মুকসুদাবাদ থেকে মুর্শিদাবাদ নামের প্রচলন।

"In August 1587, Akbar sent Said Khan as his Sipahasalar or Governor for the Subah of Bengal. It seems that he was

probably able to bring the present Murshidabad, or at least its Bhagirathi riparian part, under his effective administration. For it seems that during his tenure as the Mughal Viceroy of Bengal that the foundation of the town of Maqsudabad was laid by his brother Maqsus Khan or Kakhsus Khan."

মুসলিম ইতিহাসকার গুলাম হোসেন সেলিম লিখিত রিয়াজ-উল-সালাতীন অনুসারে মকসুসাবাদ বা মকসুদাবাদ এক ব্যাপারী মখসুসখানের নাম অনুসারে প্রচলিত হয়েছিল, যিনি একটি সরাইখানা নির্মাণ করেছিলেন।

"According to Riyas-us-Salatin, the place was Called Maqsusabad after a merchant named Makhsus Khan who built a Sarai there. This Makhsus Khan finds mention in the Ain-i-Akbari of Abul Fazl, as a noble man. It appears from the narrative of Riyaz-us-Salatin that by the end of the sixteenth century, the area occupied by the end of the town of Murshidabad was placed on regular trade route and the number of traders using the route had became quantitatively so significant as to merit the establishment of a rest house."

সইদ খানের পরে আকবর আজমীরের রাজা মানসিংহকে বাংলায় প্রেরণ করেন। মানসিংহ মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমার আতাই শেরপুর নামক জায়গায় আফগান ও পাঠান বিদ্রোহীদের নির্ণায়ক রূপে পরাজিত করেছিলেন এবং বাংলাকে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

"On March 1594, Said Khan was replaced by Raja Mansingh as the Mughal Viceroy of Bengal. Saddened by personal losses and shaken by Bengal climate Man Singh retired to Ajmir in 1598 leaving behind a deputy to govern Bengal Subah from Rajmahal, the new capital. Taking advantage of the general's absence, Usman Sajawal, other turbulent Pathan chiefs, Kedar Rai and other Zamindars, who had earlier made deceptive submissions, rose in revolt and caused heavy losses to Mughal detachments placed at various points. Man Singh hastened back to Bengal and pushed on to face the

rebels in East Bengal. In a single battle of Sherpur Atai, within Khargram Police Station area of the modern Kandi Sub-division, on 12th February 1601. Man Singh inflicted a decisive defeat on the combined army of the rebellious Afghan and Pathan chiefs of the East, South and South-West Bengal.

এইভাবে আকবর বাংলাকে মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন। আকবর দীর্ঘদিন বাংলা দখলের জন্য যুদ্ধবিগ্রহ চালিয়েছেন এবং অবশেষে জয় লাভ করেন। কিন্তু বাংলার প্রশাসন চালানোর খুব একটা অবসর তিনি পান নি। তাঁর মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীরের আমলে মুঘল শাসনের প্রকৃত সূচনা সম্ভব হয়। ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর ইসলাম খান চিস্তিকে বাংলার সুবেদার পদে নিযুক্ত করেন। ইসলাম খান অনেক ছোট ছোট রাজ্য ও রাজবংশগুলিকে মুঘল শাসনাধীনে নিয়ে আসেন। ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে রাজমহল থেকে বাংলার রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত। জাহাঙ্গীরের পরে ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে শাহজাহান সম্রাট হন।

আলাউদ্দিন হোসেন শাহর সময় সর্বপ্রথম পর্তুগালের বণিকেরা বাংলায় এসেছিল। এরপর পর্তুগীজ বণিকেরা বহুবার বাংলায় বানিজ্যের জন্য আসতে থাকে। এরা দেশীয় ছোট ছোট রাজা তথা জমিদারদের সহায়তায় মুঘল শাসনে নানাবিধ বিঘ্ন ঘটাতে থাকে। এরা আকবরের কাছ থেকে হুগলী জেলার ব্যান্ডেলে নিজেদের কুঠী তথা উপনিবেশ গড়ে তোলার জন্য ফরমান বা আদেশ লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল। শাহজাহান পর্তুগীজদের ব্যান্ডেল থেকে উৎখাতের জন্য বাংলার সুবেদার কাসিম খানকে আদেশ দিয়েছিলেন। মুঘল বাহিনীর নিকট পর্তুগীজরা পরাজিত হয়েছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে মুর্শিদাবাদ এক ব্যবসায়-বাণিজ্যের বৃহৎ কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিভিন্ন বাণিজ্য বস্তু ছাড়াও কেবল রেশম বস্ত্র শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে মুর্শিদাবাদ সুবেদারের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সকল বাণিজ্য থেকে কর আদায়ের জন্য মুর্শিদাবাদে সুবেদার শায়েস্তা খাঁ উপযুক্ত প্রশাসনিক আধিকারিক নিয়োগ ও তাদের কার্যালয় স্থাপন করেছিলেন।

শাহজাহানের রাজত্বকালে, তাঁর এক পুত্র সুজা বাংলার সুবেদার ছিলেন। উনি রাজমহল থেকে নিজেকে বাদশাহ হিসেবে ঘোষণা করে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। ঔরঙ্গজেব তাঁর সেনাপতি মীর জুমলাকে সুজার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন, যিনি বেলাঘাট নামক স্থানে এক যুদ্ধে সুজাকে পরাজিত করেছিলেন। মীরজুমলার পর দুজন অস্থায়ী সুবেদারের পর শায়েস্তা খাঁ বাংলার সুবেদার নিযুক্ত

হন।

মকসুদাবাদের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা ঘটেছিল যখন ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে শাহজাদা আজিম উস সান, যিনি ঔরঙ্গজেবের প্রপ্রৌত্র ছিলেন, বাংলার সুবেদার হলেন এবং করতলবখান নিযুক্ত হলেন বাংলা সুবার দেওয়ান হিসেবে। এই দুজনের মধ্যে বনিবনার অভাবে করতলবখান সুবার দেওয়ানি দপ্তর ঢাকা থেকে মকসুদাবাদে স্থানান্তরিত করেছিলেন। ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে দেওয়ান করতলবখানকে ঔরঙ্গজেব মুর্শিদকুলী খান উপাধিতে ভূষিত করে 'মকসুদাবাদের' নাম 'মুর্শিদাবাদ' এ বদল করার অধিকার প্রদান করেন। মুর্শিদকুলী খান সমগ্র বাংলাকে ১৩ টি চাকলা বা বিভাগে বিভক্ত করেন যার মধ্যে মুর্শিদাবাদ চাকলায় বাংলার নতুন রাজধানীর পত্তন হয়। এইভাবে মকসুদাবাদ মুর্শিদাবাদ নামে পরিচিতি লাভ করতে থাকে।

মুর্শিদকুলী খাঁ:

মুর্শিদকুলী খাঁর আসল নাম ছিল মহম্মদ হাদী, জন্মে ছিলেন একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ সন্তান কিন্তু উনার বাল্যকাল কেটেছে কোন ইরানী ব্যাপারী হাজী সাফিয়ার অভিভাবকত্বে। তিনি পরে মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত হন। প্রতিপালক অভিভাবকের মৃত্যুর পর উনি ভারতবর্ষে আসেন। ঔরঙ্গজেব তাঁর যোগ্যতা দেখে তাঁকে হায়দারাবাদের দেওয়ান নিযুক্ত করেন। ১৭০২ খ্রী:ষ্টাব্দে বাংলার সুবেদার শাহজাদা আজিমুসসানের অধীনে তাঁকে বাংলার দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেন ঔরঙ্গজেব এবং উপাধি দেন, করতলবখান নামে;১৭০৩ খ্রী: উনাকে বাংলার উপ-নবাব-নাজিম এর পদে নিযুক্ত করে নতুন উপাধি দেন,মুর্শিদকুলী খাঁ। মুর্শিকুলী খাঁ একজন যোগ্য নবাব ছিলেন। তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতার কারণে তাঁকে বংলার টোডরমল বলা হয়ে থাকে। শেরশাহের পরে অনেকে এঁকে বাংলার সবচাইতে যোগ্য শাসক বলে মনে করেন। উনি অনেক অর্থনৈতিক সংস্কার করেছিলেন।

ভৌগোলিক দিক দিয়ে ভাগীরথী নদী মুর্শিদাবাদকে দুভাগে বিভক্ত করেছে। ভাগীরথীর পূর্বভাগ 'বাগড়ী ও পশ্চিম ভাগ 'রাঢ়' নামে পরিচিত। উত্তরে গঙ্গার মুখ্য ধারা মালদা এবং রাজশাহী জেলাকে বিচ্ছিন্ন করেছে। দক্ষিণে এর সীমা বর্দ্ধমান এবং নদীয়া জেলা জুড়ে চিহ্নিত, পশ্চিমে বীরভূম এবং সাঁওতাল পরগণা। গঙ্গার প্রমুখ ধারা থেকে নির্গত ভাগীরথী মুর্শিদাবাদ জেলার মোটামুটি মাঝ বরাবর উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত বাহিত হয়েছে। ভাগীরথীর পূর্ব ভূমি নীচু এবং উর্বর কিন্তু পশ্চিম প্রান্তের ভূমি কিছু উঁচু। ওখানকার মৃত্তিকার রঙ লাল। এর পশ্চিমে দুটি প্রধান নদী, উত্তরে বাঁশলোই এবং এর দক্ষিণে দ্বারিকা। পূর্বে জলঙ্গী এবং ভৈরব নদী উত্তরে গঙ্গার মুখ্য ধারায় মিলিত হয়েছে। জেলার উত্তরে নূরপুরে ভাগীরথী গঙ্গা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এখান থেকে ২৫ মাইল দূরে ফারাক্কা বাঁধ অবস্থিত যা মালদা এবং মুর্শিদাবাদের সীমাকে যুক্ত করেছে। জঙ্গীপুর থেকে কিছু আগে বাঁশলোই ; পাগলা নদীর জল এখানে পতিত হয়েছে। শক্তিপুরে দ্বারিকা নদীর সহায়ক নদী চোরাডোকরা এখানে মিলিত হয়েছে। ভাগীরথীর উপনদী পূর্বে পরিত্যক্ত ভগবানগোলা পর্যন্ত প্রবাহিত স্রোতকে ললিতকুড়ী বা নলতাকুড়ী বলা হয়ে থাকে। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে কাশিমবাজারের নিকট আপন

স্রোতধারা পরিত্যাগ করে ভাগীরথী তিনমাইল পশ্চিমে সরে যায়।

"All these places (Cassimbazar and the adjacent villages were originally situated on a curve of the river Bhagirathi, but seventy years ago a straight cut was made forming the chord of the curve changing the course of the river. This engineering operation was followed by the breaking out of epidemic fever, which in virulence and mortality, is unparalleled by any pestilence since that, which destroyed Gaud. The old Channel survives as a khal which is used by boats in the rains. It is curious that it is called Kati-Ganga as if it were an artificial Channel and there is tradition that the sahebs cut a channel and brought the river out to the north of Faras danga. There are also some artificial tanks some of which are large enough to be called lakes. The largest is the Sagardighi, sheikhadighi etc."

মুর্শিদকুলি খাঁ দাক্ষিনাত্যের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই তাঁর পিতামাতা তাঁকে ইসফাহানি নামক এক ইরানজাত উচ্চপদস্থ মোগল কর্মকর্তার কাছে বিক্রয় করেন। হাজী শফি ইসফাহানী তাঁর নতুন নাম করেন মহম্মদ হাদী। ইসফাহানীর কাছে পুত্রস্নেহে লালিত মহম্মদ হাদী তাঁর সাথে ইরান গিয়ে ফার্সি ভাষা ও সংস্কৃতি আয়ত্ত করেন।

বানিজ্যিক পরম্পরায় মুর্শিদাবাদ:

১৪০০ বছর পূর্বে মুর্শিদাবাদ জেলার কর্ণসুবর্ণ মহানগর পরাক্রমশালী রাজা শশাঙ্কের রাজধানী ছিল । ওখানকার রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল : ওখানে অনেক মন্দির এবং বিহার ছিল। 'রক্তমৃত্তিকা'র অর্থ হল 'লালমাটি'। হিউয়েন সাঙ্ তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে এখানকার একটি বিহারের বিবরণ-দিয়েছেন। আনুমানিক পঞ্চম শতাব্দীর একটি প্রস্তরখোদিত লেখ মালয় দ্বীপে পাওয়া গিয়েছে, সেখানে রক্তমৃত্তিকায় বসবাসকারী এক মহানাবিক বুদ্ধগুপ্তের পরিচয় পাওয়া যায়, যা থেকে স্পষ্টত: বোঝাযায় মুর্শিদাবাদে বসবাসকারী বণিকেরা বানিজ্যের প্রয়োজনে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে যাতায়াত করতেন। বাংলা ও বিহারের সমৃদ্ধির অন্যতম কারণ ছিল এই বাণিজ্য।

" We posses an early record of about 5th Century A.D. engraved on a stone in Malaya Peninsula which contains a prayer for the sucessful voyage of Mahanavik (Great Captain) Budha Gupta, an inhabitant of Raktamrittika. It shows that men belonged to this locality near Murshidabad city, were great sailors in the early centuries of the Christian era and made voyages across the Bay of Bengal to South-East Asia."

লর্ড ক্লাইভের হাতে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পর মুর্শিদাবাদের পতন শুরু হয়। সিরাজের পর যে সকল নবাব এসেছিলেন তাঁরা শক্তিহীন ও কর্তৃত্বহীন নামমাত্র নবাব ছিলেন। আজ জেলার মধ্যে শ্মশানভূমির মত শ্রীহীন অবস্থায় পরিত্যক্ত একদা রাজধানী শহর মুর্শিদাবাদ কিন্তু একসময় এর জাঁকজমক ও জৌলুষ ছিল চোখ ধাঁধানো । ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ এর সৌন্দর্য ও জাঁকজমক অবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে যা বলেছেন তা জহরলাল নেহেরু তাঁর 'Discovery of India' গ্রন্থে তা তুলে ধরেছেন।" Clive describes Murshidabad in Bengal in 1757, the very year of Plassey, as a city as extensive populous and rich as the city of London, with this difference

that there are individuals, in first possessing infinitely greater property than the last."

এই ভাবে লক্ষণসেনের পরাজয়ের ঘটনার পর থেকে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে একের পর এক অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ ঘটেছিল ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে।

"In or about 1202 AD Lakshman Sen was surprised and ran over to Nadiya (Navadvipa) by Baktiyar Khalji's son Mohammad Khalji, who laid the foundation of a more or less independent administration in the central Bengal. From this time onwords to the time of battle of Plassey the history of Murshidabad is replete with many incidents and anecdotes more specially during the 17th and 18th centuries that intervened between end of Sena rule in Bengal and establishment of the Makhsudabad or Makhsusabad during the time of Akbar."

D.K. Chakravorty,
Superintendent of Archaeology
West Bengal

বঙ্গদেশে জৈন সংস্কৃতির পরম্পরা ও বিবর্তন:

মুর্শিদাবাদের পশ্চিমাংশ যা রাঢ়দেশের অর্ন্তভুক্ত, ওখানে ভগবান মহাবীর বিচরণ করতেন। ওখানকার ভগ্নাবশেষ আজও এই সাক্ষ্য দেয় যে ওখানকার ক্ষেত্র জৈনধর্ম ও সংস্কৃতির এক প্রমুখ কেন্দ্র ছিল।

" Tradition ascribes that the last of the Jain Tirthankaras Lord Mahavira visited some parts of the country of Radha and it may not be improbable that western portion of the present district of Murshidabad as falling within the ancient division of Radha was also sanctified by the visit of the propagator of Jainism".

এই ভাবে জৈনধর্ম বাংলায় অতি প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত ছিল। সপ্তম শতাব্দীর পর এর প্রভাব কমজোর হতে থাকে। শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের উত্থানের ফলে হাজার হাজার জৈন ধর্মাবলম্বীরা পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অবশিষ্টাংশ যাঁরা ওখানে ছিলেন তাঁদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য কঠিন সংঘর্ষপূর্ণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ইতিহাসের তথ্যাদি এই বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণ দেয় যে এই স্থান থেকে বৌদ্ধধর্ম সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু জৈনধর্ম কোন না কোন ভাবে ওখানে এখনও টিকে রয়েছে, কারণ এর প্রভাব সমাজ-জীবনের অত্যন্ত গভীরে ছিল, যার প্রতিচ্ছবি আজও সরাক জাতির মধ্যে আমরা দেখতে পাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পশ্চিম-উত্তর ভারত থেকে বংলায় জৈনদের পুনরাগমন হয়েছিল, এবং ঐ সময় থেকে জৈনরা বাহির থেকে এলেও মুর্শিদাবাদকে তাঁরা আপন নিবাসস্থল হিসেবে গড়ে তোলেন। সেখানে কাশিমবাজার, জিয়াগঞ্জ, আজিমগঞ্জ, লালাগোলা, বেলডাঙ্গা, ধুলিয়ান, ঔরঙ্গাবাদ আদি স্থানে জৈনরা বসতি স্থাপন করে এবং বিভিন্ন ব্যবসা বানিজ্যের সঙ্গে বাণিজ্যও ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত হয়। এই স্থানগুলির মধ্যে আজিমগঞ্জ এবং জিয়াগঞ্জের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে,কারণ জৈনসমাজ এই জায়গাকে প্রধান কেন্দ্র করে জৈন সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে পুন:প্রতিষ্ঠার ব্রত গ্রহণ করেছিল। এই স্থানকে কেন্দ্র করে অনেক মন্দিরের নির্মাণও ঘটেছে। এই সকল মন্দিরে জৈন তীর্থঙ্করদের অনেক প্রাচীন মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে এবং পুনরায় এই সকল স্থান জৈনদের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান হিসেবে গড়ে উঠেছে।

আজিমগঞ্জের জৈনপরম্পরা:

কান্দী রাজপরিবারের প্রাচীন দস্তাবেজ থেকে জানা যায় যে আজীমগঞ্জের প্রাচীন নাম ছিল ‘ডিহি জিনেশ্বর’। পরবর্তীকালে মুসলিম রাজত্বে ঔরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমুস্সানের নাম থেকে আজিমগঞ্জ নাম।

“In ancient times when the Palas ruled over Bengal, these places were known to be the habitat of Digambar Jains and Jaina Temples were found all over the Rarh area. In the old record of Kandi Raj Family, it was found that Dihi Jaineswar near Dihi Kiritkona was famous for its Jaina temple, where an image of Lord Parshanath, made of emereld was worshipped. This Jaineswar temple was famous in the 12th and 13th centuries and in all probability Dihi Jaineswar had its name altered to Azimganj during the Muslim Period,”

-Kamal Bandopadhyay

পাঁচথুপীর বরাহ কোনা দেউল:

রাজা লক্ষণসেনের রাজত্বকালের ষষ্ঠ বর্ষে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে শক্তিপুরে একটি দানপত্র থেকে মুর্শিদাবাদ বিষয়ে আমরা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাই, যা থেকে জানা যায় পাঁচথূপীর নিকট কান্দী মহকুমায় এক প্রাচীন জনবসতীপূর্ণ ক্ষেত্র আছে, যা 'বরাহ দেউল' নামে পরিচিত। একথা সবার জানা বরাহদের বিচরণের ক্ষেত্র নীচু এবং আবর্জনাপূর্ণ এলাকা, যাকে শুকরের আস্তানা বলা হয়ে থাকে,যেখানে শহরের নোংরা জলও জমে থাকে। কিন্তু এই জায়গা, যা আজও বরানগর নামে পরিচিত, এটি উঁচু জায়গায় অবস্থিত। অতএব এই স্থান বরাহ বা শুকরদের বিচরণের ক্ষেত্র হিসেবে প্রসিদ্ধ হতে পারে না। পরন্তু এটি বরাহদেও বরাহেশ্বর ত্রয়োদশ তীর্থঙ্কর বিমলনাথের চৈত্যের অবস্থিতির ইঙ্গিত দেয়। 'বরাহ' উনার পরিচিতি জ্ঞাপক চিহ্ন বা লাঞ্ছন। যেমন 'সিংহ' দেখলে মহাবীর স্বামীর কথা স্মরণে আসে, এই প্রকার 'বরাহ' দেখলে বা শুনলে স্বামী বিমলনাথের কথা স্মরণে আসে। কালক্রমে বরাহকোণা কিরীকোনায় পরিবর্তিত হয়, যা পরে কিরীট কোনা নামে পরিচিতি লাভ করে। সাগরদিঘি থেকে কান্দী পর্যন্ত বিস্তৃত ক্ষেত্রের মধ্যে অনেক মন্দির ছিল, যেখানে বিমলনাথ স্বামীর প্রসিদ্ধ চৈত্যের জন্য ঐ ক্ষেত্র বরাহকোনা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। আর্কেওলজিকেল সার্ভের সুপারিনটেনডেন্ট ডি.কে. চক্রবর্ত্তীর বক্তব্যও আমার এই বক্তব্যকে পুষ্ট করে।

"The Saktipur Grant Issued in the 6th regnal year of Lakshman a Sena recording some grant of land and describing the patakas in which those were situated is perhaps the last record recovered from Murshidabad district before the coming of the muslims where from we get some geographical information of Murshidabad during the latter part of the 12th century A.D. Thus the pataka Varahakona mentioned in this inscription may be identified with Barkona, 'a well known ancient locality close to Panchthupi in the Kandi sub-Division."

জৈনতীর্থ আজিমগঞ্জ:

মুর্শিদাবাদে জৈনদের পুনরাগমনের অন্যতম কারণ ছিল মুর্শিদাবাদের বাণিজ্যিক পরিবেশ ও সমৃদ্ধি। মুর্শিদকুলী খাঁর ঢাকা থেকে এখানে রাজধানী স্থাপন করার অন্যতম কারণ ছিল এখানকার সমৃদ্ধি ও বাণিজ্যের বিস্তারের জন্য উপযুক্ত যোগাযোগের সুবিধা। বিদেশী আক্রমণকারীরাও সেখানে বসতি স্থাপনা করেছিল, যেখানে সম্পন্ন বণিক সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল।

অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন ঔরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম-উস-শানের নাম অনুসারে ডিহি জিনেশ্বরের নাম পরিবর্তিত হয়ে আজিমগঞ্জ হয়েছে। প্রাচীনকালে এই জায়গা তীর্থস্থান হওয়ার কারণে এবং পুনরায় ওখানে মন্দিরাদি স্থাপনার কারণে অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজস্থান থেকে এখানে এসে বসবাসকারী জৈনদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে, যাঁরা এখানে অনেক নতুন ভব্য মন্দির নির্মাণ করেন।

" Murshidabad is a famous place of pilgrimage for devout Jains, and every year hundreds of Jains from Rajasthan, Gujrat and other states of India visit Azimganj and Jiaganj as also the famous old temples of the Seths at Mahimapur. These temples are well-known to the Jain community, and some of them had very ancient images of Jain Tirthankars.

Azimganj is the home of the Jains, whose ancestors emigrated to this suburb of the old capital of Bengal in the 18th century,"

-Jain Temples of Murshidabad

মুর্শিদাবাদে জৈনদের পুনরাগমন:

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজস্থান থেকে মুর্শিদাবাদ এসে বসবাসকারী জৈনদের বিষয়ে জৈনসমাজের একজন প্রসিদ্ধ বিদ্বান ব্যক্তিত্ব শ্রী মহেন্দ্র সিংঘীজী উল্লেখ করেছেন, " ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম শেঠ মাণিকচন্দ্র মুর্শিদাবাদ আগমন করেন এবং সেখানে মহিমাপুরে বসবাস শুরু করেন। ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে বাবু গোপাকান্ত নৌখলা আজিমগঞ্জ আগমন করে বসবাস শুরু করেন । ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বীরদাসজী দূগড় জিয়াগঞ্জে আগমন করে বসবাস শুরু করেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে বাবু রতনচন্দজী, মহাসিংহজী এবং আসকরনজী কোঠারী ভ্রাতৃত্রয় আজিমগঞ্জে আগমন ও বসবাস করতে থাকেন। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বাবু খড়গসিংহজী নাহার আজিমগঞ্জ এসে বসবাস আরম্ভ করেন। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ বাবু হরজীমলজী দুধোড়িয়া নিজের দুজন পুত্র সোওয়াইসিংহজী এবং মৌজীরামজী কে সঙ্গে নিয়ে আজিমগঞ্জে আগমন করেন এবং বসবাস শুরু করেন। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে বাবু সোয়াইসিংহজী সিংঘী নিজের দুইপুত্র রায়সিংহজী (হরিসিংহজী) এবং হিম্মৎসিংহজী কে সঙ্গে নিয়ে আজীমগঞ্জে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন।

এই সব তথ্যাদি ব্যতিরেক অষ্টাদশ শতাব্দীতে কতপরিবার কবে কোথায় আগমন করে বসতিস্থাপন করেছিল, আজ তার ক্রমবদ্ধ বিবরণ উপলব্ধ নয়, তবে মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ, আজিমগঞ্জ ও এর আশেপাশে হাজারের বেশী সংখ্যায় স্বধর্মীয় পরিবার ধীরে ধীরে এসে ক্রমশ: বসতি স্থাপন করে থাকবে। এইভাবে এখানে এসেছেন **বৈদ, বোথরা, ভূরা, ভঁসালী, বচ্ছাওয়াৎ,ছাজেড়, চৌরাড়িয়া, ছগলানী, মোহনোত, দাগা, লোঢা, নাহটা, নরবত, পটাওরী, গোলেছা, বাপনা, বুচ্চা, ঘোষাল, রেখাবত, সুরানা, সাহেলা, সিপানী, সেঠিয়া, শ্রীমল,** ইত্যাদিরা। ব্যবসায়-বানিজ্যের তথা অর্থনীতি বিষয়ে বিশেষ দক্ষতার কারণ উত্তরোত্তর এঁদের উন্নতি হতে থাকে এবং এই বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এঁরা মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

বাংলায় জৈনসমাজ এবং জৈন গৌরবের ক্ষেত্রে মুর্শিদাবাদের এইসকল **জগৎ শেঠ, নৌলখা, দুগড়, কোঠারী, নাহার, দুধোড়িয়া** এবং **সিংঘী** পরিবারের বংশধরদের প্রশংসনীয় কার্যকলাপ এবং অনেক গৌরবময় ইতিহাস এবং পরম্পরা রয়েছে যা কখনও ভুলে যাওয়া যায় না। মুর্শিদাবাদের এই জৈন পরিবারগুলি

এসে মুঘল শাসনকালে সমস্ত পূর্বভারত এবং বলা যেতে পারে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন, যা ইংরেজ শাসন কালেও অব্যাহত ছিল। এই ব্যবসায়ী পরিবারগুলি বাণিজ্যে ও ব্যবসায় উন্নতি করতে করতে নিজেদের জমিদারি পত্তন করেছিলেন, এবং ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাও গড়ে তোলেন। তাঁদের অতুলিত বৈভব সৎ ও ধর্মীয় কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। সমস্ত দেশে জৈন তীর্থগুলির সংস্কার, রক্ষণ, নির্মাণ, পুনরুদ্ধার আদি বিবিধ কার্যে এঁদের অবদান। এছাড়াও স্বধর্মীদের উন্নয়ন, পুর্নবাসন, স্বাগত, সৎকার আদি বিবিধ কার্যে ঐ বৈভবের ব্যবহার হত, যা আজও অনুকরণীয়।

এই জৈন পরিবারগুলি যে কেবল জিয়াগঞ্জ-অজিমগঞ্জে মন্দিরাদি নির্মাণ করেছিলেন, তা, নয়, এমন কি অন্যান্য নগরীগুলিতে, প্রাচীন তীর্থস্থানগুলিতেও যেমন, গোয়ালপাড়া, তেজপুর, জঙ্গীপুর, নলহাটী, কুচবিহার, প্রতাপগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, দিনাজপুর, ভাগলপুর, লক্ষীসরাই, গিরিডি বরাকর, সম্মেত শিখর, লচ্ছওয়াড়, কাঁকদী রাজগৃহ, পাবাপুরী, গুণা, চম্পাপুরী, বারাণসী, বটেশ্বর,নওরাহী, আবু, পালীতানা, তলাজা, গিরনার, বোম্বাই তথা কিশনগড় প্রভৃতি জায়গায় মন্দির এবং ধর্মশালা নির্মাণ করেছিলেন। এমনকি জৈন ধর্মের অপ্রকাশিত আগমগ্রন্থগুলির অনুবাদও প্রকাশ করা হয়েছিল। এছাড়া আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়েছিল, কবিসম্রাট রীবন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন, বোলপুরে একটি জৈন বিদ্যাপীঠেরও স্থাপনা হয়েছিল। এই জৈন বিদ্যাপীঠের জৈনধর্মের সুপ্রসিদ্ধ বিদ্বান তথা পুরাতত্ত্ববিদ শ্রী জিন বিজয়জী আচার্য হিসেবে কাজ করেছেন। এই বিদ্যাপীঠে জৈন আগম গ্রন্থ, জৈন প্রকরণ গ্রন্থ ঐতিহাসিক সংশোধন পর্হাৎ, স্থাপত্য বিজ্ঞান, ভাষা বিজ্ঞান, জৈন কথা সাহিত্য, দেশী ভাষাসাহিত্য, লিপি বিজ্ঞান, ধর্ম বিজ্ঞান, প্রকীর্ণ জৈন বাঙ্ময়, ইত্যাদি জৈন সংস্কৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ রয়েছে এমন সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল ।এই বিদ্যাপীঠের আচার্য শ্রী জিনবিজয়ী জীর তত্ত্বাবধানে ভারতীয় বিদ্যাভবন, বোম্বাই দ্বারা সিংঘী জৈন সিরিজের অর্ন্তগত ৫২ টি পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে, যা জৈন সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ। মুর্শিদাবাদের রেললাইনের প্রথম প্রস্তাবক এবং সহযোগী অধিকর্তা ছিলেন শ্রী দূগড় পরিবারের লোক । এই রেল আজিমগঞ্জ এবং বীরভূম জেলার নলহাটী সংযুক্ত করেছে।

এইসকল ধার্মিক কার্যকলাপ ছাড়াও সময় সময় এই পরিবারের অনেক মহীয়সী মহিলা সমাজ কল্যাণের জন্য বিভিন্ন স্থানে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, পুস্তকালয়, হাসপাতাল, প্রভৃতি নির্মাণেও মুক্ত হস্তে দান প্রদান করে আপন

উদারতা প্রদর্শন করেছেন। সামাজিক এবং সরকারী উদ্যোগেও তাঁদের উল্লেখযোগ্য অবদান স্মরণীয়। আকাল, দুর্ভিক্ষ কিংবা বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় আপন জমিদারির প্রাপ্য কর মুকুব করে মাসের পর মাস বিনামূল্যে খাদ্যদ্রব্য বিতরণও করেছেন। এই সব সেবাকার্যের কারণে তাঁদেরও ইংরাজ সরকারের তরফে সম্মানিত করতে হয়েছে । বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষে কোন একটি বিশেষ জায়গা অবশিষ্ট নেই যেখানে একই অঞ্চলে এত অধিক সংখ্যক রায়বাহাদুর খেতাব গ্রহীতা বসবাস করতেন, সেই স্থান হল জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ। এছাড়াও রাজা এবং 'কেশর-ই-হিন্দ' সম্মান ও এই অঞ্চলের ব্যক্তিরা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মুঘল শাসনকালে এবং এর পর ইংরেজ সরকারের আমলে এই প্রান্তের গৈলড়া পরিবারের শ্রীমন্তদের শেঠ, জগৎশেঠ এবং মহারাজা উপাধি প্রাপ্তি ঘটেছিল।

জগৎশেঠ :

শেঠ	মানিকচাঁদ	গৈলড়া	বাদশাহ ফারুখশিয়র	সন্ ১৭০৫
জগৎশেঠ	ফতহচাঁদ	গৈলড়া	বাদশাহ মুহম্মদশাহ	সন্ ১৭২৩
জগৎশেঠ	মহতাবচাঁদ	গৈলড়া	বাদশাহ আহমদ শাহ	সন্ ১৭৫৬
জগৎশেঠ	খুশলচাঁদ	গৈলড়া	বাদশাহ মুহম্মদশাহ	সন্ ১৭৬২
জগৎশেঠ	হরখচাঁদ	গৈলড়া	ইংরাজ সরকার	সন্ ১৭৮২
জগৎশেঠ	ইন্দ্রচাঁদ	গৈলড়া	ইংরাজ সরকার	সন্ ১৮১৫
জগৎশেঠ	গোবিন্দচাঁদ	গৈলড়া	ইংরাজ সরকার	সন্ ১৮২২

রায়বাহাদুর:

ধনপৎসিংহজী দূগড়	ইংরাজসরকার	সন্ ১৮৬৫
লক্ষ্মীপৎ সিংহজী দূগড়	ঐ	সন্ ১৮৬৭
সিতাবচন্দ্রজী নাহর	ঐ	সন্ ১৮৭৫
বুধসিংহজী নাহর	ঐ	সন্ ১৮৮৮
বিশনচন্দ্রজী দুধোড়িয়া	ঐ	সন্ ১৮৮৮
গণপত সিংহজী দূগড	ঐ	সন্ ১৮৯৮
মণিলালজী নাহর	ঐ	সন্ ১৮৯৪
ধনপৎসিংহজী নৌলখা	ঐ	সন্ ১৯১০

রায়সাহেব:

মেঘরাজজী কোঠারী	ঐ	সন্ ১৯২৪

রাজা:

বিজয়সিংহজী দুধোড়িয়া	ঐ	সন্ ১৯০৮

সী.আই.এ.কে শর-ই-হিন্দ :

নরপতসিংহজী দূগড়	ঐ	সন্ ১৮৯৮

এই সকল পরিবারের কোন কোন সম্মানিত ব্যক্তি অখিল ভারতবর্ষীয় জৈন শ্বেতাম্বর কনফারেন্সের অধিবেশনে সভাপতির পদ অলংকৃত করে জৈন সমাজের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। কোন কোন মহানুভব ব্যক্তি বাংলার বিধান-পরিষদে সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, এমন কি কোন কোন সদস্য মন্ত্রীপদেও আসীন হয়েছিলেন । এই সকল ব্যক্তি দেশসেবা থেকে দূরে থাকেন নি। আজাদহিন্দ ফৌজের প্রতিষ্ঠাতা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু মুর্শিদাবাদ আসার পর তাঁকেও দেশ স্বাধীন করার লক্ষ্যে অনেক অর্থ-সাহায্য তহবিলে দান করা হয়েছিল। জয়পুরের মহারাজা সোওয়াই রামসিংহজীও কলিকাতা ভ্রমণে এসে আজিমগঞ্জের আতিথ্য স্বীকার করেছিলেন। এছাড়াও প্রায়ই এখানে যাওয়া আসা ইংরাজ সরকারের উচ্চ পদাধিকারীদের নিত্যকারের ব্যাপার ছিল।

এই সকল জৈন পরিবারের সৌজন্যে আজিমগঞ্জ ও জিয়াগঞ্জ শহরে অনেক মন্দিরাদির নির্মাণ হয়েছিল। ফলে, প্রত্যেক বছর রাজস্থান, গুজরাট এবং ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে হাজার হাজার তীর্থযাত্রী পূর্ব ভারতে অবস্থিত জৈন পঞ্চতীর্থ যাত্রা উপলক্ষ্যে জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জের মন্দিরাদি দর্শনের জন্য পরিভ্রমণ করতেন। জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে এই মন্দিরাদির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল, কারণ এই সকল মন্দিরে অনেক প্রাচীনকালের দর্শনীয় জৈন তীর্থঙ্করদের প্রাচীন মূর্তি স্থাপিত হয়েছিল।

—শ্রী মহেন্দ্র সিংঘী, মুর্শিদাবাদের জৈন সমাজের গৌরব গাথা।

কাসিমবাজারের প্রাচীন নেমিনাথ মন্দির নষ্ট হয়ে গেলে এখানকার মূর্তিগুলি আজিমগঞ্জ, লালগোলা এবং রাজশাহীর মন্দিরে পুন:প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। আজিমগঞ্জের প্রধান মন্দির ২২ তম তীর্থঙ্কর নেমিনাথজীর। সম্ভবনাথজীর মন্দিরে তৃতীয় তীর্থঙ্কর সম্ভবনাথের ৮ ফুট উঁচু পাষাণ নির্মিত মূর্তি অত্যন্ত দর্শনীয়। পার্শ্বনাথজীর মন্দিরের প্রাচীন পাষাণ-মূর্তি কাসিমবাজারের মন্দির থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল। শান্তিনাথ মন্দিরে ধাতু নির্মিত প্রাচীন মূর্তি বিরাজমান। এই মূর্তির বিষয়ে " Jain Temple of Murshidabad" গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে:

মুর্শিদাবাদে জৈনদের পুনরাগমন:

" Some of the metal images in the Jaina temple of Azimganj bear inscription on their backsides . Deciphering of these inscriptions is not easy. But some images made of eight metals, show very ancient dates. One image in Chintamaniji temple bears a date of 1019 Samvat, and some other bear the dates showing the craftsmanship of two to three centuries old. In Shantinath temple, an idol bears a date of 1553 Samvat and the old image of Neminath has the year 1507 Samvat inscribed on the back. But the old stone image of Sambhabnath near Baranagar is more than five feet in height and is perhaps the largest Jains image in any temple of the three eastern states of India. The Jaina temples of Murshidabad are still attractive to all sections of people."

-'Jaina Temples of Murshidabad.'

মুর্শিদাবাদের জৈনমন্দির:

বর্তমান আজীমগঞ্জে সাতটি জৈনমন্দির রয়েছে, এগুলি হ'ল-

(১) শ্রী নেমীনাথজীর মন্দির
(২) শ্রী শান্তিনাথজীর মন্দির
(৩) শ্রী চিন্তামনি পার্শ্বনাথজীর মন্দির
(৪) শ্রী সুমতিনাথজীর মন্দির
(৫) শ্রী পদ্মপ্রভূজীর মন্দির
(৬) শ্রী সম্ভবনাথজীর মন্দির
(৭) শ্রী রামবাগ সাবলিয়াজীর মন্দির-দাদাবাড়ী।

জিয়াগঞ্জে (১) শ্রী আদিনাথজীর মন্দির (২) শ্রী বিমলনাথজীর মন্দির (৩) শ্রী সম্ভবনাথজীর মন্দির (৪) শ্রী সাঁওলিয়াজির মন্দির (৫) কিরাতবাগস্থিত শ্রী পার্শ্বনাথজীর মন্দির ও দাদাবাড়ী। এছাড়াও কাঠগোলায় ছত্রবাগ তথা শ্রী আদিনাথজীর মন্দির এবং মহিমাপুরে জগৎ শেঠের প্রসিদ্ধ কসৌটী মন্দির ছিল যা বর্তমানে 'বিশ্বমৈত্রীধাম' গান্ধিনগরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

শ্রীনেমিনাথজীর মন্দির:-

আজিমগঞ্জে স্থিত নেমিনাথজীর মন্দির ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীসংঘ দ্বারা নির্মিত হয়েছে। এই মন্দিরের প্রধান আরাধ্য তীর্থঙ্কর হলেন ২২ তম তীর্থঙ্কর শ্রীনেমিনাথজী। এই মন্দির ২,৯৩৩.২৬১৩ ব: মি. পরিমাণ ভূমিতে নির্মিত হয়েছে। এই মন্দিরে ২৮ টি পাষাণ নির্মিত মূর্তি "১৯ টি অষ্টধাতু নির্মিত মূর্তি" এবং দুটি নীলা এবং একটি স্ফটিক নির্মিত মূর্তি আছে। মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 'শ্রী শ্রী নেমিনাথজী মহারাজের ভাণ্ডার নামক একটি অছি (Trust) গঠিত হয়েছে। এই মন্দির একটি প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডারের মূর্ত্তপ্রতীক। বর্তমান এই মন্দিরের প্রধান অছি (Trustee) শ্রী সুনীলকুমার চৌরাড়িয়া। এই মন্দিরের মূর্তিগুলিতে নিম্নে বর্ণিত শিলালেখ রয়েছে।

পঞ্চতীর্থ:-

সম্বৎ ১৫১৭ বর্ষে শুক্লা পঞ্চমীর দিন সোমবারে উকেশ বংশে লোঢা গোত্রে সা০ বীশল ভার্যা ভাবলদে তৎপুত্র সা০ কর্ম্মা তদ্‌ভার্যা কন্যতিগতে তৎপুত্র সা০ সহসমল্ল শ্রাবকেণ সপরিবারেণ আত্মশ্রেয়োর্থ শ্রী চন্দ্রপ্রভ বিম্বং কারিতং প্রতিষ্ঠিতং শ্রীখরতর গচ্ছে শ্রী জিন রাজসূরি পট্টে শ্রীজিনভদ্রসুরিভি:।।

সম্বত্ ১৫১৮ বর্ষে মাঘ সুদি ৪ (চার) সোমে শ্রী ব্রহ্মানগগোত্রে শ্রী শ্রীমালজ্ঞাতীয় শ্রেষ্ঠী বিরুআভার্যা মুক্তি সুত হীরা ভার্যা হীরাদে সুত ভাবড় কমু আভ্যাং স্বপিত্রো: শ্রেয়োর্থ শ্রী ধর্মনাথ বিম্বং পঞ্চতীর্থীং কারাপিত: প্রতিষ্ঠিতং শ্রী বুদ্ধিসাগরসূরি পট্টে শ্রী বিমল সূরিভি:।। ।। সীতাপুর বাস্তব্য:।।

সম্বত্ ১৫১৯ বর্ষে বৈশাখ বদি ১১ শুক্রে উ:জ্ঞাতীয় বিদ্যাধর গোত্রে। সা০ সূমণ। ভা ০ সূমলদে। পু০ বেলা ভা০ বগুনাম্মা পু০ সোমা যুতয়াং স্বভ্রাতৃ পুণ্যার্থ শ্রী আদিনাথ বিম্বং কা০ প্র০ বৃহগচ্ছে ধোকমীয়াবন্টকে (?) শ্রী ধর্মচন্দ্রসূরি পট্টে শ্রীমলয়চন্দ্র সুরিভি:।।

।। এ ০।। সম্বত্ ১৫২২ বর্ষে আষাড় সুদি ৮ উকেশি-
জ্ঞাতীয় মবেয়তা গোত্রে।। সা ০ কেশরাজ ভার্যা.....
রতনাকেন শ্রেয়সে শ্রীসুমতি বিম্বং প্রতিষ্ঠিতং
ধর্মঘোষগচ্ছে শ্রীসাধু...।।

সম্বত্ ১৭০৬ ব । জ্যে । গু ০ শ্রী রাজনগর বাস্তব্য।
প্রাগ্বাটজ্ঞাতীয় বৃহদ্‌শাযায়াং সা০ ঋষভদাস ভা০
উক্ষু নাম্ন্যা শ্রী পার্শ্বনাথ বিম্বং কারিতং প্রতিষ্ঠিতং চ
তপাগচ্ছে । ভ০। শ্রী ৫ শ্রী বিজয়য়ানন্দ সূরিভিঃ।।
আচার্য শ্রী ৫ শ্রী বিজয়রাজসূরি পরিকরিতৈ ঃ।।
— শ্রীরস্তু । ভ।। ১ ।।

পাষাণ মূর্তির উপর খোদিত লিপি:

সম্বত্ ১৫৪৯ বর্ষে বৈশাখ সুদি ৩ শ্রীমূলসংঘে ভট্টারক শ্রী জিনচন্দ্রদেবা সা ০...রাজপাপড়ীবাল সপ্রণমতি কা ০ শ্রী ভীমসিংঘ রাবল। সহর মত্রঝসা।

।। শ্রী নেমিনাথজীর পঞ্চায়তি মন্দির।।

লেখ:-সম্বত্ ১৫১১ ব০ মাঘ সু০৫ সোমে ওসোয়াল জ্ঞাতী লিগা গোত্রে সমদডীয়া উডকেণ ০ সুহডা ভা ০ সুহাগদে পু ০ কম্মাকেন ভা ০ কস্মীরদে পু ০ হেমা সংসারচন্দ দেবরাজ যুতেন স্বশ্রেয়সে শ্রী নেমিনাথ বিম্বং কারিতং শ্রী উপকেশ গচ্ছে শ্রী কুকুদাচার্য সন্তানে প্র০ শ্রী কক্ক সূরিভিঃ।

সম্বত্ ১৫২৩ বর্ষে বৈশাখ বদি ৪ (চার) গুরৌ ওসোয়াল জ্ঞাতৌ কটারীয়া গোত্রে সা০ সরবণ-ভা০ রাণী সুত সা০ সিংঘা ভা০ সোমসিরি সু০ সা০ আদুনাম্না ভার্যা বিরণি সুত সা০ পুনপাল সা০ সোনপাল সুরপতি প্রমুখ কুটুম্ব যুতেন স্বশ্রেয়সে শ্রী পার্শ্বনাথ বিম্বং কারিতং প্রতিষ্ঠিতং চ। শ্রী লক্ষ্মী সাগর সুরিভিঃ ।। শ্রী ।।

সম্বত্, ১৫৫৩ বর্ষে বৈশাখ সুদি প্রাগ্বাট জ্ঞা০ ব্যব০ ষেতা ভার্যা মদীসুত ব্য০ ভোজাকেন ভা০ রাজু ভ্রাতৃ রাজা রত্না দেবা সহিতেন স্বপুর্বিজ শ্রেয়োর্থ শ্রী শান্তিনাথ বিম্বং কা০ প্র০ তপাগচ্ছে শ্রী হেমবিমল সূরি শ্রী কমল কলস সুরিভিঃ সিরুয়া বাস্তব্য।

সম্বত্ ১৬১৫ বর্ষে বৈশাখ বদি ১০ ভৌমে জবাঠ বাস্তব্য হুবডজ্ঞাতীয় মন্ত্রীশ্বর গোত্রে দো০ স০ ক্ষেমাকেন ভা০ রাণী স০ শ্রী পার্শ্বনাথ বিম্বং কা০ প্র০ শ্রী তেজরত্ন সূরিভিঃ।।

।। শ্রী চিন্তামণি পার্শ্বনাথজীর মন্দির।।

যদিও এই মন্দিরের নির্মাণ ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিল কিন্তু এর মূর্তি ৪০০ থেকে ৫০০ বছরের পুরানো। মনহোত পরিবার এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। এই মন্দির ১৯২৯-১০২৫ বর্গমিটার ভূমির জমির উপর নির্মিত এবং এই মন্দিরের মূল নায়ক ২৩ তম তীর্থঙ্কর ভগবান শ্রীপার্শ্বনাথজী। এই মন্দিরে ২৪ টি পাষাণ মূর্তি এবং ৪২ টি অষ্টধাতুর মূর্তি আছে। এই মন্দিরের দেখভালের দায়িত্ব "সিংঘী জৈন রিলিজিয়াস ট্রাষ্ট," আজিমগঞ্জ এর উপর ন্যস্ত।

লেখ:-সম্বত্ ১৫০৫ বর্ষ মাঘ বদি ২ রবৌ ওসোয়াল জ্ঞাতীয় ভণকারী গোত্রে সা০ গৈল্হা পু০ সৌ পী ভা০ পোলশ্রী পু০ হরাকেন আত্ম পুণ্যার্থ শ্রী অভিনন্দন বিম্বং কারাপিতং প্রতিষ্ঠিতং শ্রী ধর্মঘোষ গচ্ছে ভ০ শ্রী বিজয়চন্দ্রসূরি পট্টে শ্রী সাধুরত্ন সুরিভিঃ।

সম্বত্ ১৫২৭ বর্ষে বৈ০ ব০১১ বুধে লাম্বড়ীবাস্তব্য উকেশ জ্ঞতীয় ব্য০

ষীমসী ভাং বানুপুত্র ব্যo গণমা ভাo বাবু ব্যo কৈল্হাকেন ভাo মানূ বৃদ্ধ ভাo ঘুঘাপুত্র মেঘাদি কুটুম্ব যুতেন শ্রী মুনিসুব্রত স্বামী চতুবিংশতি ষট্ট কারিত: প্রতিষ্ঠিত :।। বস্ত্রগত চাঁই সগীয়া শ্রী মর্তসূরি শ্রী উকেশ বিম্বদনীক গচ্ছে প্রতিষ্ঠা কারিতা।। (অক্ষর অস্পষ্ট)

সম্বত্ ১৫২৭ বর্ষে মাঘ বদি ৫ শুক্রে মত্রিদলীo বংশ দুল্লহ গোত্রে সাo গৈলহ পুo সৌ পী ভাo উভয়চন্দ উo হেমা পুত্রী অজাইব সহিতেন পরিবার যুতেন শ্রী শীতলনাথ বিম্বং কারিতং শ্রী খরতরগচ্ছে শ্রী জিনসাগরসূরি পট্টে জিনসুন্দর সুরয়স্তত্তপট্টে শ্রী জিনহর্ষ সুরিভি: প্রতিষ্ঠিতং।

সম্বত্ ১৫৬৩ বর্ষে মাহসুদি ৫ গুরৌ শ্রেষ্ঠি গোত্রে সাo ববা ভাo বালহদে সুo শদা ভাo পলহ সুo বিরা ঠিরা আম্বা সহ লষা যুতেন শ্রী পদ্মপ্রভুবিম্বং কারিতং উপকেশ গচ্ছে ককুদাচার্য সন্তানে ভo শ্রী দেবগুপ্ত সুরিভি: প্রতিষ্ঠিতং।।

সম্বত্ ১৬৩০ বর্ষে মাঘ সুদি ১৩ দিনে পত্তন বাস্তব্য সাo সান্ডা ভার্যা লষমাই সুo বীরপালেন ভার্যা রংগাই প্রমুখ কুটুম্ব যুতেন শ্রী সম্ভবনাথ বিম্বং কারিতং প্রতিষ্ঠিতং তপা গচ্ছাধিরাজ শ্রী হীরবিজয় সুরিভিশ্বিরং নন্দতাত্।

<u>**রৌপ্য মূতির উপর লেখ:**</u>

সম্বত্:১৯৩৩ কা জ্যৈষ্ঠ শুক্লে ১৩ শনিবাসরে শ্রীশান্তি জিন পঞ্চতির্থীকা উস বংশে দুধোড়িয়া গোত্রে বাবু হর্ষচন্দ তৎপুত্র বাবু বিসনচন্দ্রেন কারিতং পুনমিয়া বিজয় গচ্ছে শ্রী শান্তি সাগর সুরিভি: প্রতিষ্ঠিতং।

।। শ্রী সুমতিনাথজীর মন্দির।।

ধাতুনির্মিত মূর্তির পর লেখ:

ওঁ।। শ্রী সরবাল গচ্ছে অসামূকেন কারিত ।। সন্ত ১১১০

নাহারদের পুর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত জৈনমন্দিরগুলি এক মন্দিরময় গ্রামের মধ্যস্থলে বিদ্যমান ছিল। স্বর্গীয়া শ্রীমতী ময়াকুমারের পুত্র স্বর্গীয় বাবু গুলালচন্দজী, তাঁরপুত্র সংগ্রহকর্তার পরম পূজ্য পিতা রায় সিতাবচন্দ নাহার বাহাদুর। পূর্বের মন্দির গঙ্গার স্রোতপ্রবাহে বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার পর এখানে নতুন চৈত্য সম্বৎ ১৯৫৪ (১৮৯৭) পুনর্নির্মাণ করিয়েছিলেন। মন্দিরের প্রধান নায়ক ভগবান শ্রী সুমতিনাথ। এখানে ৭ (সাত) টি পাষাণ নির্মিত ২৪ টি রত্ন প্রতিমা আছে।

বর্তমানে এর দেখভালের দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিকর্তা শ্রী নির্মলসিংহ নাহার।

প্রথম মন্দিরের উপর লেখ:

।। শ্রী।। সন্ ১৯১৩ মিতি বৈশাখ সুদি ৫ শুক্রবাসরে শ্রী জিন ভক্তিসূরি সাখায়াং উ০ শ্রী আনন্দ বল্লভ গণি। তৎশিষ্য পং। প্র। সদালাভ মুনি উপদেশাৎ শ্রী অজিমগঞ্জ বাস্তব্য নাহর শ্রী খড়্গসিংহজী তৎপুত্র শ্রী উত্তমচন্দজী তৎভার্যা শ্রী ময়াকুমার এষ: শ্রী সুমতি জিন প্রাসাদ কারিত: প্রতিষ্ঠাপ্য শ্রী সংঘায় সমার্প্পিতশ্র বিধিনা সত্তাং ।। জং ।। যু । প্র। শ্রী জিন সৌভাগ্য সুরিজী বিজয় রাজ্যে।। শ্রী রস্তু:।। কল্যাণমস্তু:।।

শ্রী:।। শ্রী:।। ১।।

(এই লেখটি শ্রী পার্শ্বনাথজীর মূর্তির পশ্চাতে খোদিত আকারে লেখা আছে। অক্ষরগুলি অত্যন্ত প্রাচীন। মুসলমানদের চিতোরের উপর দখল কায়েম করার পূর্বে এই মূর্তি ওখানে ছিল।)

সন্ ১৪৬৯ বর্ষে মাঘ সুদি ৬ (ছয়) রবৌ শ্রী আঁচল গচ্ছে প্রগ্বাটজ্ঞাতীয়ব্য ০ উদা ভার্যাচত্ত তৎপুত্র জোলা ভার্যা ডমণাদে তৎপুত্রেণ ব্য০ মূন্ডনেন শ্রী গচ্ছেশ শ্রী মেরুতুঙ্গ সূরিণামুপদেশেন ভ্রাতা শ্রেয়োর্থ শ্রীপার্শ্বনাথ বিম্বং কারিতং প্রতিষ্ঠিতং শ্রী সুরিভিঃ।

সম্বত্ ১৪৭৯ বর্ষে পৌষ বদি ৫ শুক্রে গ্রেহমী বাস্তব্য শ্রীমাল জ্ঞাতী শ্রী প্রতাপসিংহ ভা০ সোহগদে সুত ভূদাকেন পিতু মাতু শ্রেয়োর্থ শ্রী বাসুপূজ্য বিম্বং কারিতং পূর্ণিমা গচ্ছে প্রতিষ্ঠিতং শ্রীসূরি জিনবল্লভসূরি।

সং ১৫১০ ব০ ফা০ শু০ ১২ উকেশ বংশো জানেচা গোত্রে সা০ পদম পুত্র রাউলা সু০ সাজণ ভা০ জইসিরি পু০ যেঢা ভা০ কণসিরি সেতা ভা০ লযমসিরি পুত্র ৩ (তিন) কালু ক্ষেমধর দেবরাজ ভা০ চাণ্ড সা০ হাপাকেন ভা০ ৩(তিন) গুজরি সু০ পুংজা রাজীদি কুটুম্ব যুতেন স্বশ্রেয়সে শ্রীশ্রেয়াংস চতুর্বিংশতি পট্ট: কারিত: তপা শ্রীরত্নশেখর সূরি শ্রীউদয়নন্দিসূরিভিঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।

সং ১৫১৭ বর্ষে মাহ সু০ ৫ শুক্রে শ্রীউপকেশ জ্ঞাতী নাহর গোত্রে সা০ লেলা পু- লাঘা ভা০ সোহিগি পু০ চাঁপা সালু লাদা সহিতৈঃ পিতু শ্রেয়সে শ্রী শেয়াংসনাথ বিম্বং কা০ প্রতি০ শ্রী ধর্মঘোষ গ০ শ্রী বিজয়চন্দ্রসূরি পট্টে ভ০ শ্রী সাধুরত্নসূরিভিঃ।

সম্বত্ ১৫৩৬ বর্ষে মার্গশির সু০ ৬ শুক্রে শ্রী শ্রীমাল জ্ঞান ব্যব০ আকা ভার্যা রাতলদে সুত লাম্বাকেন ভা০ ভানু নাপা নিমি। শ্রী শান্তিনাথ বিম্বং কারা০ প্র০ পিপ্‌ফ০ শ্রী মূণি সিন্ধু সূরি পদে শ্রী অমরচন্দ্রসূরিভিঃ ।। নাপলিয়া গ্রামে।

সম্বত্ ১৬৪১ বর্ষে মাগসর মাসে। সী০ শ্রী রাজা ভা০ রজমলদে পু০ দোসা ঠাকুর ধনা হাথী লীবা হাথা ভা০ হরষমদে পু০ জীবা এতত্ স্বকুটুম্ব যুতৈঃ শ্রী পার্শ্বনাথ বিম্বং কারাপিতং শ্রী সন্ডের গচ্ছে বা০ শ্রীসহিজ সুন্দর পদে উ০ ক্ষেমাসুন্দর পট্টে উ০ শ্রীনয় সুন্দর প্রতিষ্ঠিতং।

।। শ্রী পদ্মপ্রভুজীর মন্দির।।

এই মন্দির ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছে কিন্তু এর মূর্তিগুলিও চারশত থেকে পাঁচশত বছরের পুরাতন। এই মন্দিরের নির্মাণ খরতর গচ্ছের অর্ন্তগত শ্রী বিজয়চন্দজী করিয়েছিলেন। এই মন্দির ৭৬৪.০১৭৩ বর্গ মি. জমির উপর প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরের মূল নায়ক ভগবান শ্রী পদ্মপ্রভুজী । এই মন্দিরে সাতটি পাষাণ মূর্তি তথা ১০ টি অষ্টধাতুর, দুটি নীলা এবং একটি স্ফটিকের মূর্তি রয়েছে। এর দেখভালের দায়িত্ব 'শ্রী শ্রী পদ্মপ্রভু মন্দির ট্রাষ্ট'এর উপর ন্যস্ত।

লেখ- সম্বৎ ১৪৯৭ বর্ষে মার্গশীর্ষ বদি ৩ (তিন) বুধে উকেশ বংশে লুণীয়া গোত্রে সাঃ যীমা পুত্র সাঃ সাধারণ শ্রাবকেন পুত্র সীহা সহিতেন শ্রী পার্শ্বনাথ বিম্বং কারিতং প্রতিষ্ঠিতং শ্রী জিনভদ্র সূরিভিঃ খরতর গচ্ছে।

সম্বৎ ১৫১৯ বর্ষে বৈশাখ শু০৩ (তিন) শ্রীমাল জ্ঞাতীয় সা০ লাঈয়াকেন ভার্যা গাঙ্গী পুত্র হাসাদি কুটুম্বযুতেন পুত্রী রমাই শ্রেয়োর্থ শ্রী শান্তিনাথ বিম্বং কারিতং প্রতিষ্ঠিতং শ্রীতপা গচ্ছে শ্রী রত্নশেখরসূরি পট্টে শ্রীলক্ষ্মীসাগর সূরিভিঃ । ধন্ধূকা বাস্তব্য ।।

সম্বৎ ১৫৫৮ বর্ষে মাঘ সুদি ১২ গুরৌ ওকেশ জ্ঞাতীয় ভারডা সুত মেহা ভার্যা পদমাই শ্রেয়সে ভণসালী পতাকেন শ্রী বাসুপূজ্য বিম্বং কারিতং প্রতিষ্ঠিতং খরতর গচ্ছে শ্রী জিনহংস সূরিভিঃ।

সম্বৎ ১৫৬৪ বর্ষে শা০১৪১৪ বর্তমানে মালবক দেস।। উপকেস জ্ঞাতৌ সা০ দেবসী ভা০ দেমা পু০ সা০ সাগা ভা০ রুপণং পুত্র জসপাল ভা০ লষমী পুত্র রত্না বিম্বং প্রতিষ্ঠিতং । তপা শ্রী হেমবল (বিমল) সুরিভিঃ।।

সম্বত্ ১৯০০ মিতি আষাড় সিত ৯ গুরৌ শ্রী আদিনাথ বিম্বং প্রতিষ্ঠিতং। বৃহৎ খরতর ভট্টারক গচ্ছেশ ভ০ শ্রী জিনহর্ষ পট্টে দিনকর ভ০ শ্রী জিন সৌভাগ্য

সুরিভি: কারিতং চ শ্রীমাল বংশে টাক গোত্রে মোহয়াদাস পুত্র হনুতসিংহস্য ভার্যা ফুলকুমার্যা স্বশ্রেয়োর্থ।

।। শ্রী সম্ভবনাথজীর মন্দির ।।

আজিমগঞ্জে অবস্থিত এই মন্দিরের নির্মাণ ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিল। এই মন্দির সর্বমোট ৩৬৬৫.৬৭৩১ বর্গ মি ভূমির উপর নির্মিত। শহর থেকে কিছুদূরে অবস্থিত এই মন্দিরের নির্মাণ রায়বাহাদুর ধনপতি সিংহজী দূগড় দ্বারা হয়েছিল। মন্দিরের মূল নায়ক শ্রী সম্ভবনাথজী স্বামী। এই মন্দিরে ৮৬ টি পাষাণ মূর্তি ১৬৪ টি অষ্টধাতুর মূর্তি ৪(চার) টি স্ফটিক, ১টি পান্না এবং ১২ টি করণীরত্ন, মূর্তি বিরাজমান। পূর্বভারতে অবস্থিত মন্দিরগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশী মূর্তি এই মন্দিরেই অবস্থিত। এখানে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে নলহাটী থেকে আজিম গঞ্জে এই মূর্তিগুলিকে নিয়ে আসার জন্য বিশেষ রেল লাইন বানানো হয়েছিল। এই মন্দিরের দেখভালের দায়িত্ব 'শ্রী সম্ভবনাথজী মন্দির ট্রাষ্ট' এর উপর ন্যস্ত। এর তত্ত্বাবধানে রয়েছেন শ্রী অনিলকুমার সিংহ দূগড়। বর্তমানে এখানকার অনেক মূর্তি পালিতানা পাঠানো হয়েছে।

পাষাণ নির্মিত বিশাল মূল মূর্তির উপরে খোদিত লিপি:-

।। শ্রী বীর গতাব্দা ২৪০৩, বিক্রমাদিত্য সম্বত্ ১৯৩৩, শালিবাহন অব্দ ১৭১৮ মাত্র শুক্ল একাদশ্যাং গুরুবাসরে রোহিনী নক্ষত্রে মীনলগ্নে বঙ্গদেশে মক্ষুদাবাদান্তরগতাজিমগঞ্জবাসী বৃহৎ ওস বংশে লুম্পক গচ্ছে বুধসিংহপুত্র প্রতাপসিংহ তদ্ভার্যা মহতাব কুমার্য তৎ বৃহৎ পুত্র রায় লক্ষ্মীপতিসিংহ বাহাদুর তৎ লঘুভ্রাতা ধনপতসিংহ, বাহাদুর স্বয়ং এবং গনপত সিংহ, নরপত সিংহ সপরিবারেন শ্রী সম্ভবজিন বিম্বং শান্তিনাথজী নেমনাথজী পাশ্বনাথজী মহাবীরজী পরিকর সহিত কারাপিতং ভিকট্টরিয়া সম্রাট বিদ্যামানে প্রতিষ্ঠিত সর্ব সুরিভিঃ।।

সম্বৎ ১৫১১ বর্ষে জ্যৈঃ ৩ (তিন) গুরৌ দিনে উ০ জ্ঞাতীয় শ্রী বরলব্ধ গোত্রে নাথুসন্তানে রাজা ভার্যা রাজলদে সুত সহ সাবলূরানা হুদা শ্রীমল্লযুতৌ পিতৃমাতৃ শ্রেয়সে শ্রী চন্দ্রপভ স্বামী বিম্বং কারিতং প্রতিষ্ঠিতং শ্রী বৃহদ্গচ্ছে শ্রী মুনিশেখর সূরি সন্তানে শ্রী মহেন্দ্রসূরি পট্টে শ্রী শ্রী রত্নাকর সূরিভি: শুভম্ ।।

সম্বৎ ১৫৪৬ বর্ষে মাঘ সু০১০ রবৌ শ্রী শ্রীমাল জ্ঞা০ সং০ ভুভচ ভার্যা সং ভরমাদে সুত সং০ সমরসী ভার্যা ধনাঈ সু০রা অর্জন কেন ভার্যা অহিবদে

পু০ সং০ রাণা শানা প্র০ কুটুম্বযুতেন স্বশ্রেয়সে শ্রী বাসুপূজ্য বিম্বং কারিং প্রতি০ শ্রী বৃহত্তপা শ্রী জ্ঞানসাগর সূরি পট্টে শ্রী উদয়সাগর সূরিভি:। বুগুজ গ্রাম।।

সম্বৎ ১৫৬৩ বর্ষে মাহ বদি ১১ দিনে রবৌ শ্রী শ্রীমাল জ্ঞাতীয় লঘু শাষায়াং। ব্য০ কেসব ভা০ ভরমী সুত ব্য০ বীকা ভা০ সম্পূ। ভ্রা০ ব্য০ আসাকেন ভার্যা অমরাদে ভ্রাতৃ ব্য০ লাভণ প্রমুখ কুটুম্ব যুতেন শ্রী বাসুপূজ্য চর্তুবিংশতি পট্ট কারিত: প্র০ শ্রী সূরিভিঃ শ্রী স্তম্ভতীর্থে। কুতবপুর বাস্তব্যঃ। শুভং ভবতু।

সম্বৎ ১৫৮৭ বর্ষে বৈশাখসুদি ৭ সোমে ওসোয়াল জ্ঞাতীয় সুরাণা গোত্রে সাহ শিবদাস জিনদাসকেন গৃহে ভার্যা নঙ্গ নারিগ সুত ভ্রাতৃ রাজপাল সহিতেন মাতৃ নারিগ শ্রেয়োর্থ শ্রী কুন্থুনাথবিম্বং শ্রী চতুর্বিশতি জিনসহিত কারাপিত প্রতিষ্ঠিতং শ্রী ধর্মঘোষগচ্ছে নন্দিবর্দ্ধন সূরি পদে নয়চন্দ সুরিভি:।।

সম্বৎ ১৭০০ বর্ষ ফাগুন সু০ ১২ ...গচ্ছে ভট্টারক শুভকীর্তি উপদেশাৎ অত্তাল জ্ঞাতী গোপল গোত্রে সং। দোররাজ ভার্যা সেদল পুত্র সং চেরহ রাজ ভার্যা জীরীপুত্র লালূমণী নিত্যং প্রণমন্তি।।

।। শ্রী শান্তিনাথজীর মন্দির ।।

এই মন্দির সুমেরচন্দজী বৈদের ধর্মপত্নী শ্রীমতী গুলাবকুমারী বিবি দ্বারা ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আজিম গঞ্জে নির্মাণ করা হয়েছিল। এই মন্দিরের একটি মূর্তি সম্ভবত ১৫১০ বর্ষে নির্মিত। এই মন্দির ১৬০৭.৬৪২৬ বর্গ মিটার জায়গার উপর অবস্থিত। এই মন্দিরে ৩ টি পাষাণ মূর্তি, ২ টি অষ্টধাতুর এবং ১টি স্ফটিকের মূর্তি বিদ্যমান। বর্তমান এই মন্দিরের পরিচালন দায়িত্ব " সিংঘী জৈন রিলিজিয়াস ট্রাষ্ট", আজীমগঞ্জ এর উপর ন্যস্ত।

লেখ- সম্বৎ ১৫১০ বর্ষে পৌ০ সু০ ১৫ শুক্রে উপকেশ জ্ঞাতীয় ফ০ শিবা ভা০ প্রীমলদে সুত ফ০ রামাকেন ভা০ আসু প্রমুখ কুটুম্বযুতেন নিজ শ্রেয়সে শ্রী সুমতিনাথ বিম্বং কা০ প্র০ শ্রীতপাগচ্ছ নায়ক শ্রী শ্রী শ্রী রত্নশেখর সূরিভি:।।

।। রায়বুধসিংহজী দুধোড়িয়ার বসতবাড়ীর মূর্তি।।

সম্বৎ ১৫৩৬ বর্ষে ফাগুনসুদি ৫ দিনে শ্রী উকেশ বংশে সেঠি গোত্রে শ্রী সীধরেন ভা০ ঘিরী সুলূনী পু০ থাবরসিংহ। জটাদিযুতেনং স্বশ্রেয়োর্থ শ্রী পার্শ্বনাথ বিম্বং কা০ প্র০ শ্রী খরতর গচ্ছে শ্রী জিনভদ্র সূরি পদে শ্রী জিনচন্দ্র সূরিভিঃ।

।। শ্রী সাম্বলিয়াজীর মন্দির-রামবাগ।।

কাসিমবাজার দাদাবাড়ীর প্রাচীন মন্দির তথা জিয়াগঞ্জ এবং জঙ্গীপুরের মন্দির গুলির মূর্তিগুলি পুনঃ প্রতিষ্ঠার দ্বারা সুসজ্জিত করে এই মন্দির ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীসংঘ দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। এই মন্দির ৪৫৩৫০.১৮৩৬ বর্গ মিটার জমির উপর নির্মিত। 'দাদাজী মহারাজ কা পঞ্চায়তী মন্দির 'ট্রাষ্ট' এই মন্দিরের দেখভালের দায়িত্বে নিয়োজিত। এখানে ৩৩ টি পাষাণ মূর্তি এবং ১৮ টি অষ্টধাতুর মূর্তি রয়েছে। এখানে কাসিমবাজার থেকে আনিত নেমিনাথ তথা জিয়াগঞ্জ ও জঙ্গীপুর থেকে আনিত সহস্রফণা পার্শ্বনাথের মন্দিরও রয়েছে। সাম্বলিয়ায় পার্শ্বনাথ ও অষ্টাপদজীর মন্দির এই স্থানেই রয়েছে। এখানে শ্রী জিনদত্ত সূরিজি ও কুশল সূরিজীর চরণ পাদুকাও রয়েছে।

লেখ:-সম্বত্ ১৫৪৬ মাঘ বদি ৪ সুচিন্তিত গোত্রে সা০ সোনপাল সু০ সা০ দাসূ ভা০ লাডো নাম্ন্যা পু০ সিবরাজ ভার্যা সিংগারদে পু০ চূহড়ধন্না আসকরণাদি সহিতয়া স্বপুণ্যার্থ শ্রী অজিতনাথ বিম্বং কা-প্র০ উপকেশ গচ্ছে কুকুদাচার্য সং০ শ্রী দেবগুপ্তসূরিভি:।।

জিলা—মুর্শিদাবাদ। স্থান- বালুচর।
।। শ্রী আদিনাথজীর মন্দির।।

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে কেশরীসিংহজী ছগলানী দ্বারা নির্মিত এই মন্দির জিয়াগঞ্জে অবস্থিত। জিয়াগঞ্জকে বালুচরও বলা হয়ে থাকে। এই মন্দির ৩১৫.২৬০৫ বর্গমিটার ভূমির উপর নির্মিত। এই মন্দিরের মূলনায়ক আদিনাথ ঋষভদেব। এখানে অষ্টধাতুর ১১ টি এবং পাষাণ নির্মিত ১টি মূর্তি রয়েছে। এই মন্দিরের দেখভাল "শ্রী আদিনাথ মহারাজ কে মন্দির ট্রাষ্ট" দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে। এই মন্দিরের নিকটেই রয়েছে তপাগচ্ছের উপাশ্রয়।

পাষান মূর্তির লেখ:-

।। শ্রী জিনায় নম:।। শ্রীমত্বিক্রমাদিত্য রাজ্যাৎ সম্বৎ ১৮৪৫ মিতে। শ্রী শালীবাহন শকাব্দাচ্ছকে 1720 প্রবত্তমানে। মাসোওম মাঘ মাসে শুক্লে পক্ষে তৃতীয়াং তিথৌ গুরুবাসরে শ্রী তপগচ্ছাধিরাজ ভট্টারক শ্রী বিজয় জৈনেন্দ্র সুরীশ্বর বিজয়

রাজ্যে। মহিমাপুর বাস্তব্য ছগলানী গোত্রে। সাহজী শ্রী জীবনাদাসজী তদ্পুত্র ধর্মভার ধুরন্ধর সাহজী শ্রী কেশরী সিংহজী তস্যভার্যা ধর্মকর্মণিরতা বিবি স্বরূপোজী পং। শ্রী ভাববিজয় গণিরূপদেশাৎ। স্বগৃহ জিন বিম্বং স্থাপনার্থ।। বালোচর নগরে শ্রী জিনপ্রাসাদ কারিতং। প্রতিষ্ঠিতং পং০ ভাববিজয় পং০ গম্ভীর বিজয় গণিভি:। য়াবত্বরাসুমেরোদ্রি। যাবৎ ত্রৈলোক্য ভাস্বরং। তাবত্তিষ্ঠতু প্রাসাদং নির্বিঘ্নস্তু সুনিশ্চলং।। ১ ।। লিপিকৃতং পং ভূপবিজয়েন।

শ্রী জিন শাসনো জয়তি।। শ্রী মত্তপাগণ শুভাম্বর ধর্মরশ্মি:। শ্রী সূরী হীর বিজয়োর্জিত জ্ঞান লক্ষ্মী।। যস্যোপদেশ বচনায্যবনেশ মুখ্যো। হিংসানিরাকৃত পরো প্রগুলো বভুব ১।। তৎপট্টে ক্রম তীরবীব বিজয় জৈনেন্দ্র সূরীশ্বর। স্তদ্রাজ্যে প্রগুণো জিনালয় বরো বলোচরেদ্রঙ্গকে।। শ্রী সংঘেশ সহায়তা শুভরুচি: শ্রী কেশরী সিংহক। স্তত্পত্ন্যা জিনরাজভক্তি বশত: কারাপিতোয়ং মুদা।। ২।। শ্রী বীর হীর সূরীশ সংঘাটক গুণাকর: । বাচকোত্তম ভূমান্য: শ্রী শুদ্ধি বিজয়োভবৎ ।। ৩।। তচ্ছিব্য ভাব বিজয়োপদেশ বাক্যেন কারিতং রম্যং প্রতিষ্ঠিতং চ সদনং জিন দেব নিবেশনং। শুভত:।। ৪ ।। ভদ্রংভবতু সংঘস্য ভদ্রং প্রাসাদ কারকে তথা ভদ্রং তপা গচ্ছে ভবতু ধর্মিণাং।।

ধাতুনির্মিত মূর্তির উপর লেখ:-

সম্বৎ ১৪৯০ বৈশাখ সুদি ৫ জার উডিয়া গোত্রে সা০ ভোঁদা সুত। সা০ পদাকেন পু০ ফাসু রজনাদি সহিতেন স্বভার্যা পদম শ্রী পুণ্যার্থ শ্রী বিমলনাথ বিম্বং শ্রী হেমহংসসূরিভিঃ।

সংবৎ ১৫১৩ বৈ০ সুদি ৫ গুরৌ শ্রী হুম্বডজ্ঞাতীয় ফডী০ শিবরাজ সুত মহীয়া শ্রেয়সে ভ্রাতৃ হীরাকেন ভ্রাতৃজ কুমুয়া সুতেন শ্রী শান্তিনাথ বিম্বং কারিতং প্রতি০ বৃদ্ধতপা পক্ষে শ্রী রতন সিংহ সূরিভিঃ।।

সম্বৎ ১৫২৮ বর্ষে মাঘ বদি ৫ গুরৌ উপকেশ জ্ঞাতীয় শ্রে০ তেজা ভা০ তেজলদে পুত্র জূঠা ভা০ পতসমাদে পুত্র দেবদাস গণপতি পোপট জৈসিঙ্গ পোচা যুতেন করণা শ্রেয়োর্থ সম্ভবনাথ বিম্বং কা০ শ্রী সাধূ পূর্ণিমা পক্ষে শ্রী পুণ্যচন্দ্র সুরীনামুপদেশেন প্র০ শ্রী বিজয়ভদ্র সূরিণা কডি বাস্তব্যঃ।

সম্বৎ ১৫৩৪ বর্ষে -- শু ০ ৩ দিনে সা০ অরসী ভায়া রাণূ-পুত্র সা ০ লুণাকেন ভার্যা টীসূ প্রমুখ কুটুম্ব যুতেন স্বশ্রেয়সে শ্রী ধর্মনাথ বিম্বং কারাপিতং প্রতিষ্ঠিতং তপাগচ্ছে লক্ষ্মী সাগর সূরিভিঃ পানবিহার নগরে।

সম্বৎ ১৫৫৩ বর্ষে মাহ সুদি ৬ দিনে বারডেচা গোত্রে সা০ কোহা ভা ০ সোনী পু ০ সাহ সীহা সহজা সীহা ভা ০ হীরুং শ্রেয়োর্থ শ্রী কুন্থুনাথ বিম্বং কারিতং প্র০ শ্রী কারমট গচ্ছে শ্রী...সূরিভিঃ।

সম্বৎ ১৫৭০ বর্ষে আষাড় সুদি রবৌ শ্রী শ্রীমালান্বয়ে ডউডা গোত্রে সাহ শ্রী চন্দ্র পুত্র চৌতাল্হণ অজয় রাজা রায়মল্ল আসধীর আজাভার্যা কেলী পুত্র সা০ যোগা ইল্হা শকতন পাসা নরপাল সাহ সহসমল্ল পুত্র চিঃ কীর্তিসিংহ সাহ রায়মল্ল পুত্র হেমা গজপতি ঠকুরসী। সা যোগা পুত্র মহিপাল ঠ০ ইল্হা ভার্যা ইল্হণদে পুত্র সহসমল্ল সীহমল্ল সাহ আসধর ভার্যা হাসী সিংগারদে পুত্র রায়া শকতন ভা০ শকতাদে পুত্র যেতা জইতমল। যেতাপুত্র ভেরোজাস জইতমলেন রায়া শকতন পুণ্যার্থ শ্রী শান্তিনাথ চউবীস পট্ট কারিত প্র০ শ্রী ধর্মঘোষ গচ্ছে শ্রী সাধুরত্ন সূরি পট্টে শ্রী কমলপ্রভ সূরি তৎপট্টে শ্রী উদয়প্রভ সূরিভিঃ।

।। শ্রী বিমলনাথজীর মন্দির।।

এই মন্দির শ্রী ছত্রপত সিংহজী দূগড় সম্বৎ ১৯৪৯ বর্ষে নির্মাণ করেছিলেন। এই মন্দির ২৯৪৯.২৪৫৮ বর্গ মিটার ভূমির উপর নির্মিত। এখানে অষ্টধাতুর ৮টি এবং পাষাণ নির্মিত ৭ টি মূর্তি আছে। এখানকার মূল নায়ক শ্রী বিমলনাথজী স্বামী। এই মন্দিরসংলগ্ন ধর্মশালা, উপাশ্রয়, আয়ম্বিল খাতা তথা রসোড়া আদি ব্যবস্থা প্রচলিত। এই মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব 'ভগবান বিমলনাথ স্বামীকা মন্দির ট্রাষ্ট' এর উপর ন্যস্ত। এই মন্দির সন্নিকটে রয়েছে দাদাসাহেবের মন্দির, যেখানে দাদাসাহেবর জীবনীর উপর বহুমূল্য চিত্র সজ্জিত রয়েছে।

লেখ:- ॐ সম্বত্ ১৪৮২ বর্ষে জ্যৈষ্ঠ বদি ৫ শনি ০ দূগড় গোত্রে সা ০ ধীডা পু ০ ডাড়া পুত্র সাটা হারা রগ সকনাভ্যা ডাডা পিতৃব্য সা - রূল্হা পু০ রেডা শ্রেয়সে শ্রী আদিনাথ বিম্বং কারিতং প্র০ বৃহগচ্ছীয় শ্রী অমরপ্রভ সূরিভিঃ।। শুভম ভবতুঃ।

সম্বত্ ১৫১৫ বৈ০ ব০ ৫ অতরী গ্রামে প্রাগ্বাট সা০ আসাভা০ সংসারীপুত্র সা০ কর্মসীহেন ভা ০ সারুসুত গোইন্দগোপা হাপাদি কুটুম্ব যুতেন ভাতৃজ মাহরাজ শ্রেয়সে শ্রী মুণি সুব্রত বিম্বং কা০ প্র- তপা শ্রী সোমসুন্দর সূরি শিষ্য শ্রীরত্নশেখর সূরিভিঃ।।

সাং ১৫৫১ বর্ষে বৈশাখ সুদি ১৩ দিনে শ্রী উকেশ বংশে সখবাল গোত্রে সা০ লালা ভা০ ললতাদে পুত্র সা০ জাবডেন ভা০ জবণাদে পুত্র রায়পাল তেজাবেলা লীলা রামপাল ভার্যা আংছূপুত্র লোহংট প্রমুখ সপরিবার যুতেন শ্রী মুনি সুব্রত

বিম্বং কারিতং প্রতিষ্ঠিতং শ্রী খরতর গচ্ছে শ্রী ৩ জিনসমুদ্র সূরিভি:।।

সম্বত্ ১৫৭৬ বর্ষে শ্রী খরতর গচ্ছে ভাড়ীয়া গোত্রে সা০ নাথূপুত্র সা০ পাল্হ সাং০ সকূভা০ নীপ্পা রা- সটকয়া মপসীসূ প্রমুখ কুটুম্বিকয়া শ্রী আদিনাথ বি০ কা০ ভ০ শ্রী জিনহংস সুরিভিঃ প্রতিষ্ঠিত।। শ্রী।।

ওঁ সাং ১৬৫৭ বর্ষে বৈ০ শু ০৫ ভৌমে শ্রীমাল জ্ঞাতীয় ঢোর গোত্রে সা০ ধরমগজ ভার্যা বীরুসুত সা০ সতীদাস ভার্যা বা০ ইন্দ্রানী তাভ্যাং পুণ্যার্থ শ্রী শান্তিনাথ বিম্বং কারিতং প্র০ খরতর গচ্ছে শ্রী জিনচন্দ্র সূরিভিঃ। শ্রী জিনভানুসূরিভি শ্রী জিনভানু সূরিনামুপদেশেন। অমাঈ ৪২ বর্ষে শ্রী আকবর রাজ্যে।

রৌপ্য নির্মিত মূর্তির উপর লেখ:-।।

সাং ১৯২০ মি। আসোজ সুদি ৯ তিথৌ বুধবারে মূ। বাবু শ্রী প্রতাপ সিংঘজী তৎপুত্র লক্ষ্মীপত চি। ধনপত ছত্রসিংঘ শ্রী আদিজিন বিম্বং কারাপিতং বা সদালাভ প্রতিষ্ঠিতং ।। শান্তি জিনং, নেম জিনং, পার্শ্ব জিনং, বীরজিনং পঞ্চতির্থীং । মি: মিগসর সুদ ২।। শ্রী ।।

।। শ্রী সম্ভবনাথজীর মন্দির।।

‘শ্রী মকসুদাবাদ শ্রীসংঘ’ ১৮৮৪ বর্ষে এই মন্দির নির্মাণ করেছিল। এই মন্দির ১৫৯৯.৪৮৫০ বর্গ মিটার ০ ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানকার মূলনায়ক শ্রী সম্ভবনাথজী। বর্তমানে এই মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ শ্রী শ্রীসম্ভবনাথ দেব ঠাকুরের বালুচরস্থ খরতর গচ্ছের অধীন ‘পঞ্চায়তী ভান্ডার কমিটি,জিয়াগঞ্জ ট্রাষ্ট’ করে থাকে। এই মন্দিরে অষ্টধাতু নির্মিত ১৮ টি প্রতিমা এবং পাষাণ নির্মিত ৩টি প্রতিমা বর্তমান। এই মন্দিরে দাদাসাহেবের মন্দির এবং খরতর গচ্ছের উপাশ্রয় ও রয়েছে।

পাষাণ নির্মিত মূর্তির উপরে লেখ:-

সম্বত্ ১৮৪৪ মিতে বৈশাখ সুদি ৫ রবৌ। শ্রী বালুচর পুরে। ভ০ শ্রী জিনচন্দ্র সুরিজী বিজয় রাজ্যে বাচনাচার্য শ্রী অমৃতধর্ম গণিনাং ০ পং০ ক্ষমাকল্যাণ গণিঃ। তচ্চ কুমারাদি যুতানামুপদেশতঃ শ্রী মক্সূদাবাদ বাস্তব্য সমস্ত শ্রী সংঘেন শ্রী সম্ভবজিন প্রাসাদ: কারিত: প্রতিষ্ঠাপিতশ্চ বিধিনা। সতাং কল্যাণ বৃদ্ধ্যর্থম্।

অথ চৈত্য বর্ণনং।
নিধান কল্লৈর্নবভির্মনোরমৈ।
র্বিশুদ্ধ **হেম্ণ:** কলশৌর্বিরাজিতং ।।১।।
সুচারু ঘন্টাবলি কারণাকৃতি।
ধ্বনি প্রসত্রী কৃত শিষ্টমানসম্।।২।।
চলৎপতাকা প্রকরৈ:প্রকাম।
মাকারয়ক্রনমংনিন্দ্যসত্বান্।। ৩।।
নিষেধয়ত্রিশ্চিত দুষ্টবুদ্ধীন্।
পাপাত্মণ শ্রাপতত: কথংচিৎ ।। ৪।।
সংসেব্যমানং সুতরাং সুধীভি:।
র্ভব্যাত্মভির্ভৃরিতর প্রমোদাৎ।। ৫।।
বালুচরাখ্যে প্রবরে পুরেদো।
জীয়চ্চিরং সম্ভবনাথ চৈত্যম্।। ৬।।

ধাতুনির্মিত মূর্তির উপর লেখ:-

ওঁ সম্বত্ ১৫১৫ বর্ষে আষাঢ় বদি ১ উকেশ বংশে টীংক গোত্রে ম০ সিবা ভা০ হর্ষু পু০ ম০ হীরাকেন ভা০ রঙ্গাদে পুত্রী সেনাই প্রমুখ পরিবার যুতেন শ্রীচন্দ্রপ্রভ বিম্বং কারিতং শ্রী খরতর গচ্ছে শ্রী জিনভদ্রসূরি পট্টে শ্রী জিনচন্দ্র সূরিভি: প্রতিষ্ঠিতং শ্রী:।।

সং ১৫১১র বর্ষে আষাঢ় বদি ১ শ্রী মন্ত্রিদলীয় ঠ০ লাধূ ভার্যা ধর্মিণী পুত্র স০ অচলদাসেন পুত্র উগ্রসেন লক্ষ্মীসেন সূর্যসেন বুদ্ধিসেন দেবপাল বীরসেন পহিরাজাদি যুতেন স্বশ্রেয়সে শ্রী আদিনাথ বিম্বং কারিতং প্রতিষ্ঠিতং শ্রী খরতর গচ্ছে শ্রী জিনসাগর সূরি পট্টে শ্রী জিনসুন্দর সূরি পট্টালংকার শ্রী জিনহর্ষ সুরিবরৈ ।।শ্রী।।

সং ০১৫২৩ বর্ষে বৈশাখ বদি ৪ গুরৌ শ্রী উপকেশ বংশে সঃ দেল্হা ভার্যা দুল্হাদে পুত্র বকুয়া সুশ্রাবকেন ভার্যা মেধূপুত্র জয়জইতা পৌত্র পূনা সহিতেন স্বশ্রেয়সে শ্রী অঞ্চল গচ্ছেশ্বর শ্রী জয়কেসরি সূরীণামুপদেশেন শ্রী সম্ভবনাথ বিম্বং কারিতং প্রতিষ্ঠিতং শ্রী সংঘেন।

সং ১৫২৪ বর্ষে মার্গশীর্ষ সুদি ১০ শুক্রে উপকেশ জ্ঞাতৌ আদিত্যনাগ গোত্রে সং গুণধর পুত্র স০ কালণ ভা০ কপূরীপুত্র স০ ক্ষেমপাল ভা০ জিনদেবাই

পুত্র সা সোহিলেন ভ্রাতৃপাস দত্ত দেবদত্ত ভার্যা নানূ যুতেন পিত্রৌ: পুন্যার্থ শ্রী চন্দ্রপ্রভ চতুর্বিশতি পট্ট: কারিত: প্রতিষ্ঠিত: শ্রী উপকেশ গচ্ছে ককুদাচার্য সন্তানে শ্রী কক্কসূরিভিঃ শ্রী ভট্টনগরে।।

সাং ১৫২৫ বর্ষে জ্যৈষ্ঠ ব০১ শুক্রে উপকে০ পত্তন বাস্তব্য সা০ দেবা ভা০ কপূরী পু০ সা০ আসা ভা০ নাউং পু০ হর্ষা ভা০ মনী ভা০ সাইআ রত্নসী সা০ আসকেন রত্নসী নমি০ শ্রী বাসুপূজ্য বিম্বং উপশ০ শ্রী সিদ্ধাচার্য সন্তানে প্র০ ভ০ শ্রী সিদ্ধ সূরিভিঃ।

ওঁ সম্বত্ ১৫২৭ বর্ষে জৈষ্ঠ সুদি ৮ সোমে প্রাগ্বাট জ্ঞাতীয় বু০ গঙ্গা বু০ মুজা পুত্র বু মহিরাজ ভা০ রমাই শ্রাবিকয়া শ্রী বাসুপূজ্য বিম্বং কারিতং শ্রীখরতর গচ্ছে শ্রী জিনসাগর সূরী শ্রী জিনসুন্দর সূরি পট্টরাজ শ্রী ৩ জিনহর্ষ সূরিভিঃ প্রতিষ্ঠিতং শ্রীরস্তু কল্যাণং ভূয়াত্।

সং ১৯৩৪ বর্ষে উপকেশ জ্ঞাতীয় বাস্ত গোত্রে সংঘবী জাটা ভা০ জয়তলদে পু০ মাণিক ভগিণ্যা বীরিণী নাম্ন্যা শ্রী ধর্মনাথ বিম্বং কারিতং প্রতিষ্ঠিতং তপা গচ্ছে শ্রী রত্নশেখর সূরি পদে শ্রী লক্ষ্মীসাগর সূরিভিঃ।

সং ১৫৯১ বর্ষে বৈশাখ বদি ৬ শুক্রে প্রাগ্বাট জ্ঞাতীয় ম০ পল্হা পুত্র ভ০ পাঁঞ্চা ভার্যা বাই্দেঊ পুত্র ম০ নাথা ভার্যা শ্রী নাথী পুত্র ম০ বিদ্যাধরেণ পু০ম০ হংসরাজ হেমরাজ ভীমা পুত্রী ইন্দ্রানী ইত্যাদি কুটুম্ব যুতেন শ্রেয়োর্থ শ্রী আদিনাথ বিম্বং কারিতং প্রতিষ্ঠিতং কুতব পুরা গচ্ছে শ্রী ইন্দ্রনন্দি সূরিপট্টে শ্রী সৌভাগ্যনন্দি সূরিভিঃ শ্রী পত্তন বাস্তব্য।।

সং ১৬০০ বর্ষে জৈষ্ঠ সুদি ৩ শনৌ শ্রীমাল জ্ঞাতীয় সা০ জৈঠা ভা০ মল্হাই পুত্র সোনাকার ভা০ বাই কমলাদে পু০ সোনা বীরাকেন শ্রী পূর্ণিমা পক্ষে শ্রী মুনি রত্ন সুরিণা মুপদেশেন শ্রী শ্রেয়াংসনাথ বিম্বং কারিতং প্রতিষ্ঠিতং শ্রী সংঘেন।। শুভং ভবতু কল্যাণমস্তু।।

রৌপ্য নির্মিত মূর্তির উপর লেখ:-

সম্বত্ ১৯০৩ শাকে ১৭৬৮ প্র। মাঘ মাসে কৃষ্ণ পঞ্চম্যাং ভৃগৌ বাসরে শ্রী মক্ষুদাবাদ বাস্তব্য ওসোয়াল জ্ঞাতী বৃদ্ধশাখায়ং সাহ নিহালচন্দ্র ইন্দ্রসিংঘ স্বশ্রেয়োর্থ শ্রী শান্তিনাথ জিন বিম্বং কারাপিতং। খরতর গচ্ছে শ্রী শান্তিসাগর সূরিজি: প্রতিষ্ঠিতং তপ্পা সাগর গচ্ছে ।

রায় ধনপত সিংহজীর গৃহস্থ মূর্তির উপর লেখ:-

সণ্০ ১৯২০ ফা০ কৃ০ ২ বুধে প্রতাপসিংহজী দূগড় ভার্যা মহতাব কুঁয়র চন্দ্রপ্রভ পঞ্চ তীর্থীকা। উ। সদা লাভেন প্র০ শ্রী অমৃতচন্দ্রসূরী রাজ্যে সং ১৯৪৭ আষাড় শুক্ল ১০ আত্মন: কল্যাণার্থ।

কিরতচন্দ্রজী সেঠিয়া গৃহস্থমূর্তির উপর লেখ:চাউলগোলা।

সণ্ ১৫৩৩ বৈশাখ বদি ৪ প্রাগ্বাট ব্য ০ অপা ভা ০ আল্হী পুত্র ব্য ০ ভরসীহেন ভা ০ পহপু-সাল্হাদি কুটুম্ব যুতেন স্বশ্রেয়সে শ্রী বাসুপূজ্য বিম্বং কা ০ প্র ০ তপা রত্নশেখর সূরি পদে শ্রী লক্ষ্মীসাগর সূরিভিঃ

।। শ্রী সাম্বলিয়াজীর মন্দির-কীরাতবাগ।।

শ্রী সঙ্ঘ সমাজদ্বারা ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এই মন্দির জিয়াগঞ্জে অবস্থিত। এই মন্দিরের মূলনায়ক ২৩ তম তীর্থঙ্কর শ্রী পার্শ্বনাথজী এবং ২২তম তীর্থঙ্কর শ্রীবাসুপূজ্যজী। এখানে অষ্টধাতুনির্মিত ৪০৫১৩.৬৯৯ বর্গমি ০ ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে সম্বত ১৮২১ বর্ষে দাদাবাড়ী নির্মাণ করা হয়।

পাষাণ নির্মিত মূর্তির উপর লেখ: -

।। শ্রী সন্ ১৮৩০ মাঘ শুক্ল ৫ চন্দ্রে শ্রী পার্শ্বচন্দ্র গচ্ছে উ০শ্রী হর্ষচন্দজী নিত্যচন্দ্র জীতকানামাপদেশেন। ওস বংশে গান্ধী গোত্রে সাহজী শ্রী কমল নয়নজী তৎপুত্র সাং উদয়চন্দ্রজী তদ্ধর্মপত্নি তথা ওস বং০ গহলড়া গোত্রে জগৎশেঠজী শ্রী ফতেচন্দ্রজী তৎপুত্র সেঠ আনন্দ চন্দ্রজী তৎপুত্রী বাই অজবোজী শ্রীমৎ পার্শ্বনাথ বিম্বং কারাপিতং। প্রতিষ্ঠিতশ্চ বি০ সূরিভিঃ শ্রী ভানুচন্দেনতি আচন্দ্রার্কচিরং নন্দতাৎভদ্রং ভূয়াশ্চশ্রিয়ং।

।। শ্রী সন্ ০ ১৮৩০ মাঘ শুক্ল ৯ চন্দ্রে শ্রী পার্শ্বচন্দ্র গচ্ছে উ০ শ্রী হর্ষচন্দজী নিত্যচন্দ্র জীত্কানামুপদেশেন। ঔস বং০ গান্ধী গোত্রে সা০ শ্রী কমল নয়ন তৎপুত্র সা০ উদয়চন্দ্রজী তৎধর্মপত্নী তথা ঔস বংশে গহলড়া গোত্রে জগতসেঠ শ্রী ফতেচন্দ্রজী তৎপুত্র সেঠ আনন্দচন্দ্র তৎপুত্রী বাই অজবোজী শ্রী বাসুসূজ্য বিম্বং কারপিতং। প্র০সূরি শ্রী ভানুচন্দ্রেণেতি ভদ্রং ভূয়াছিবং সদা।।

পাষাণ নির্মিত মূর্তির শ্রীচরণের উপর লেখ:-

সন্ ১৮৩০ বর্ষে মাঘ শুক্ল ৪ চন্দ্রবাসরে ও ওস বংশে গান্ধীগোত্রে সা০ শ্রীকমল নয়নজী তৎপুত্র সা০ উদয়চন্দ্রজী তদ্ভার্যা বাই অজবীজীকেন শ্রী পার্শ্ব

প্রথম আর্যাদিত্র গণধর পাদুকা কারপিতং।

সন্ ১৮৩০ বর্ষে মাঘ শুক্ল৫ সোমে গান্ধী গোত্রে সা০ শ্রী কমলনয়নজী তৎপুত্র সা০ শ্রী উদয়চন্দ্রজী তৎধর্মপত্নী বাই অজবীজীকেন শ্রী বাসুপূজ্য প্রথম সুভূম গনধর পাদুকা কারাপিতং।

সন্ ১৮৬১ চৈত্র শুক্ল পঞ্চম্যাং শনিবাসরে চন্দ্র কুলাধিপ শ্রী জিনদত্ত সূরিণাং চরণ স্থাপনং শ্রী সংঘাগ্রহেণ শ্রীজিনহর্ষে সূরীণামুপদেশাৎ প্রতিষ্ঠিতং।

ধাতুনির্মিত মূর্তির উপর লেখঃ-

সং ১৫১৪ বর্ষে বৈষ ব০ ৪ উকে০ ব্য০ গোইন্দ ভা০ রাজুপুত্র নাথু ভার্যা রূপিনি ভাতৃ-নালহাকেন ভার্যা লীলূ প্রমুখ কুটুম্ব যুতেন শ্রী শ্রেয়াংসনাথ বিম্বং কারিতং প্রতিষ্ঠিতং শ্রী সোমসুন্দর সূরিপট্টে শ্রী রত্নশেখর সূরি রাজ্যে:।। কালধরী।।

সন্ ১৫৩০ বর্ষে চৈত্র বদি ৫ গুরু রজীআন গোত্রে হুরড় জ্ঞাতীয় দোসী ঠাকুর সী ভা০ নাই দূসী সুত দোসী বালাকেন হরপাল দোসা পৌগা যুতেন মাতৃ শ্রেয়সে শ্রী কুন্থুনাথ বিম্বং কারিতং হুবড়ং গচ্ছে শ্রী সিংঘদত্ত সূরি প্রতিষ্ঠিতং। উপাধ্যায় শ্রী শীলকুঞ্জরগণি।

সং ১৯৩১ বর্ষে বৈশাখ বদি ১১ সোমে শ্রী শ্রীমাল জ্ঞা০ সা০ গোয়া ভা০ ভাউ সু০ সাজণ ভা০ মদোঅরি সু০ সা০ লটকণ ভা০ গুরাইসু০ সা০ গো সা০ সা০ পাসা সহসাখ্যৈঃ পিতৃ মাতৃ শ্রেয়সে শ্রী অজিতনাথাদি :চতুর্বিশতি পট্ট পুর্ণিমা পক্ষে শ্রী পুণ্যরত্ন সূরীনামুপদেশেম কারিত: প্রতিষ্ঠিতশ্চ বিধিনা শ্রী অহমাদাবাদ নগরে।

।। শ্রী দাদাস্থানের মন্দির।।

পাষাণ নির্মিত চরণের উপর লেখ: -

।। শ্রী ওঁ নমঃ।। সম্বত্ ১৮২১ মিতি মাঘসুদি ১৫ দিনে মহোপাধ্যায়াজী শ্রী ১০৮ শ্রী সময়সুন্দরজী গণি গজেন্দ্রাণাং শিষ্য মুখ্যোত্তম শ্রী ১০৫ জী হর্ষনন্দন শ্রী শাখায়াং ষংমিতোত্তম প্রবর শ্রী ৭ শ্রী ভীমজী শ্রী সারংগজী তৎশিষ্য পং০ বোধাজী তৎশিষ্য পং হজারী নন্দস্য উপদেশেন সুশ্রাবক পুণ্য প্রভাবক কাতেল গোত্রে সাহজী শ্রী সোভাচন্দজী তৎভাতৃ মোতীচন্দ জী শ্রীমত্ বৃহৎ খরতর গচ্ছে জঙ্গম যুগপ্রধান চারিত্র চূড়ামণি ভট্টারক প্রভুশ্রী ১০৮ শ্রী দাদাজী শ্রী জিনদত্ত সূরিজী দাদাজী শ্রী ১০৭ শ্রী জিনকুশল সূরি সূরীশ্চরানাং পাদুকা কারাপিতা মকশূদাবাদ

মধ্যে প্রতিষ্ঠিতং মহেন্দ্র সাগর সূরিভিঃ।। শুভমস্তু।

সং ১৮৭৬ রা বর্ষে মার্গশীর্ষ মাসে শুক্লপক্ষে ১০ তিথৌ শুক্রবারে বৃহৎ শ্রী খরতর গচ্ছে জং০ যু০। ভ০। শ্রী ১০৮ শ্রী জিনচন্দ্রসূরি সন্তানীয় সকল শাস্ত্রাশার্থ পাঠন প্রধান বুদ্ধিনিধান। শ্রী মদুপাধ্যায়জী শ্রী ১০৮ শ্রীরত্ন সুন্দর গণিজিনরাণাং চরণ স্থাপন।। সাহজী দূগড় গোত্রীয় শ্রী বাবু শ্রী বুধসিংহ জী তৎপুত্র বাবু শ্রী প্রতাপসিংহজী আগ্রহেণ প্রতিষ্ঠিতং শ্রীরস্তুঃ কল্যাণমস্তু:।

।। শ্রী আদিনাথজীর মন্দির -কাঠগোলা (নসীপুর-জিয়াগঞ্জ)।।

নসীপুর জিয়াগঞ্জ এ অবস্থিত এই মন্দিরের নির্মাণ সং ১৩১৩ সন্ ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ লক্ষ্মীপতসিংজী দুগড় দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল। দুগড় পরিবারের সুপ্রসিদ্ধ বিশাল বাগানে এই জৈনমন্দির, দাদাবাড়ী এবং দর্শনীয় কোঠী নির্মিত হয়েছিল। এই জিনালয়ের মূল নায়ক ভগবান শ্রী আদিনাথজী। ১৪৫১৯০.০২৮১ বর্গ মিটার০ ভূমির উপর এই মন্দির নির্মিত। এখানে ১০ টি অষ্টধাতুরও ৭ টি পাষাণ নির্মিত মূর্তি রয়েছে। এটি বাংলার পর্যটন ক্ষেত্রগুলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দর্শনীয় স্থান।

"The Jaina Temple attached with the garden house of late Rai Lachhmipat Singh Dugar Bahadur at Kathgola, is also a place of interest. This temple was built at a later date and was sanctified with stone images of Padmaprabhu, Adinath and Parshanath. It attracts attention of Jain Pilgrims from far and near and is well maintained."

লেখ:- ওঁ সম্বত ১৪৮৯ বর্ষে পৌষ বদি ১০ গুরৌ শ্রী নীমা জ্ঞাতীয়ং গঁ০ গড়দাভার্যাসংলযু তয়ো: সুতেন সহ সায়রেণ স্বশ্রেয়সে শ্রী জীবত্স্বামী শ্রী সুপার্শ্বনাথ বিম্বং কারাপিতং প্রতিষ্ঠিতং শ্রী বৃহত্তপা পক্ষে শ্রী রত্নসিংহসুরিভি: শুভম্ ভবতু।

সং ১৫৩০ বর্ষে মাঘসুদি ৪ শুক্রে সাংবোসণ০ বাসি প্রাগ্বাট জ্ঞা ব্য০ সোনা ভা০ মাউ পু০ ব্য০ নারদ বন্ধুব্য০ বিরূআকেন ভা০ বীল্হণদে পু০ দেঘর মেলা সাইপাদি কুটুম্ব যুতেন নিজ শ্রেয়সে শ্রী সম্ভবনাথ বিম্বং কা০ প্র০ শ্রী তপা গচ্ছে শ্রী লক্ষ্মীসাগর সূরিভিঃ।

সন্ ১৫০৩ শাকে ১৭৬৮ প্রবর্তমানে মাঘ কৃষ্ণ ৫ ভৃগু অহমদাবাদ বাস্তব্য ওসোয়াল জ্ঞাতী বৃদ্ধ শাখায়াং সা০ কেশরীসিংহ তৎপুত্র সাহ বিসংঘজি তৎভার্যা

রূষমনী স্বঅর্থে শ্রী আদিশ্বর জিন বিম্বং ভরাপিতং শ্রী শান্তিসাগর সূরিভি: প্র০।।

।। শ্রী জগতসেঠজীরমন্দির - মহিমাপুর।।

জগৎসেঠ মাণিকচন্দ নির্মিত প্রাচীন মন্দির তথা প্রসিদ্ধ রঙ্গমহল গঙ্গার গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ার পর নতুন এই মন্দির নির্মিত হয়েছিল। বলা হয়ে থাকে, এই মন্দির মাণিকচন্দ নির্মাণের সময় মাণিকচন্দ মুর্শিদকুলী খাঁর অনুমতিতে কষ্টিপাথর গৌড়ের কোন প্রাচীন জৈনমন্দির এর অবশেষ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। মাণিকচন্দ এই মন্দিরের নির্মাণ কাজ শুরু করেন, এবং ফতেহ চন্দ তা পূর্ণরূপে সমাপ্ত করেন। পরে এই মন্দির নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর জগৎশেঠ ফতেহচন্দ দ্বিতীয়বার এই মন্দিরের পুন: নির্মাণ করেছিলেন।

" Mahimapur, where the ancient house of the Jagatseths was situated, is now barran except a few mounds covered by jungles. Portions of the old dilapidated walls made of small thin bricks are concealed in thickets. The famous Rung Mahal Palace of the Jagatseths are gone. Much water has flowed down the Bhagirathi since the Seth brothers were taken captive by Nabab Mir Kasim on that fateful night of April,1763, and were thrown into the Ganga from Monghyr Fort.

The stately mansion of the Jagatseths stood on the eastern bank of the river, which ravaged the greater part of the palace including three temples. Among these temples there was a Hindu temple, built of Dutch Porcelain tiles by Jagatseth Hurrek Chand in 1798. Other two were Jain temples built by the First Jagatseth Fatch Chand in 1702. When the old temples were in tottering condition, Jagatseth Golab Chand removed the valuable stones and heaped them in his new palace compound. His son, Jagatseth Fatchchand, the last Jagatseth,built the present temple with one of the two sets of valuable kasauti stone slabs, so long preserved. Another set of slabs was carefully left apart but the third set was swept away with the temple by the Bhagirathi long ago.

The front of the present Jagatseth Temple was panelled

with Dutch tiles showing Biblical thems and the temple built in 1903, speaks feebly of the grandeur that had been associated with the Jagatseths. Later the Dutch tiles were removed. According to the history preserved by the Seth Family, Seth Mainkchand who accompanied Murshidkuli khan to Murshidabad from Dacca received these Kasauti stone slabs from the Nabab as a present or on an ancient Hindu temple, were brought from the ruins of Gour. Manik Chand started the temples and Fateh Chand completed the works. But the temples were ruined in course of time and Faheh Chand II rebuilt the temple. The Seth family had jain images made of pebbles, crystals and other precious stones, one of them a crystal image of Lord Kunthanath bore a date of 1664 with the price Rs,80,000 inscribed thereon. The Seth's temple now has there images of Jain Tirthankaras Mallinath, Parshanath and Rishavadeva, and Parshanath is the central figure",

লেখ:- সন্ ১৫২২ বর্ষে মাঘ বদি ১ গুরো প্রা০ জ্ঞা০ ম০ জেসা ভা০ সূরী পুত্র সর্বণেন ভা০ রূপাই মাতৃ পিতৃ শ্রেয়সে স্বশ্রেয়সে শ্রী কুন্থুনাথ বিম্বং কা০ প্র০ শ্রী সাধু পূর্ণিমা পক্ষে পুণ্যচন্দ্র সুরীণামুপদেশেন বিধিনা শ্রী বিজয়চন্দ্র সূরিভি:।। শ্রী রস্তু।

সং ১৫৩৬ ব০ ফা০ সু০ ১৫ প্রাগ্বাট ব্য০ হীরা ভা০ রূপাদেপুত্র ব্য০ দেপা ভা০ গীমতি পু০ গঙ্গাকেন ভা০ নাথী পুত্র মেরা ভাতৃ গোগাদি কুটুম্ব যুতেন শ্রী নেমিনাথ বিম্বং কা০ তপা গচ্ছে শ্রী লক্ষ্মীসাগর সূরিভি পিংকরবাড়া গ্রামে মুঁঠলিয়া বংশে শ্রীঃ।

সং০ ১৫৭৯ বৈশাখ সুদি ৬ সোমে উপকেশ জ্ঞাতৌ বলহি গোত্রে রাকা শাখায়াং সা০ পাসড ভা০ হাপূ পু০ পেথাকেন ভা০ জীকা পু০ ২ দেপা দুদাদি পরিবার যুতেন স্বপুণ্যার্থ শ্রী পদ্মপ্রভ বিম্বং কারিতং প্রতিষ্ঠিতং শ্রী উপকেশ গচ্ছে কুকুদাচার্য সন্তানে ভ০ শ্রী সিদ্ধ সূরিভি: দন্তরাই বাস্তব্য:।

স্ফটিক নির্মিত মূর্তির উপর লেখ :-

সং০ ১৭১০ ব০ জ্যে০ ১ শ্রী স্তম্ভতীর্থ বা০ উকেশ জ্ঞা০ গাঁধি গোত্রে প-সী

সীপতি ভা০ শিবা শ্রী কুন্থুনাথ বিম্বং প্র০ শ্রী বিজয়ানন্দ সূরিভিঃ। তপ (নয়) করণ।

রৌপ্য নির্মিত মূর্তির উপর :- সং০ ১৭৭৬ বর্ষে বৈশাখ শুক্ল ৫ তিথৌ। ওসোয়াল বংশীয় শ্রেষ্ঠ শ্রী মনিকচন্দজী স্বধর্ম পত্নী মাণিকদেবী প্রতিষ্ঠিতং শ্রীমত্ চতুর্বিশতি জিন বিম্বং চিরং জয়তাত্।। শ্রেয়োস্বতঃ।। ভদ্র ভবতুঃ।। ১৪

।। শ্রী নেমিনাথজীর মন্দির - কাসিমবাজার।।

" The temple of Neminath at Cossimbazar was perhaps the oldest Jain temple of Murshidabad District. At present the temple is totally gone and the images of the temple were removed else where .This Jain temple once contained the images of all the Tirthankaras of the Jains. This temple was on the south western bank of the Cossimbazar river, the main channel of the Bhagirathi now Known as Kati-Ganga, and was a place of Jain pilgrimage even in the 19th century. This temple was the central place, around which the Jain community lived during the heydays of Cossimbazar. When the Neminath temple fell in ruins, the images were removed to different places and re-instated in new temples. Some of these old images are now in Jain temples at Azimgang, Lalgola and even at Rajshahi, and are being still worshipped by the devotees."

ধাতুনির্মিত মূর্তির উপর লেখ: -

সন্ ১৪৮০ বর্ষে জৈষ্ঠ্য বদি ৫ উপকেশ জ্ঞাতীয় আয়চনায় গোত্রে সা০ আসা ভা০ বাচ্ছি পু০ মাজূ নাহূ ভা০ রূপী পু০ ক্ষেমা তালহা সাবড় শ্রী নেমীনাথ বিম্বং কা০ পূর্বতলি০ পু০ আত্মা শ্রে০ উপকেশ কুক০ প্র০ শ্রী সিদ্ধ সূরিভিঃ।।

সন্ ০ ১৫২৯ বর্ষে ফাগুন বদি ১ দিনে শুক্রে শ্রীমাল বংশো সাহু গোত্রে শ্রী সা০ পহা পুত্র সা০ পাসা ভা০ পূনাদে পুত্র সানা পাইনাদি পরিবার পরিবৃতেন শ্রী শ্রেয়াংসনাথ বিম্বং স্বপূজ্যার্থ কারিতং প্রতিষ্ঠিতং শ্রী খরতর গচ্ছে শ্রী জিনভদ্র সূরি পট্টে শ্রী জিনচন্দ্র সূরিভিঃ।।

পাষাণ নির্মিত মূর্তি এবং চরণের উপর লেখ: -

সম্বত্ ১৫৪৯ বর্ষে বৈশাখ সুদি ৭ শ্রী মূলসংঘে ভট্টারকজী শ্রী জিনচন্দ্র দেব সাহ জীবরাজ পাপড়ীবাল......।

সং০ ১৭৭৯ বর্ষে মিতী ফাগুন সুধি ৫ শ্রী গৌতমস্বামী পাদুকা কারাপিত বাকরেচা গোত্রে সা০ বীরদাস পুত্র...।

সম্বত্ ১৭৮০ বর্ষে মিতী মাহবদি ৩ বার গুরু দিনে কারিতমিদং পন্ডিত মুণিভদ্র গণিবরেণ প্রতিষ্ঠিতঞ্চ বিধিনা উ০ শ্রী কর্পূরপ্রিয় গণিভি:...কা কাস্মাবাজার।

সাং০ ১৭৮১ মিতি আষাড় শুক্ল ১০ তিথৌ শনিবারে পূজ্য শ্রী হীরাগরিজীনা পাদুকা কারাপিতা সেঠিয়া গুলাবচন্দ।।

সাং০ ১৮২১ মাঘ শুক্ল ১৩ রবৌ মহোপাধ্যায় শ্রী নিত্য চন্দ্রজী স্বর্গগত:। শ্রী পার্শ্বচন্দ্র সূরি গচ্ছে।

সম্বত্ ১৭৬৭ বর্ষে মিতি আষাড় সুদি ৯ শুভদিন বুধবারে শ্রী জিনকুশল সূরিজী সদগুরুয়া চরণন্যাস: কারিত: শ্রী সংঘেন। কাস্মাবাজার বাস্তব্য শ্রাবকৈ: সুগুণোজ্বলৈ:। পূজনীয়া: প্রতিষ্ঠিতং গুরুপাদা:... ভি:১।।

।। জীর্নমন্দির - দস্তুরহাট।।

ওঁ ভগবতে নম:।। সম্বত্ অঠ্ঠারহ সৈ গ্যারহ (১৮১১) কৃষ্ণ দ্বাদসী ভৃগু বৈশাখ।ওসোয়াল কুলগোত্রে গোখরু শ্রীমজৈন ধর্মক।সাখ ।।সভাচন্দকে অমরচন্দ সুত তিন সুত মুহকমসিংহ সুনাম। তিনকে ধাম রায় মন্দির যহ ভাগীরথী তীর বিশ্রাম।।

জগত শেঠ ও সমকালীন ভারতবর্ষ

মুর্শিদাবাদে বাংলার রাজধানী পত্তন হওয়ার সাথে সাথে আরও একটি মহান ঘটনাও একটি নতুন বাংলার রাজনীতির সঙ্গে জুড়ে গিয়েছিল,তা হল জগৎশেঠের অর্বিভাব । বৈভবশালী ঐশ্বর্যপূর্ণ ধনকুবের জগৎশেঠের উপর সৌভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। দিল্লীর বাদশাহ থেকে বাংলার নবাব তথা অনেক রাজা-জমিদার, সামন্তপ্রভুরা জগতশেঠের নিকট আর্থিক সহায়তাচাইতে দ্বিধা করতেন না। এমনকি ইংরাজ বণিকরা তাঁর অনুগ্রহ ও আর্থিক সহায়তা বিনা বাণিজ্য করতে অসমর্থ ছিল। ভারত তথা বাংলার গৌরব জগৎশেঠের উত্থান তাই ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। একসময় রাজনৈতিক, সামাজিক এবং আর্থিক সমস্ত প্রকারের কর্ম্ম তাঁর পরামর্শ ছাড়া সম্পন্ন হত না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাঁর বংশের সদস্যদের ভূমিকা সমগ্র বাংলার রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে ভাগ্যবিধাতা রূপে পরিগণিত হয়ে থাকে। সারা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় তাঁর গভীর প্রভাব ও কর্ত্তৃত্ব বিস্তৃত ছিল। তাঁর কোষাগারে হাজার হাজার কোটির সম্পত্তি মজুত থাকত যার মূল্যায়ন করা দু:সাধ্য। এখানে মারাঠাদের দ্বারা দুবার খাজাঞ্চী লুঠ হয়ে যাওয়ার পরেও উনার সম্পত্তির উপর তেমন কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয় নি । ঐ সময় সারা ভারতে উনার সমতুল কোন শ্রেষ্ঠী ছিল না যার সঙ্গে তাঁর তুলনা চলে। সমসাময়িক মুসলমান ইতিহাসবিদগণও তাঁর অপার সম্পত্তির কথা উল্লেখ করেছেন।

"The contemporary Muslim historians wrote that Seth Manik Chand had huge amount of gold and silver which could not be measured in any terms. He had a huge stock of emeralds. Proverbially it was said that he could stop the flow of river Ganga by constructing a wall of gold and silver across its stream. It is believed that of him in those days. Several times his wealth was looted but he continued to remain the richest person".

এই জগৎশেঠের আদি নিবাস যোধপুর জেলার অর্ন্তগত নাগোর নামক স্থানে। তাঁর পূর্বপুরুষ গিরধরসিংহ মারওয়াড়ের খজওয়াড়া গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। অর্থোপার্জনের প্রচেষ্টার অভাবে সম্পন্ন অবস্থা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে আর্থিক সংকটের সঙ্গে তাঁকে দিনাদিপাত করতে হচ্ছিল। সম্বৎ ১৫৫২ তে উনি জৈনমুনি জিনহংসসূরিজীর সংস্পর্শে আসেন এব জৈনধর্ম স্বীকার করেন। এরপর থেকেই তাঁর সুদিন ফিরে আসে। এবং ধীরে ধীরে তিনি সম্পন্নশালী হয়ে ওঠেন। তাঁর পুত্র গেলাজীর নামানুসারে তাঁর পরিবারের গোত্র গেলড়া হয়ে যায়। কিছুকাল পরে তাঁরা নাগোরে এসে বসবাস সুরু করেন। হীরানন্দজীর সময় পুনরায় আর্থিক সংকট দেখা দিলে তিনি পরিস্থিতির পরিবর্তনের নিমিত্ত ভিনরাজ্যে ব্যাপার বিস্তারের জন্য পরিকল্পনা করেন। মুনিজি তাঁকে পূর্বদিকে গমনের নির্দেশ দেন। হীরানন্দজী যাত্রা সুরু করেন, কিন্তু রাস্তায় তিনি একটি ফণাধর সর্পের দর্শন পান। কিন্তু এই সর্পদর্শনকে অশুভ লক্ষণ মনে করে তিনি যাত্রা স্থগিত রেখে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি পুনরায় মুনিজির কাছে আসেন এবং সবিস্তারে যাত্রাপথের বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। মুনিজি একথা শুনে বলেন,"ঐ সময় খুব শুভ মুহূর্ত ছিল, যদি ঐ সময় চলে যেতে, তবে তুমি ছত্রপতি হতে পারতে; তবে এখনও যদি রওনা হও,তবে অবশ্যই জগৎপতি হয়ে যাবে"। হীরানন্দজী পূর্বদিকে যাত্রা শুরু করেন এবং উঁচু নীচু বন্ধুর পথ অতিক্রম করে পনের দিন পর আগ্রা পৌঁছলেন।

ঐ সময় আগ্রা সম্রাট শাহজাহানের রাজধানী ছিল, যা বিশ্বের অতি সম্পন্ন এবং বৈভবপূর্ণ নগরীগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল বলে স্বীকার করা হয়। এই স্থানে তিনি এক মুদিখানাতে তিন টাকা মাইনের এক কর্মচারী হিসেবে চাকুরী লাভ করেন। ইনি গণিত বিষয়ে বিশেষ সতর্ক, মেহনতি এবং সততার মূর্ত প্রতীক ছিলেন। এই দোকানের গ্রাহকদের মধ্যে অনেক সরকারী আধিকারিক ছিলেন যাঁরা হীরানন্দের ব্যবহারে মুগ্ধ ছিলেন। এঁদের মধ্যে মীরজুমলা নামে এক অধিকারী ছিলেন, যিনি ঔরঙ্গজেবের অধীনে একজন হাকিম ছিলেন। তাঁর সঙ্গে হীরানন্দের বেশ ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল।

যখন মীরজুমলা পাটনায় বদলী হলেন তখন মীরজুমলার অনুরোধে হীরানন্দও পাটনায় চলে আসেন, এবং তাঁর সহায়তায় পাটনাতে একটি দোকান খুলে ব্যবসায় রত হলেন। যেখানে যেখানে মীরজুমলার বদলী ঘটতে থাকে, সেখানে হীরানন্দের ব্যবসারও প্রসার ঘটতে থাকে । ঐ সময় পাটনা ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য অগ্রনি স্থান হিসেবে গড়ে উঠেছিল। ওখানে শোরা, চিনি, লাক্ষা, কস্তুরী, আফিং এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে নানা মনোহারী রঙীন বস্তু সামগ্রী

আমদানি হত। ঐ সময় কোলকাতার বাণিজ্য পাটনার সমতুল ছিল না। ঔরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম-উস-শান কেবল চৌদ্দহাজারে সূতাপট্টী (সুতানুটী) গোবিন্দপুর এবং কলিকাতা ইংরেজদের বিক্রি করে দিয়েছিলেন । চুঁচুড়া হুগলী, রাজমহল, ঢাকা এবং পাটনাকে বড় বড় বাণিজ্য শহরের মধ্যে গণ্য করা হত। ইংরাজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীও পাটনাতে তাদের বাণিজ্যকুঠী খোলে। তখন ইংরাজ কোম্পানীর অবস্থা সাধারণ মাণের ছিল। তারা হীরানন্দ কোম্পানীর কাছ থেকে বেশ চড়া সূদে ধার করে বাণিজ্য চালাত।

এইভাবে হীরানন্দ সন ১৬৮৫ খ্রী: মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে নিজের মেহনত এবং ইমানদারির সঙ্গে ব্যবসা করে লক্ষপতি হয়ে উঠেছিলেন। চতুর্দিকে তাঁর কারবারের শাখা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বিহার ছাড়া ও বাংলার রাজমহল থেকে ঢাকাতেও তাঁর কারবার প্রসারিত হয়েছিল।

মীরজুমলার পর শায়েস্তা খান আর ঔরঙ্গজেবের পুত্র মোহম্মদ আজম নাজিম হয়েছিলেন। হীরানন্দ সকলের কাছেই বিশ্বাসের পাত্র ছিলেন।ইংরেজরাও কোন কাজের প্রয়োজনে নাজিমের সুপারিশের জন্য হীরানন্দের দ্বারস্থ হতেন। পরবর্তী ছাব্বিশ বছরের মধ্যে হীরানন্দ লাখপতি থেকে ক্রোড়পতি হয়েছিলেন। ষাট বছর পূর্বে বিশ বছর বয়সে নাগোর থেকে পায়ে হেঁটে মজদুরি করার জন্য আগ্রা এসেছিলেন হীরানন্দ। তাঁর জীবদ্দশায় ঔরঙ্গজেব পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করার পর মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পুত্র মুয়াজ্জম বাহাদুরশাহ উপাধি গ্রহণ করে দিল্লীর তখ্‌তে আসীন হয়েছিলেন। বাংলাও বিহারের গরীব হিন্দুদের জিজিয়া কর শেঠ হীরানন্দের কুঠীতে জমা পড়ত। মারওয়াড় থেকে অনেক যুবককে নিয়ে এসে উনি এখানে বসিয়েছিলেন এবং তাদের নানা প্রকার সুবিধা প্রদান করতেন।

সন ১৬৬৮ খ্রী: উড়িষ্যার এক আফগান গোষ্ঠী মেদিনীপুরের জমিদার শোভা সিংহের সঙ্গে মিলিত হয়ে মুঘলদের বিরুদ্ধে এক ব্যাপক বিদ্রোহ ঘোষণা করে দেয়। ঔরঙ্গজেব দীর্ঘ ১৫ বছর দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন । তখন এই সংকটের সময় শেঠ হীরানন্দ বিহারের নাজিম ও বাদশাহের পৌত্র আজিম-উস-শানকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা দিয়েছিলেন। যখন হীরানন্দের জগতশেঠ পদবী ঘোষিত হয়নাই তখনও লোকে তাঁকে জগৎশেঠ বলেই মানতেন। উনি বিহার বাংলা এবং রাজস্থানে অনেক ধর্মস্থান নির্মাণ করিয়েছিলেন। সন্ ১৭১১ খ্রী: ৮৭ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর সাত পুত্র এবং এক পুত্র ছিল। তাঁর ব্যবসার বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন তাঁর সাতপুত্র।

আমার মনে হয় জগৎ শেঠের বংশের উন্নতির পৃষ্ঠভূমি পাটনা থাকাকালীন

সময়ে রচিত হয়েছিল। পাটনায় হীরানন্দ জৈনধর্মের অনেক মন্দির এবং শ্রীজিনদত্ত সূরিজীর দাদাবাড়ী নির্মাণ করিয়েছিলেন। ঐ সময় পাটনার সিটিচকের উত্তরে এক গলি ছিল। যা "হীরানন্দ হাস্ কী গলী" নামে পরিচিত ছিল । তাঁর নির্মিত প্রাসাদ কালের প্রকোপে গঙ্গা গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। ওখানকার ঘাটও উনি নির্মাণ করেছিলেন। বিভিন্ন নথীপত্র থেকে জানা যায় যে হীরানন্দ শাহজাদা সেলিমের কৃপাপাত্র এবং খাস জহুরী ছিলেন। দিল্লীর হীরানন্দ গলিও অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। পূর্ণচন্দ্রনাহারের সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত "মানক্যদেবীরাস" নামক ঐতিহাসিক রচনা থেকে জগৎশেঠের বংশের বিষয়ে একটি প্রাসঙ্গিক উক্তি প্রণিধানযোগ্য:

নগর সুবশ পটনৈ বসৈ, ওশবংশ সিরদার।
গোত গহিলডা জগপ্রগদ, দৌলতবন্ত দাতার।। ১।।
হীরানন্দ নরীন্দ্রসম,। মানং সহু কোই আঁণ।
সত পুত্র তেহনে প্রগট, অদভূত গুণমাণি খাঁণ।। ২।।
মাঁণকচন্দ্র নরেন্দ্রসম, চৌদহ বিদ্যা ভাণ্ডার।
লছন অঙ্গ বত্তীস তসু, কাম তণো অবতার।। ৩।।
বর দেষিত হরষিত ভএ, কীনো তিলক তিবার।
করী সঝাই ব্যাহনী, রচী বরাত বিস্তার।। ৪।।

শেঠ হীরানন্দের পঞ্চমপুত্র হলেন মানিকচন্দ্র। মুর্শিদকুলী খাঁর সঙ্গে তাঁর বেশ হার্দিক সৌহার্দ ছিল। মুর্শিদকুলী খাঁর সঙ্গেই উনি ঢাকায় এসেছিলেন। ঐ সময় ঢাকা ছিল বাংলা সুবার রাজধানী। বাংলার নাজিম অজীমুশ্শান এর সঙ্গে মুর্শিদকুলী খাঁর মতভেদ সৃষ্টি হলে মুর্শিদকুলি খাঁ ঢাকা থেকে মকসুসাবাদে এসেছিলেন;তখন মানিকচন্দ্রজীও ঢাকা থেকে তাঁর সঙ্গে মকসুসাবাদ চলে আসেন। মানিকচন্দ্রের পরামর্শ অনুযায়ী মুর্শিদকুলী মুর্শিদাবাদ শহর গড়ে তোলেন এবং উনার পরামর্শ অনুযায়ী রাজকাজ চালাতে থাকেন। এই মহিমাপুরেই মানিকচন্দ্র নিজের বিশাল এবং শানদার প্রাসাদ নির্মাণ করেন। মুর্শিদকুলী খাঁর যাবতীয় প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের পরামর্শদাতা হিসেবে মানিকচন্দ্র সমূহ সহযোগিতা করতেন । এই আর্থিক সংস্কারের কারণে এই দুজন বাংলা ও বিহারের জনতার মনে জায়গা করে নেন। নবাব ট্যাঁকশাল নির্মাণের জন্য তাঁকে অনুমতি দিয়েছিলেন। তাঁর ট্যাঁকশালে নির্মিত মুদ্রা পুরো রাজ্যে প্রচলিত ছিল।

"When Seth Manik Chand established his kothi at Dacca, the then capital of Bengal, there was a political shake in the country. The Mughal Emperor Aurangzeb was losing his influence and the chiefs at distant places were increasing their personal influence and power to establish independent states. Aurangazeb had appointed Murshidquli khan as Diwan of Azimushshan, the nawab of Dacca. Intelligent, courageous and, both Murshidquli Khan and Seth Manick Chand, who had brotherly affection for each other, wielded great influence and power in Dacca. Seth Manik Chand had much helped him in becoming the Nawab of Bengal. The town of Murshidabad along river Ganga was setup with joint efforts of them both. Seth Manik Chnad invested heavily to make it a prosperous town. They sent an annual revenue of rupees two crores to Aurangzeb in place of the existing revenue of rupees one crore and thirty lakhs. Pleased with this, Aurangazeb shifted the capital from Dacca to Murshidabad. Azimusshan remained only a titular chief. The people of Bengal, Bihar and Orissa regarded Murshidkuli Khan and Seth Manik Chand as uncrowned princes of their heart. Seth Manikchand always generously helped the poor, redeemed the miseries of the oppressed and the peasants and made their condition better both financially and socially. Bengal became much peaceful and prosperous as a result of his fiscal policies and development of trade and commerce by him."

-Jagat Seth of Murshidabad, Progressive Jains of India.

জাহান্দার শাহর মৃত্যুর পর ফারুখশিয়র দিল্লীর বাদশাহী তখতে আরোহন করেন। বাদশাহ কোন এক রাজপুত রমণীকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন। এই কারণের জন্য চিন্তা থেকে হয়ত তাঁর কোন অসুখ হলে তা কোন বৈদ্য কিংবা হেকিম সেই রোগ নিরাময় করতে পারে নি । এমনই কোন সময়ে দিল্লীতে একদল ইংরেজ ব্যাপারী এসেছিলেন । তাঁদের মধ্যে ছিলেন হ্যামিলটন নামে

কোন একজন ডাক্তার। এই ডাক্তার বাদশাহকে রোগমুক্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বাদশাহ তাঁকে মূল্যবান পুরস্কারও দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন এইকথা স্মরণ করিয়ে ইংরজেরা বাংলায় কিছু পরগনা প্রার্থনা করে তা পেয়ে যায়। এই ঘটনার পর বাংলায় ইংরাজ রাজত্বের বুনিয়াদ রচিত হয়েছিল। এই ভূমি হস্তান্তর বিষয়ে বাদশাহের ফরমান মুর্শিদকুলী খাঁর হস্তগত হলে মুর্শিদকুলী তা যথাযথ তামিল না করে ইংরেজদের ফিরিয়ে দেন। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে বাদশাহ মুর্শিদকুলীকে দেওয়ান পদ থেকে বরখাস্ত করে মানিকচাঁদকে বাংলার দেওয়ান পদে নিযুক্ত করার আদেশ জারি করেন ; কিন্তু শেঠ এই পদ অস্বীকার করে বাদশাহকে অনুরোধ করেন যাতে মুর্শিদকুলী খাঁকে পুনরায় দেওয়ান পদে বহাল করা হয়। অনেক মুসলমান ইতিহাসকার, লেখক প্রভৃতি বাংলায় নবাবী শাসনের অবসানের জন্য জগৎশেঠকে দায়ী করে তাঁর সমালোচনা করে থাকেন, কিন্তু তা ঐতিহাসিক সত্য নয়। বরং যদি জগৎ শেঠ স্বয়ং বাংলার দেওয়ান হতে চাইতেন, তা হতে পারতেন; কিন্তু উনি তা কখনও হতে চান নি ।

"On receiving the Farman for his appointment as Diwan, Seth Manikchand met Murshidkuli Khan and removed the misunderstanding from his mind. With his consultation he wrote to the Emperor that though he accepts the post but again hands it over to deserving Murshidquli Khan. It shows the great character of Seth Manik Chand. He tackled the Order about releasing the land to the English very intelligently and managed that instead of transfer of land to them the English may do business in the area without paying custom tax.

The entire revenue of Bengal,Bihar and Orrisa was collected by Jagat Seth and the currency minted by him was used in these three states."

-Progressive Jains of india.

শেঠ মানিকচাঁদ ভাগীরথী নদীর কিনারে তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ এর কষ্টিপাথর দ্বারা একটি সুশোভন মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। এই প্রস্তরখন্ডগুলি উনি মুর্শিদকুলী খাঁর নিকট হতে ক্রয় করেছিলেন। আর প্রস্তরখণ্ডগুলি মুর্শিদকুলী সংগ্রহ করেছিলেন প্রাচীন গৌড়ের মৌর্য আমলে নির্মিত মন্দিরাদি লুন্ঠন করে। ভাগীরথীর ভাঙ্গনে মন্দিরের অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হয়ে উঠলে মানিকচাঁদ পুনরায় তা অন্যত্র নূতন কোন জায়গায় স্থানান্তর করে পুন: নির্মাণ করিয়েছিলেন। সম্বৎ ১৯৫৮ বর্ষে

লর্ড কার্জন যখন জগৎশেঠের মহল এবং মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখার জন্য এসেছিলেন এই প্রস্তর খণ্ডের সৌন্দর্য তাঁকে এত আকৃষ্ট করেছিল যে উনি ঐ পাথর কলিকাতায় নির্মিত ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে মহারানী ভিক্টোরিয়ার মূর্তির বেদী হিসেবে তা ব্যবহার করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু জগৎ শেঠের বংশধরেরা তা উচিৎ কাজ হবে না বলে বিবেচনা করে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি। নূতন জৈনমন্দির নির্মাণকালে শেঠ গুলাবচাঁদের পুত্র শেঠ ফতহচাঁদের (দ্বিতীয়) সময় ঐ প্রস্তর খণ্ডগুলি দিয়ে নতূন মন্দিরকে সুসজ্জিত করা হয় । শেঠ মানিকচাঁদ অপার ধনসম্পত্তির মালিক ছিলেন। বাংলা বিহার ও উড়িষ্যাতে তাঁর ট্যাঁকশালে নির্মিত মুদ্রা প্রচলিত ছিল। কর্ণেল জেমলট্যান্ডের মতে, তাঁর কাছে এত স্বর্ণ-রৌপ্যের ভান্ডার ছিল তা সোনার ইট নির্মাণ করে গঙ্গায় পুল নির্মাণ করা যেত।

জগৎশেঠের ধর্মপত্নী ছিলেন মানিকদেবী, যিনি জৈনধর্মের উপর অটুট শ্রদ্ধা রেখে পরোপকারে জীবন উৎসর্গ করার মহাব্রত পালন করেছিলেন।

এলাহাবাদ জেলার অর্ন্তগত গঙ্গার তীরে সাহজাদপুর নামক একটি শহর ছিল, প্রাচীনকাল থেকেই এই শহর অনেক সমৃদ্ধিশালী ছিল; এই নগরের উল্লেখ কবিবর পন্ডিত বনারসীদাস জৈন এর ‘অর্দ্ধকথানক’ গ্রন্থে তিন-চার জায়গায় রয়েছে, এমন কি তপাগচ্ছীয় সৌভাগ্যবিজয় কৃত ‘তীর্থমালা গ্রন্থেও’ এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই মহানগরীতে ওসোয়াল বীরানী গোত্রীয় পূরণমল নামক এক ধর্মনিষ্ঠ এবং সাধনসম্পন্ন শ্রীমন্ত বাস করতেন, তাঁর সহধর্মনীর নাম ছিল, গুলাবদেবী যিনি, বি সং ১৭৩০ শ্রাবণ কৃষ্ণা একাদশি তিথিতে তিনি এক কন্যার জন্ম দিয়েছিলেন। বালিকাটি ছিল অত্যন্ত রূপবতী এবং কোমলাঙ্গী । এই বালিকার নাম রাখা হয় কিশোরকুমারী। “হোনদার বিরবান কে হোত্ চীকনে পাত” প্রবাদ উক্তি অনুসারে শৈশব থেকেই কন্যার মধ্যে মাতা-পিতা উভয়েই বিবিধ শুভ লক্ষণ দেখতে পেয়েছিলেন। দ্বিতীয়ার একফালি চন্দ্র যেমন পূর্ণচন্দ্রে পরিণত হয়, সেইরূপ কিশোরী কন্যা কৌমার্যাবস্থা থেকে পূর্ণ যুবতী অবস্থায় পদার্পণ করল।

কিশোরীর বয়স ষোল বছর হলে পূরণমল কন্যার বিবাহের চিন্তা শুরু করেন। সুযোগ্য বরের সন্ধানে দেশ-দেশান্তরে খোঁজখবরের জন্য দূত প্রেরণ করতে থাকেন। অবশেষে পাটনায় প্রসিদ্ধ ব্যাপারী হীরানন্দ শাহর সুপুত্র মানিকচাঁদের সাথে কিশোরী কুমারীর বাগদান নিশ্চিত হল। এই মানিক চাঁদ কিছুদিন পর শেঠ উপাধীতে বিভূষিত হয়েছিলেন এবং জগতশেঠের পিতা

হয়েছিলেন। যাই হোক বাগদান কার্যসম্পন্ন হলে জ্যোতিষীরা বিবাহের শুভ মূহুর্ত নির্দেশ করেন। হীরানন্দ শাহ বরযাত্রীদের নিয়ে শাহজাদপুরে আগমন করেন। বরযাত্রীদের বিবিধ মিষ্টান্ন ভোজনের ব্যবস্থা তথা আতিথেয়তার অপূর্ব দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছিলেন পূরণমল এবং বিবিধ যৌতুকাদি ধনরত্ন প্রদান করে তিনি কিশোরকুমারীকে মানিকচাঁদের সাথে বিদায় দিয়েছিলেন।

বধূকে গৃহলক্ষ্মী মনে করা হত। হীরানন্দ শাহর গৃহে কিশোরকুমারীর বধূরানী রূপে পদার্পণের পর ধন, বৈভব, যশ এবং রাজকীয় সত্তার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছিল। বিবাহের পর কিশোরকুমারীর নতুন নামকরণ হয়, মাণিকদেবী। মানিকদেবীর গৃহপ্রবেশের সময় থেকেই হীরানন্দ শাহের পারিবারিক উন্নতির সাথে তাঁর নগরীরও অনেক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। যা থেকে মানিকদেবী এক পুণ্যাত্মা রমনী হিসেবে সূচিত হতে থাকেন। মানিকদেবী ছিলেন একজন দাত্রী। উনি গরীব লোকেদের জন্য সর্বদা 'সদাব্রত' উন্মুক্ত রাখতেন। প্রতিদিন আপন হস্তে তিনি অভুক্তদের আহারাদি এবং বস্ত্রহীনদের পরিধানের বস্ত্রদান না করে নিজে আহার করতেন না। তাঁর হৃদয় সর্বদা দু:খী ও দরিদ্রলোকদের জন্য করুণাসিক্ত ছিল।

স্বধর্মী-বন্ধুদের সেবা করাকে শাস্ত্রোক্ত বিধান মনে করে জগৎশেঠের পরিবারও সারাদিন তন-মন-ধন দ্বারা সবার মঙ্গল সাধনে সচেষ্ট ছিলেন। এর ফলে প্রথমে মুর্শিদাবাদে দুচার ঘর জৈন ধর্মাবলম্বী বসবাস করলেও, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই মানিকদেবীর প্রেরণায় ও সহায়তায় হাজারের বেশী সংখ্যায় জৈন গৃহস্থ ওখানে এসে বসবাস সুরু করেন। এঁরা লাখ লাখ টাকা স্বধর্মী বন্ধুবর্গদের সেবা ও সহায়তার জন্য ব্যয় করতেন। সম্রাট ফারুখশিয়র মানিকদেবীর উচ্চ আদর্শময় জীবন কাহিনী শ্রবণ করে উনাকে বহুমূল্য ভূষণ প্রদান করে শেঠজী উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন, এবং তাঁকে পায়ে সোনার গহনা পরিধানের অধিকার প্রদান করেছিলেন।

শেঠ মানিকচাঁদের মৃত্যুর পর মানিকদেবী ২৭ বৎসর জীবিত ছিলেন। ভক্তি, সাধনা এবং সেবা ছাড়াও মানিকদেবীর সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ ছিল। তাঁর অনুপ্রেরণায় এক কবি 'ভূপালচতুর্বিং-শতিকা' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থের অনুকরণে আপন পরিবারের বংশাবলী সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বার্তা মানিকদেবী লিখেছিলেন যা বি সন্ ১৭৭৭ মিতি ফাল্গুন কৃষ্ণা দ্বাদশীতে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিল। নিজের ২৭ বছরের বৈধব্য জীবন উনি ঘোর তপস্যার মাধ্যমে অতিবাহিত করেন। জীবনের শেষ একবছর ধরে উনি কেবল সোনার

মোহর দান করতেন। মাতা মানিকদেবীর দান ধ্যান কার্যে মুগ্ধ ও প্রসন্ন হয়ে এক কবি লিখেছেন:

কর্ণ ভোজ বিক্রম ভএ, সতযুগ মেঁ দাতার।
কলিযুগ মেঁ মানিকঁদে জিসী, দেখী নহী সংসার।।

সম্মেতশিখরের সংঘ সংস্কার সমাপনান্তে উনি তীর্থযাত্রা এবং এর পর উনি নিজকুঠীতে একটি জৈনমন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। অন্তিমপর্যায়ে অনশন ব্রত ধারণ করে উনি নিজের ইচ্ছায় দেহ ত্যাগ করেছিলেন। এই আদর্শ শ্রাবিকার বিষয়ে পার্শ্বচন্দ্র গচ্ছকবাচক হর্ষচন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিহালচন্দ নামক এক জৈনমুনি 'সেঠানী শ্রী মানিকাদেবীরাস' এর রচনা ১২৫ পদে সমাপ্ত করেন। ইনি স্বয়ং সেঠানীজীর ধর্মগুরু ছিলেন এবং তাঁর উচ্চমানের আচার বিচার এবং ব্যক্তিত্ব দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন।এই জীবনচরিত রচনা মানিকদেবীর স্বর্গলাভের প্রাপ্তির ১২ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছিল। উনি মানিকদেবী সম্পর্কে যা লিখেছেন তার দুটি পংক্তি এই রকম—

"সতজুগ মে সোল সতী হুঈ, সাধবী সাধু অনেকোঁ রে।
কলিযুগ মেঁ মোটী সতী, মানিকদে সুবিবেকোঁ রে।। ১
শাস্ত্রমাঁহি সুণতা হতা রে লাল, সাধু-সাধ্বিনী বাত রে।
পরতক্ষ দেখী আঁখ সুঁরে লাল মাত রে মানিকদেবী মাত রে।।২

স্বর্গীয় ভৈরোলালজী নাহটা মাতা মানিকদেবীর বিষয়ে যা লিখেছেন,—

"মাতা মানিকদেবীর জীবন-প্রভা অধ্যয়ন করার পর আমার মনে হয়েছে, উনি অত্যন্ত ধার্মিক বিত্তশালী সদগৃহস্থ ছিলেন। জৈন ধর্ম তথা জিন পূজার প্রতি তাঁর ছিল অটুটু শ্রদ্ধা ও ভক্তি। মহানদাতা একজন শ্রবিকার সকল ব্রত নিজের জীবনে ব্যবহারিক প্রয়োগ করে অন্য সকল শ্রাবিকাগণের কাছে তিনি এক আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, এই কারণে উনি ছিলেন একজন আদর্শ শ্রাবিকা। লক্ষ্মীর বরপুত্রী হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে কখনও গর্ব ও অহংকার স্পর্শ করতে পারেনাই। তিনি সর্বদা দীনদরিদ্রের সেবা শুশ্রুষা করে গিয়েছেন। স্বধর্মী বন্ধুদের সাথে কি ব্যবহার করা উচিত, সেই শিক্ষা আমরা মানিকদেবীর জীবনী থেকে পাই। এই সকল বিষয় বিচার বিবেচনা করলে আমরা এই সত্যে উপনীত হতে পারি যে, সতী-সাধ্বী মানিকদেবীর অননুকরণীয় জীবন এক অখন্ড প্রদীপের জ্বলন্ত

দীপশিখাসম জ্যোতি বিশেষ, যার আলো আঁধারে হাতড়িয়ে বেড়ানো আমাদের মাতা তথা ভগিনীদের করতে সর্বদা পথ প্রদর্শন করাতে থাকবে।"

বেঙ্গল গেজেটীয়ারে মানিকচাঁদের বিষয়ে লেখা রয়েছে,—

" The importance of Manikchand may be realised from the fact that in 1712, during the fight for succession Azimushan declared himself Emperor, Manikchand received a siropa and an elephant, and his nephew an elephant from the State, for their support. In the same year, when Farrukh Siyer enthroaned himself at Patna and proceeded to compete for the Delhi throne, he took loan from Manikchand to finance his endeavours. Soon after his accession, Farruk Siyar honoured Manikchand with the title of Nagar Seth (the city banker). Manikchand died in 1714, but before his death the banking house was firmly estabblished in Murshidabad. He was succeeded by his nephew Fatehchand. Fateh chand was adopted by him as a child and he has trained him up a banker and clever diplomat."

ফারুখশিয়ার তাঁর শাসনকালের তৃতীয় বৎসরে এক ফরমান জারী করে মানিকচাঁদকে 'নগর শ্রেষ্ঠী' খেতাব দিয়েছিলেন। এই খেতাব প্রাপ্তির পর সারা ভারতবর্ষে শেঠ নামে মানিকচাঁদ প্রসিদ্ধ হয়ে যান এবং নবাবের পরেই তাঁর নাম সবচেয়ে চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছিল। ঐ সময় পায়ে সোনা পরার অধিকার কেবল নবাবের পত্নীর ছিল। কিন্তু বাদশাহ স্বয়ং শেঠ মানিকচাঁদের পত্নী মানিকদেবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার প্রতিক হিসেবে পায়ে সোনার গহনা পরার অধিকার স্বরূপ পায়ে পরার সোনার গহনা উপহার প্রদান করেছিলেন।

শেঠ মানিকচাঁদের দুজন পত্নী; একজনের নাম মানিকদেবী এবং অপরজনের নাম সুহাগদেবী। কিন্তু তাঁর কোন সন্তান না হওয়ার কারণ তিনি নিজের বোন ধনবাইয়ের তৃতীয় পুত্র ফতেহচাঁদকে দত্তক নিয়েছিলেন। ধনবাইয়ের স্বামী ছিলেন আগ্রানিবাসী উদয় চাঁদজী গোখরু । শেঠ মানিকচাঁদ ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। মুর্শিদাবাদে ট্যাঁকশালের নিকটে ভাগীরথী কিনারে দয়াবাগ নামক স্থানে তাঁর অন্তিম অগ্নিসংস্কার করা হয়েছিল। কোন কোন গ্রন্থে দয়াবাগকে মানিকবাগও

বলা হয়েছে। আজ ঐ জায়গার অবস্থান সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী হন ফতেহচাঁদ ।

ফতেহচাঁদ কেবল তাঁর পূর্বপুরুষ দের সম্পত্তি ও গৌরব সংরক্ষণই করেননি বরং এর আরও সমৃদ্ধি করেছিলেন। তাঁর আমলে জগৎশেঠের পরিবার উত্থানের চরম শিখরে পৌঁছেছিল। উনি অনেক কুশলী এবং নীতিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী খাঁর সুপারিসে মুঘলসম্রাট ফারুখ শিয়ার তাঁকে জগৎশেঠের খেতাব প্রদান করেছিলেন। ইংরেজদের কোন একটি দস্তাবেজ থেকে জানা যায় এই সুপারিশ করার সুবাদে মুর্শিদকুলী খাঁ ফতেহচাঁদের কাছ থেকে পাঁচলক্ষ রৌপ্যমুদ্রা নিয়েছিলেন।

"In 1723 Fatehchand got the title of Jagat Seth from the Emperor on the recommendation of Murshidquli. An English Company record says that Murshidquli had 'Fleeced' five lakh rupees from Fatehchand in 1723, as a price for the conferment of the title. Jagat Seth became the most influential private person in Murshidabad."

-West Bengal District Gazatteers

ফারুখশিয়রের পর মহম্মদ শাহ দিল্লীর বাদশাহ হন। ঐ সময় মুঘল সুলতানেতের আর্থিক সমস্যা চরমতম স্থানে পৌঁচেছিল, এবং রাজনৈতিক অস্থিরতাও বজায় ছিল। শেঠ-ফতেহচাঁদের পরামর্শে বাদশাহর কিছুটা আর্থিক সুরাহা হয়েছিল। এই জন্যও বাদশাহ ফতেহচাঁদকে জগতশেঠ উপাধিদ্বারা সম্মানিত করেছিলেন। এমনকি উনার পুত্র আনন্দচাঁদকেও এই শেঠ উপাধি প্রদান করেছিলেন।

মুর্শিদকুলীখাঁর মৃত্যুর পর উনার জামাতা শুজাউদ্দিন বাংলা এবং উড়িষ্যার নবাব হয়েছিলেন। উনি অনেক ইমারত নির্মাণ করিয়েছিলেন এবং যাঁকজমক সহকারে বিলাসিতায় জীবন কাটাতে ভালবাসতেন। এর জন্য বিপুলপরিমাণ অর্থব্যয় হওয়ার কারণে উনাকে জগতশেঠ, হাজী আহমদ এবং আলমচাঁদের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হত। এই জন্য উনি জগতশেঠের সঙ্গে সবসময় সুসম্পর্ক রখ্যা করে চলতেন। ঐসময় জগত শেঠের সঙ্গে ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানীর মধ্যে আর্থিক লেনদেনের কারণে গভীর মতভেদও দেখা দিয়েছিল। কোম্পানীর জগতশেঠের কাছ থেকে অর্থ আত্মসাৎ করার অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু জগতশেঠ

ফতেহচাঁদ নিজের কুশলতা এবং বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগকরে নিজের ন্যয্যপাওনা আদায় করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। জগতশেঠ ফতেহচাঁদের পদমর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব এত বেশী ছিল যে উনার সহায়তাবিনা কেউ সফল হতে পারত না । উনার সঙ্গে কোন বিরোধ করে কেউ পার পেতনা। কোম্পানী কোন বিবাদে জড়িয়ে পড়লে কোম্পানীর কারবার বন্ধ হয়ে যেত। তখন কোম্পানীকে জগতশেঠেরই দ্বারস্থ হতে হত। এহেন জগতশেঠের অর্থ না চুকিয়ে কোম্পানীর কোন গতি ছিলনা । ইংরাজ কোম্পানী খুবভালভাবে বুঝতে পেরেছিল জগতশেঠের সহায়তা ছাড়া ব্যাপার পরিচালনা অসম্ভব। সন্ ১৭৩৯ এ সুজাউদ্দিন এর মৃত্যুর পর উনার পুত্র সরফরাজ বাংলার নবাবের কুর্সিতে আরোহণ করেন। কিন্তু সরফরাজ ছিলেন অত্যন্ত বিলাসী কমজোরী ও নরম স্বভাবের ব্যক্তি।

প্রায় এই সময় ইরানের নাদিরশাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করে দিল্লীতে ব্যাপক হিংসাও লুঠরাজ সুরু করেন। বাংলার সম্পদ উনার নজরে আসে। এই আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষমতা সরফরাজের ছিলনা। এই সংকটের সময় বাংলার সকল ছোট বড় সব জমিদার রাজা এবং স্বয়ং নবাব জগতশেঠের কাছে আসেন। জগতশেঠের মহিমাপুরের কোঠী মন্ত্রনা গৃহে পরিণত হয়েছিল। অবশেষে জগতশেঠের পরামর্শ মোতাবেক উনার ট্যাঁকশাল থেকে একলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত করে নাদির শাহকে ভেট দেওয়া হয়েছিল। এতে প্রসন্ন হয়ে নাদির শাহ বাংলা আক্রমণের পরিকল্পনা ত্যাগ করেন এবং বাংলা রক্ষা পায়।

মহিমাপুরে এক অত্যন্ত সুন্দর কন্যা ছিল, যার সঙ্গে জগতশেঠ তাঁর প্রপৌত্রের বিবাহের সম্বন্ধ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সরফরাজ ঐ কন্যার রূপলাবন্যে মুগ্ধ হয়ে ঐ কন্যাকেই তাঁর মহলে প্রেরণকরার জন্য জগতশেঠকে আদেশ দিয়েছিলেন। জগতশেঠ এই প্রস্তাবে আপত্তি জানালে সরফরাজ জবরদস্তি করে ঐ কন্যাকে মহলে আনতে বলেছিলেন।

He (Fatehchand) had about this time married his youngest grandson named Seet Mohtab Roy to a young creature of exquisite beauty, aged about eleven years. The fame of her beauty coming to the ears of the Sarfaraj Khan he turned with curiosity and lust for the possession of her, and sending for Juggaut Seth demanded a sight for her.

-Holwells Interesting Historical Events. Pt. I. Chapt. II p-70

মুসলমান ইতিহাসকারগণ এই ঘটনার উপর পর্দাঢাকা দেওয়ার জন্য লিখেছেন, মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যুর সময় জগতশেঠের নিকট উনার এককোটী রূপয়া জমাছিল। (কেউ কেউ বলে থাকেন সাত কোটী) সরফরাজ খাঁ এই অর্থের জন্য জগতসেঠকে সবসময় প্রতারিত করতে থাকেন। এই জন্য নবাবের বদনাম করার জন্য এই ধরণের ষড়যন্ত্র জগতশেঠ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, যে জগত শেঠের রোজকার কারবারের অর্থ ছিল এক কোটীর, এই ধরণের জগতশেঠের কাছে এককোটী কিংবা সাত কোটীর খুব একটা বড় বিষয় নয়। ফতেহচাঁদ অনেক দূরদর্শী, বুদ্ধিমান এবং ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। যিনি কারুর অর্থ রাখাও দূরের কথা, প্রয়োজনে উনি বিভিন্নভাবে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য সদা তৎপর থাকতেন। মুসলমান ইতিহাসকারগণ যাই বলে থাকুকনা কেন ঐ সময়ের এই ঘটনা এক ভীষণ অপরাধ ছিল যা নবাব সরফরাজ করেছিলেন। সরফরাজের বিলাসিতার কারণে রাজকোষ সম্পূর্ণ খালী হয়ে গিয়েছিল। এমনকি এইঘটনাতে দিল্লীর বাদশাহ সরফরাজের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। এমনকি বাদশাহর সম্মতিতে বিহারের হাকিম আলীবর্দী খাঁ সরফরাজকে গদিচ্যুতি করার জন্য আক্রমণ করেন। গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজ পরাজিত ও নিহত হন, এবং আলীবর্দীখাঁ বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব হয়ে যান।

আলীবর্দী খাঁ অনেক শান্তিপ্রিয় এবং কুশল ব্যক্তি ছিলেন। ঐসময় ১৭৪১-৪২ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠারা বাংলা আক্রমণ করেছিলেন। মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিপুল অর্থের প্রয়োজন জগতশেঠই জোগান দিয়েছিলেন। জগতশেঠের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখার জন্য আলীবর্দী সবসময় জগত শেঠের প্রতি অনেক সম্মানজনক ব্যবহার প্রদর্শন করতেন। মারাঠা আক্রমণের সময় জগতশেঠের সুরক্ষার জন্য জগতশেঠকে সুরক্ষিত স্থানে প্রেরণকরে সেনাপতি মীরহাবিবকে মুর্শিদাবাদ এবং জগতশেঠের কোঠী সুরখ্যার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু ষড়যন্ত্রকরে মীরহাবিবই মারাঠাদের জগতশেঠের কোঠী লুন্ঠনে সহায়তা দেন। আনুমানিক দুকোটী টাকার সম্পত্তি মারাঠারা লুঠ করে। একবছর পরে পুনরায় মারাঠারা হামলা করতে এলে আলীবর্দী সন্ধি করার ছলনায় ভাষ্কর পন্ডিত কে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে হত্যা করান।

জগতশেঠের কাছে এত সম্পত্তি ছিল যে মারাঠারা দুকোটী টাকা লুঠ করলেও উনার সমৃদ্ধির উপর এর কোন প্রভাব ছিল না। উনার কারবারে লেনদেন হুন্ডীর মাধ্যমে সম্পন্ন হত। যেখানে হুন্ডীর অর্থরাশি পঞ্চাশ লক্ষ থেকে এক কোটী পর্যন্ত ছিল তাকে বলা হত দর্শনী হুন্ডী। বাংলার সমস্ত দেওয়ানী এবং আর্থিক

বিষয়ক মামলা জগতশেঠের অধিকারে ছিল। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী জগতশেঠের কাছে লক্ষ লক্ষ টাকা কর্জ করতেন যা রৌপ্যচাঁদি বিক্রীকরে পরিশোধ করতে হত। এইভাবে বাণিজ্যের বিষয়ে সবাইকে জগতশেঠের উপরই নির্ভর করতে হত।

"In 1732 when the English East India Company sent Rs. 1,50,000 to Patna, they borrowed the amount from the House of Jagat Seth. At Kasim Bazar, the servents of the company borrowed Rs.2,00000 from the House. The Company was irritated but had to admit that if they were to trade in Bengal. Fateh Chand must be satisfied and the house must be kept in temper.

জগতশেঠের মহত্ত কেবল মুর্শিদাবাদ নয়, দিল্লীর রাজনৈতিক পরিসরে ও জোরদার অবস্থিত ছিল। ইয়োরোপীয় বণিকগণ তাদের কোম্পানী বিষয়ক সমস্ত কাজকর্ম দিল্লী কিংবা নবাবের দরবারে সম্পন্ন করতে চাইলে জগতশেঠের মাধ্যমেই তা করতে হত।

"Fateh Chand's nearness to the political supremos in Delhi and Murshidabad gradually led to his involvement in the politics of the period. The European Companies courted him for his word carried great weight with the Nawab and the Mughal Emperor. Whenever they needed some favour from the Nawab or the Emperor, they routed their request through the House of Jagat Seth."

জগতশেঠের এত প্রভাবশালী হওয়ার পশ্চাতে কি কি কারণ থাকতে পারে তার আন্দাজকরতে গিয়ে একজন লেখক উল্লেখ করেছেন—

" The major sources of the huge income, tremendous power and great prestige of the house of Jagat Seth were derived from their forms of Murshidabad and Dacca mints, two-thirds of the province's revenue collection,their control over rates of exchange, interest rates, bill-broking and the provision of credit.'

The economic importance of the House received impetus when it was called upon to remit the annual tribute of the

Subah to Delhi.

The existence of branches of the House in all the important trade centres in eastern, northern and western India, enabled the House to carry on the work of transmission of money through hundis. This was a very important segment of their activities. A contemporary author noted that a darshani hundi between rupees fifty lakhs and one crore could be drawn in the time of Seth Fateh Chand. The prosperity of the House was so well established that even when the Marathas in 1742 looted Rupees two crores from the House of Jagat Seth, its liquidity was not impaired. In 1747 the Chief of the Dacca Factory of the English East India Company received Rs. One Lakh by means of a hundi sent from Kasimbazar and discounted by the House of Jagat Seth."

ফতেহ চাঁদের জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম চিল আনন্দচাঁদ, যিনি ফতেহচাঁদের জীবদ্দশায় মৃত্যু বরণ করেছিলেন। এই জন্য ফতেহচাঁদের মৃত্যুর পর উনার পৌত্র মহতাবচাঁদ উনার গদীর উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। ঐ সময় দিল্লীর বাদশাহ ছিলেন আহমদশাহ। উনি মহতাবচাঁদকে জগতশেঠ এবং উনার ভাই স্বরূপচাঁদকে মহারাজা খেতাব প্রদান করেছিলেন। জৈন তীর্থ সম্মেতশিখরের অধিকার এই ভাতৃদ্বয়ের উপর ন্যাস্ত করেছিলেন। "পারসনাথ সিংহ তাঁর 'জগতসেঠ' নামক এক পুস্তক উল্লেখ করেছেন, অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক উথাল-পাথাল অবস্থার মধ্যে ইংরাজজাতি বাংলার অধীশ্বর হয়েছিলেন, এর ইতিহাসের পশ্চাতে মুর্শিদাবাদের জগতশেঠের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুর্শিদাবাদ থেকে দিল্লী পর্যন্ত জগতশেঠ পরিবারের এমনই প্রভাব প্রত্তিপত্তি ছিল। এর কারণ, দিল্লীর বাদশাহের গদির ভিত্তি হয়ে উঠেছিল এই পরিবার। প্রথম জগতশেঠ ফতেহচাঁদ যে সম্মান ও মহত্ব অর্জন করেছিলেন তা ছিল রাজকার্যে আপনার সহযোগ দেওয়াকে কেন্দ্র করে। এই রাজসেবার গভীরতা এতই মহত্বপূর্ণছিল যে মুঘল সাম্রাজ্যের বিপত্তিকালে দিল্লীর লালকেল্লায় হুন্ডির সাহায্যে কোটী সওয়াকোটী টাকা জোগান দিতে সমর্থ ছিল এই পরিবার। জগতশেঠ সরকারের এক অভিন্ন অঙ্গ হয়ে গিয়েছিল এবং সরকারের সঙ্গে সযুক্ত হয়ে একে অপরের হানি কিংবা লাভ কে নিজের হানি কিংবা লাভ হিসেবে দেখতেন।

" Their riches were so great, that no such bankers were ever seen in Hindusthan or Deccan, nor was there any banker or merchant that could stand a comparison with them, all over India. It is even certain that all the bankers of their time in Bengal, were either their factors, or some of their family. Their wealth may be guessed, by this only fact. In the first invasion of the Marathas, and when Moorshoodabad was not yet surrounded by walls, Mir-habib, with a party of their best horses, having found means to fall upon that city, before Aly-verdy khan could come up, carried from Jagat Sett'shouse two crores of rupees in Arcot coin only; and this religious sum did not affect the two brothers, more than if it had been two trusses of straw. They continued to give afterwards to Government, as they had done before, bill of echange, called darshani hundies, of one crore at a time by which words is meant, a draft, which the acceptor is to pay at sight, without any sort of excuse. In short, their wealth was such that there is no mentioning it without seeming to exaggerate, and to deal in extravagant fables. Thousands of their agents and factors have acquired such fortunes in their service, as have enabled them to purchase large tracts of land and other astonishing possessions."

Seir Mutaqherin,Trams. Vol.II.P.P-226-227

সন্ ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে আশি বৎসর বয়সে আলীবর্দী খাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর পর তাঁর কন্যা আমিনা বেগমের পুত্র সিরাজউদ্দৌলা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হন। সিরাজউদ্দৌলা এবং আলীবর্দী খাঁর বিষয়ে ১৭৭৮ খ্রী: Robert Ormey লিখেছেন—

" Mirza Mahmud Siraj, a youth of seventeen years, had discovered the most vicious propensities, at an age when only follies are expected from princes. But the great affection which Aldaverdy (Ali Vardi) had borne to the father was transferred to this son, whom he had for some years bred in his own

palace, where instead of correcting the evil dispositions of his nature, he suffered them to increase by overweening indulgence : born without compassion, it was one of the amusements of Mirza Mahmud's childhood to torture birds and animals, and taught by his minions to regard himself as of a superior order of being, his natural cruelty, hardened by habit, rendered him as insensible to the sufferings of his own species as of the brute creation [animals], in conception he was not slow, but absurd, obstinate, sullen, and impatient of contradictions, but not withstanding this insolent contempt of mankind, innate cowardice, the confusion of his ideas rendered him suspicious of all those who approached him, excepting his favourites, who were buffoons and profligate men, raised from menial servants to be his companions with these he lived in every kind of intemperance and debauchery, and more especially in drinking spiritous liquors to an excess, which inflamed his passions and inpaired the little understandung with which he was born. He had, however, cunning enough to carry himself with mush demureness in the presence of Alloverdy, whom no one ventured to inform of his real character, for in despotic states the sovereign is always the last to hear what it concerns him most to Know."

কনিষ্ক লিখিত 'জগৎশেঠ' গ্রন্থে স্পষ্ট উল্লিখিত হয়েছে যে আলীবর্দী খাঁর সময় নবাবী সেনারা বেতন না পাওয়ার কারণে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করেছিলেন, তখন জগৎশেঠ অর্থ দিয়ে নবাবকে সহায়তা দেন। এমনকি জগৎশেঠ অর্থের সাহায্যে নিজেই নিজের সুরক্ষার জন্য সেনাবাহিনী গঠন করতে সমর্থ ছিলেন, কিন্তু তিনি নবাবের প্রতি তাঁর আনুগত্য দেখাতে কোন সময় কার্পণ্য করন নি। আলীবর্দী খাঁও জগৎশেঠকে অনেক সম্মান ও সমাদর করতেন, এবং জগৎশেঠের সুরক্ষ্যার জন্য সদা সচেষ্ট থাকতেন।

আলীবর্দী খাঁ মৃত্যুর পূর্বে সিরাজকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করার পর জগৎশেঠের শলাপরামর্শ নেওয়ার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু সিরাজ ছিলেন অত্যন্ত অস্থিরচিত্ত এবং চঞ্চলস্বভাবের। কার সঙ্গে কিরূপ আচরণ করতে

হয়, এ বিষয়ে সিরাজের কোন কাণ্ডজ্ঞান ছিলনা। তাঁর এই আচরণে দরবারের প্রতিটি সদস্য অসন্তুষ্ট ছিল।

" Making no distinction between wise and virtue, he carried defilement whenever he went, and like a man alienated in his mind, he made the house of men and women of distinction the scenes of his depravity, without minding either rank or station. In a little time became detested as pharaoh, and people on meeting him by chance used to say, " God save us from him!"

আলীবর্দীর জ্যেষ্ঠা কন্যা ঘসেটি বেগম সিরাজকে নবাবের পদে দেখতে চাননি। উনি ছিলেন নি:সন্তান বিধবা। তাঁর নিকট অগাধ সম্পত্তি ছিল। তাঁর দ্বারা তিনি গৌড়ের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ থেকে কালো মর্ম্মরের স্তম্ভ সংগ্রহ করে সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। এর চারিদিকে বিশাল ঝিল নির্মাণ করা হয়েছিল, যার নাম মোতিঝিল। নবাবের সিংহাসনে বসার পর সিরাজের সামনে দুটি প্রধান সমস্যা ছিল। প্রথমটি ছিল ইংরাজদের বাড়তি উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথ রুদ্ধ করা এবং দ্বিতীয়টি ছিল, বিরোধী স্বজনদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করা। সিরাজ গদিতে বসার পর পরই সেনা প্রেরণ করে ঘসেটিবেগমের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তাঁর সঙ্গে অশোভনীয় ব্যবহার প্রদর্শন করলেন। উনি সেনাধ্যক্ষ মীরজাফরের শক্তি ও মর্যাদা খর্ব করলেন।

"The Young nawab faced two pronged problems : the increasing ambitions of the British and the conspiracy of his disgruntled relatives who were allied with the bureaucrats. He tried to encounter these by first relieving his maternal aunt,Begum Ghasiti (a scheming and intriguing person) of her wealth and slashing the powers of Mir-jafar, the Commander-in-Chief (Bakshi) of the royal army".

মুতাখরীন অনুসারে নবাব সিরাজ শেঠ মহতাবচাঁদের সঙ্গে অনেক অশোভনীয় ব্যবহার করতেন এবং তাঁর পরামর্শকে গুরুত্বহীন মনে করে অবজ্ঞা করতেন । প্রতিটি কথায় মহতাবচাঁদকে জোরজবরদস্তি মুসলমান বানানোর ভয়ও দেখাতেন। সিরাজের চরিত্র সম্পর্কে মুসলমান ইতিহাসকার গুলাম হুসেন সেলীম লিখেছেন:

" Owing to Siraj-ud-Dawla's harshness of temper and

indulgence, fear and terror had settled on the hearts of everyone to such an extent that no one among his generals of the army or the noble men of the city was free from anxiety. Amongst his officers-whoever went to wait on Sirajud-dowla despaired of life and honour, and whoever returned without being disgraced and ill-treated offerd thanks to God. Sirajud-Dowla treated all the noblemen and generals of Mahavat Jang [Ali Vrdi Khan] with ridicul- and drollery, and bestowed on each some contemptuous nickname that ill-suited any of them. And whatever harsh expressions and abusive epithet came to his lips, Siraj-ud-Dowla uttered them unhesitatingly in the face of everyone and no one had the boldness to breath freely in his presence.”

বাংলায় যিনি নবাব হতেন, বাদশাহ দ্বারা স্বীকৃতি বা অনুমোদন তাঁর অনুকুলে সনদ আকারে প্রাপ্ত করতে হত। এই সনদ্ জগতশেঠের মাধ্যমেই দিল্লী প্রেরণ করত। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে এই সনদ আনয়ন করার কাজ বিলম্বিত হওয়ার কারণে পূর্ণিয়ার নবাব সৌকত জং এবং সাজ্জাদ আহমেদ দিল্লীর বাদশাহের প্রধানমন্ত্রীকে নিজ পক্ষে এনে বাংলার নবাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। সিরাজ এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য মোহনলাল ও মীরজাফরকে প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধের জন্য নবাব ব্যাপারী সম্প্রদায়ের কাছ থেকে তিনকোটি মুদ্রা সংগ্রহ করার জন্য জগৎশেঠকে আদেশ দিয়েছিলেন। এত লোকের উপর জুলুম করে অর্থ আদায় করা অসঙ্গত ও অনৈতিক মনে করে জগতশেঠ এর প্রতিবাদ করেছিলেন। এর ফলে নবাব জগৎশেঠের মুখে ঘুসি মেরে প্রহার করেছিলেন এবং বন্দী করার আদেশ দিয়েছিলেন। এই ব্যবহারের দ্বারা মুঘল বাদশাহ কে সিরাজ অপমান করলেন, কারন স্বয়ং বাদশাহ বংশপরম্পরায় জগতশেঠকে সম্মান করতেন। পরে মীরজাফর জগতশেঠকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। (অনেক ইতিহাসকার এই ঘটনার উল্লেখ করেন না, কিন্তু নিখিলনাথ রায় এই ঘটনা তাঁর মুর্শিদাবাদ কাহিনীতে উল্লেখ করেছেন)।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে জানা যায় সিরাজউদ্দৌলা ছিলেন অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী এবং বিলাসী।। উনি অনেক হত্যা কাণ্ডেরও নায়ক। মহিমাপুরের একটি সৎগৃহস্থ পরিবারের মোহনলালের ভগিনী, যিনি বাংলার মধ্যে সর্বাধিক

সুন্দরী বলে খ্যাত ছিলেন তাঁকে নিজের অন্ত:পুরে তুলে এনেছিলেন সিরাজ। রানী ভবানীর বিধবা পুত্রী তারাকে অংকশায়িনী করার জন্য সিরাজ এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। এর ফল তারা অগ্নিতে আত্মহুতি দিয়েছিলেন। অনেক ঐতিহাসিকদের মতে সিরাজউদ্দৌলা জগৎশেঠ পরিবারের আত্মমর্যাদা ও গরিমাকে ভূলুণ্ঠিত করেছিলেন। "পলাশীর যুদ্ধ' নামক এক গ্রন্থে সিরাজের এই বদস্বভাবের কথা চিত্রিত করা হয়েছে। প্রজাদের মধ্যে সিরাজের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল। এদিকে ইংরাজদের সঙ্গেও শত্রুতা বাড়তে থাকে। জগৎশেঠ ইংরাজদের শত্রুতার মূল্য চোকাতে রাজী ছিলেন না, কারণ জগৎশেঠ জানতেন ইংরাজদের বিরুদ্ধে নবাবের সৈন্যবাহিনী সংগঠিত ছিলনা এবং রাজকর্মচারীবর্গ সিরাজের উপর বীতশ্রদ্ধ ছিল, কিন্তু সিরাজ এসব কিছুকে অগ্রাহ্য করেছিলেন। ইতিমধ্যে ইংরাজ কলিকাতায় তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে সমর্থ হয়েছিল এবং তা ফোর্টউইলিয়াম দ্বারা সুরক্ষিত করা হয়েছিল। আলীবর্দীর সময় যে সকল সভাসদ্ অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও অনুগত ছিল, তারাও সিরাজের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল।

১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ শে মে সিরাজ ইংরাজদের মুর্শিদাবাদের কাশিমবাজারের কুঠী দখল করে নেন, জুন মাসে সিরাজ কলিকাতা দখল করে নিতে সমর্থ হলেন, যে কলিকাতা ইংরাজদের মুখ্য ঘাঁটি ছিল। এই ঘটনার পর সিরাজ পুর্ণিয়ায় শৌকতজংএর বিরুদ্ধে অভিযান করেন। এই অবসরে ইংরাজরা পুনঃ কলিকাতা দখল করতে সমর্থ হয়, এবং মীরজাফরের সঙ্গে এক গোপন সন্ধি করে। অবশেষে রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে ইংরাজবাহিনী ২৩ জুন,১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজুদ্দৌলাকে পরাজিত করে। কিছুকাল পরে সিরাজউদ্দৌলা নিহত হন এবং মীরজাফর বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাবের সিংহাসনে আসীন হন। এই সমস্ত ঘটনাক্রমের মধ্য দিয়ে বার বার নবাব কর্তৃক জগতশেঠ অপমানিত হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যক্ষরূপে নবাবের বিরোধিতা করেন নি এবং ইংরাজদের পক্ষও গ্রহণ করেন নি । এ পর্যন্ত সিরাজউদ্দৌলা ও ইংরাজদের মধ্যে মিত্রতার সেতু হিসেবেই থেকেছেন, কারণ উনি জানতেন দুপক্ষের কারুর সঙ্গে সঙ্গ দেওয়া মানে 'একপাশে খাদ আর অন্য দিকে কুয়ো'র মত।

" On the 24 May 1756 AD Siraj occupied the Cossimbazar factory of the British. He went on to occupy Calcutta in June 1756 A.D, Next he went to Purnea, Bihar to quell the rebellion of his cousin Shaukat Jang, also a contestant for the throne. Taking advantage of this turbulent situation, the British

reconqured Calcutta in February 1757 A.D, and struck a secret deal with Mir-Jafar. When the British captured the French factory at Chandernagore, the French sought help from Siraj. The Final showdown between Sirajuddaula and the British army, commanded by Robert Clive, took palce at the fields of Plassey, a tiny village, located midway between Calcutta and Murshidabad. Owing to an act of gross betrayal by Mir-Jafar, Siraj was defeated on 23rd June 1757 A.D. and Subsequently killed. Mir-Jafar ascen ded the throne of Bengal."

ইংরাজ মীরজাফরকে নবাব বানাতে চেয়েছিল, কিন্তু জগৎশেঠ এতে রাজী ছিলেন না। পরন্তু উনি এই প্রস্তাবের বিরোধিতাও করেন নাই, কারণ মীরজাফরই তাঁকে কয়েদমুক্ত করেছিলেন। কিছু ইতিহাসবিদ ভারতে ইংরাজ রাজত্বের স্থাপনার জন্য জগৎশেঠকে দোষী সাব্যস্ত করে থাকেন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ঐ সময় মুঘল সাম্রাজ্য পুরোপুরিভাবে হীনবল হয়ে গিয়েছিল। ঐ সময় সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্যে কেবলমাত্র বাংলা ছিল সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী সুবা, তার কারণ জগত শেঠের অধিকারে পুরো অর্থনৈতিক প্রশাসন ন্যস্ত ছিল। কিন্তু ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মুঘলসম্রাট শাহ আলম বাংলা, বিহার, ও উড়িষ্যার দেওয়ানি প্রশাসন ইংরাজদের উপর সমর্পণ করেন, এবং এর পর বাংলার পতন শুরু হয়ে যায়। ভারতবর্ষে ইংরাজ শাসনের প্রতিষ্ঠার মুখ্য কারণ মুঘল সম্রাটের দুর্বলতা এবং সিরাজউদ্দৌলার অদূরদর্শী নীতি, যার অনিবার্য ফলশ্রুতি ছিল বাংলার পতন এবং ইংরাজ সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়তর হওয়া।

সিরাজউদ্দৌলার পর মীরজাফর নবাব হলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন ইংরাজদের হাতের কাষ্ঠপুতুল বিশেষ। সমস্ত কর ইংরাজরা আদায় করতে থাকে ফলে নবাবের কোষাগার শূন্য হতে থাকে। যদিও একথা বলা হয়, মীরজাফর কোলকাতায় ইংরাজদের ট্যাঁকশাল খোলার অনুমতিও দিয়েছিলেন। এরফলে ইংরাজদের শক্তির ভিত্তি আরও মজবুত হয় । তবে ইংরাজরা এর আগেই সিরাজউদ্দৌলার কাছ থেকে বিবিধ অধিকার আদায় করে নিয়েছিল, এক সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের মধ্য দিয়ে। ইংরাজদের সঙ্গে যুদ্ধের পর সিরাজ কোলকাতা থেকে ফিরে আসার সময় এক সন্ধি করেছিলেন, যেখানে কলকাতাতে টাঁকশাল খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং কলকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে আশিটি গ্রাম, যা মুর্শিদকুলী ইংরাজদের অধিকার করতে দেন নাই, ক্রয় করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। সন্ধির তৃতীয়

শর্ত অসুনারে, 'ইংরাজদের শত্রু সিরাজেরও শত্রু, আর ইংরাজদের মিত্র নবাবের মিত্র' বলে ঘোষিত হয়েছিল। এই সন্ধি জগৎশেঠের পক্ষেও অত্যন্ত হানিপ্রদ বলে বিবেচিত হয়।

"সন্ধির শর্ত পাঠানো হবে। রঞ্জিত রায় যতগুলো লিখেছিল তারচেয়ে আরো বেশী শর্ত ঢুকে গেল। মুর্শিদকুলি কলকাতার আশপাশের আশিখানা গ্রাম কিনতে দেয়নি। এবারে সেই আশিখানা গ্রাম দিতে হবে। যারা ইংরেজের শত্রু তারাই হবে নবাবের শত্রু। কলিকাতার টাঁকশালের টাকার ওপর কোন বাট্টা নেওয়া চলবেনা। সিরাজ তাতেই রাজী।

কলিকাতার সন্ধি ধাক্কা দেয়নি শুধুমাত্র সিরাজকে। সিরাজের অপমান সিরাজ নিজে ডেকে এনেছে। কিন্তু কলকাতার সন্ধি পত্র ধাক্কা দিয়েছে মহিমাপুরকে। ট্যাঁকশালের চেষ্টা বহুদিন থেকে করে আসছে ইংরেজরা। তাদের কোন চেষ্টা শেঠদের অজানা ছিল না।"

যখন ফরাসীরা ইংরাজদের হস্তে পরাজিত হয়ে চন্দনগর থেকে পলায়ন করতে বাধ্য হয় এবং তারা নবাবের সাহায্যপ্রার্থী হল, তখন নবাব তাদের সুরক্ষা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সন্ধির শর্তাদি ভঙ্গ করেছিলেন। এই বিষয়ে রবার্ট ক্লাইভ বারবার সচেতন করা সত্ত্বেও নবাব সিরাজউদ্দৌলা এতে কর্ণপাত করেন নি, যার ফলে ঘটেছিল নবাবের পরাজয়, এমনকি মৃত্যুও। এর পর মীর জাফর নবাব হলেন, কিন্তু পরে তাঁকে অযোগ্য বিবেচনা করে তাঁর জায়গায় মীরকাসিমকে ইংরাজরা মসনদে বসান। কিন্তু কিছুদিন পর মীরকাশিম ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন। অপরদিকে জগৎশেঠের প্রভাবকে মীরকাসিম ভয়ের কারণ বিবেচনা করেছিলেন, কারণ জগতশেঠের সঙ্গে ইংরাজদের সম্বন্ধও ভালোছিল। এই কারণে নবাব জগৎশেঠ মহতাবরায় এবং তাঁর ভ্রাতা স্বরূপচাঁদকে বন্দী করেন। ইংরাজদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় মীরকাসিম জগৎশেঠকে গঙ্গায় ডুবিয়ে হত্যা করার আদেশ দিয়েছিলেন। এইভাবে জগতশেঠ মহতাব রায় এবং তাঁর ভ্রাতা স্বরূপ চরম নির্দয়তা ও নিষ্ঠুরতার শিকার হতে হয়েছিল। জগৎশেঠের নিধনের পর তাঁর প্রভুভক্ত ভৃত্য পুত্রী ও নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন।

জগৎশেঠ মহতাবচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র খুশল চাঁদ তাঁর উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। দিল্লীর বাদশহ শাহ আলম ও তাঁকে জগৎশেঠ উপাধিতে সম্মানিত করেন। মীরকাসিমের পলায়নের পর পুনরায় মীর-জাফর বাংলার নবাব হয়েছিলেন, এবং ইংরাজরা তাঁর কাছ থেকে একলক্ষ টাকা যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ আদায়

করে। তাঁর সময় কোম্পানী এবং নবাবের মধ্যে একটি সামঝোতা পত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল, যার দ্বারা ইংরাজ সৈন্য রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয় অর্থ নবাবের কোষাগার থেকে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এরপর ইংরাজরা বাদশাহকে বছরে ছত্রিশ লক্ষ টাকা বাদশাহের প্রাপ্য রাজ্যস্ব বাবদ দেওয়ার পরিবর্তে সুবার রাজস্ব আদায়ের দেওয়ানী অধিকার লাভ করেন। জগৎশেঠের কাছে ইংরাজরা যে একলক্ষ টাকা ঋণ হিসেবে নিয়েছিলেন তাও তারা ফেরৎদিতে অসম্মত হয়। বাণিজ্যের বিষয়ে ইংরাজ কোম্পানী তাদের একাধিপত্য কায়েম করতে থাকে। এখানকার বাণিজ্যের সমস্ত মুনাফা ইংল্যান্ডে যেতে শুরু করে। ইংরাজ পক্ষ থেকে ঋণ না পরিশোধ করার জন্য জগৎশেঠের সঙ্গে ইংরাজদের বিরোধ বাড়তে থকে, এর পরিণামে ইংরাজরা মুর্শিদাবাদের ট্যাঁকশাল বন্ধ করার ব্যবস্থা করে। অত:পর বিপুল ধনরা সির উপর ইংরাজদের কর্তৃত্ব ও অধিকার বাড়তে থাকে।

এতসব বিপর্যয় স্বত্বেও জগৎশেঠ খুশলচাঁদ নিজেদের খানদান, ঐতিহ্যর পরম্পরা নির্বাহ করার জন্য মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করতে কার্পণ্য করেন নি। ঐ সময় জগৎশেঠের পরিবারের মাসিক খরচ ছিল এক লাখ টাকা, তাঁর পরিবারের সঙ্গে যুক্ত ছিল প্রায় চারহাজার মানুষ। শেঠ খুশলচাঁদ খুব শান্ত এবং ধার্মিক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন । উনি ১০৮ টি সরোবর এবং অনেক জৈনমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। জগৎশেঠ খুশলচাঁদের মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে মৃত্যু ঘটে। এর ফলে পরিবারটি বড় বিপর্যয়ের সম্মূখীন হয়। এমনকি এও বলা হয় যে, তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হওয়ার ফলে তাঁর যে বিপুল সম্পত্তি মাটির নীচে গুপ্ত অবস্থায় রাখা ছিল, তার বিষয়ে কারুর কাছে কোন সংকেত রইল না।

শেঠ খুশলচাঁদের পুত্র গোকুলচাঁদের মৃত্যু পিতার মৃত্যুর চারবছর পূর্বেই ঘটেছিল। অত:পর তিনি নিজের, ভ্রাতুস্পুত্র হরখচাঁদকে দত্তক নিয়েছিলেন, এবং তিনিই তাঁর উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন।ইংরাজদের সুপারিশে নবাব মুবারক উদ্দৌলা শেঠ হরখচাঁদকে জগৎশেঠ পদবী প্রদান করেন। ইনি কোন পুত্রসন্তান না হওয়ার জন্য বড়ই অস্থিরচিত্ত ছিলেন। এক বৈষ্ণব সাধুর প্রভাবে জগৎশেঠ বৈষ্ণব ধর্মের একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু পরিবারের অন্যান্যরা এবং মহিলারা জৈনধর্মের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। জগৎশেঠ ওয়ারেন হেস্টিংসের কার্যকাল শেষ হওয়ার আগে ট্যাঁকশাল খোলার আবেদন পত্র ইংরাজদের দিয়েছিলেন, কিন্তু কোনো অনুমোদন মেলে নাই। পুনরায় মুর্শিদাবাদে ট্যাঁকশাল খোলার অনুমতি প্রার্থনা করেন কিন্তু কোম্পানী এই অনুমোদন দেয় নি, কারণ এর ফলে কোম্পানীর

প্রভাব প্রতিপত্তি শেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে।

মুখাতরীনের ইংরাজী অনুবাদক পূর্বাপর তুলনা করতে গিয়ে লিখেছেন যে, ফতেহচাঁদের সময় জগতশেঠের দুকোটি মুদ্রা লুণ্ঠিত হওয়ার পরও সরকার কে পঞ্চাশ লাখ থেকে এককোটি পর্যন্ত দর্শনী হুণ্ডী দেওয়া ছিল এক সাধারণ ব্যাপার, আজকাল জগৎশেঠ ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দেও ১৪০,০০০ মুদ্রার হুণ্ডীর অর্থ প্রদানও কয়েকটি কিস্তিতে সম্পন্ন হচ্ছে। জগৎশেঠের নিজস্ব ধন যা খুশলচাঁদ স্বয়ং লুঠ করে গুপ্ত রেখেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর ঐ জায়গাটিই গুপ্ত রয়েগেছে। তাঁর পরিবারে চলে আসা কিংবদন্তী অনুসারে যে ধনসম্পদ মাটিতে পুঁতে রাখা ছিল তাঁর খুশলচাঁদের অকালমৃত্যর কারণে কাউকে না বলতে পারার জন্য তা সকলের অজ্ঞাতেই রয়ে যায়। তাঁর খুল্লতাত গুলাবচাঁদ তাঁর আপন অংশের সঞ্চয় থেকে হরখচাঁদকে কিছু অর্থপ্রদান করলে জগৎশেঠ তাঁর তাঁর মানসম্মান কিঞ্চিৎ বজায় রাখতে সমর্থ হন।

-জগতশেঠ-পারসনাথ সিংহ।

জগতশেঠ হরখচাঁদের দুটি পুত্র সন্তান জন্মেছিল, যাঁদের নাম ইন্দ্রচাঁদ এবং বিষ্ণুচাঁদ। হরখচাঁদের পর ইন্দ্রচাঁদ জগতশেঠ হয়েছিলেন। মাত্র ২৭ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র গোবিন্দচাঁদ পিতার ধনসম্পদ রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু ইংরাজ সরকার গোবিন্দচাঁদকে জগতশেঠের পদে মান্যতা দিতে অস্বীকার করে। অনেক লেখক আবার মনে করেন ইংরাজরা তাঁকে জগৎশেঠ হিসেবেই মান্য করত। গোবিন্দচাঁদ নিজের ঘরের পুরাতন অলংকারাদি বিক্রয় করে সংসারের আবশ্যকীয় প্রয়োজন মেটাতে থাকেন। ১৮৪৩ খ্রী: ইংরাজ কোম্পানী সরকার তাঁকে ১২০০ টাকার মাসিক বৃত্তি প্রদানে স্বীকৃত হয়।

গোবিন্দচাঁদের কোন পুত্র সন্তান না হওয়ার কারণে উনি গোপালচাঁদকে দত্তক নেন। গোপাল চাঁদ এবং বিশনচাঁদের পুত্র কিশন চাঁদ দুজনেই মাসিক বৃত্তির জন্য ইংরাজ সরকারের কাছে আবেদন করেন। গোবিন্দচাঁদের মৃত্যুর পর গোপালচাঁদের সময় কোম্পানীর তরফে তাঁকে ৭০০ টাকা এবং কিশনচাঁদের জন্য মাসিক ৫০০ টাকার বৃত্তির ব্যবস্থা করে । কিশন চাঁদ পুনরায় আবেদন করলে কোম্পানী কিশনচাঁদকে ৮০০ এবং গোপাল চাঁদকে ৩০০ টাকা বৃত্তি প্রদানের প্রস্তাব দেয়। এই প্রস্তাব গোপালচাঁদ অস্বীকার করে। কিশনচাঁদের মৃত্যুর পর গোপালচাঁদের ধর্মপত্নী শেঠানী প্রাণকুমারী বিবিকে কোম্পানীর তরফে মাসিক ৩০০ টাকা বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। শেঠানী প্রাণকুমারী বিবি

গোলাপচাঁদকে দত্তক নিয়েছিলেন। এই গোলাপ চাঁদের বড়পুত্র ফতেহচাঁদ তথা কনিষ্ঠপুত্র উদয়চাঁদের সময় কষ্টি পাথরের মন্দির, যা ভাগীরথী গর্ভে ভাঙ্গনের কারণে গঙ্গায় বিলীন হয়েগিয়েছিল, তার ভগ্নাবশেষ সংগ্রহ করে মহিমাপুরে নবনির্মত বসতবাটীতে পুন: প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। ১৮৯৬ খ্রী: ভয়ানক ভূকম্পনে শেঠ মানিকচাঁদ দ্বারা নির্মিত মহিমাপুরের প্রাসাদ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। কিছুদূরে নবনির্মিত গৃহে ফতেহচাঁদ এবং উদয়চাঁদ বাস করতেন। মোটামুটি এই সময় লর্ডকার্জন মুর্শিদাবাদে এসেছিলেন। ওখানে উনি মহিমাপুরের বিধ্বস্ত অট্টালিকা, মুঘল বাদশাহ থেকে প্রাপ্ত খেতাব, অলংকার ছাড়াও পঞ্চদশ শতাব্দীর পরের কিছু দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা দেখার সুযোগ পান । যে ফরমান দ্বারা মুঘলসম্রাট ফারুখশিয়র ফতেহচাঁদকে ‘জগৎশেঠ’ উপাধি প্রদান করেছিলেন, তা গুলাবচাঁদ কলিকাতাতে নির্মিত ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত রাখার জন্য সমর্পণ করেছিলেন। জগৎশেঠ ফতেহচাঁদের মৃত্যু ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিল। তাঁর পুত্র ছিলেন সৌভাগ্যচাঁদ, যিনি ডাকাতদের হাতে নিহত হয়েছিলেন। তাঁর দুই পুত্র শেঠ জ্ঞানচাঁদ এবং শেঠ বিজয়চাঁদ এখন বর্তমান।

মহিমাপুরের কসৌটি মন্দির:

ইতিহাস প্রসিদ্ধ জগতশেঠ পরিবার দ্বারা নির্মিত মুর্শিদাবাদ এর মহিমাপুরে কসৌটী প্রস্তরের জৈনমন্দির একটি তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছিল। শেঠ হীরানন্দশাহজী নাগোর থেকে আগ্রা, পাটনা-ইত্যাদি স্থানে ব্যাবসার জন্য এসেছিলেন, তাঁর বংশজ উত্তরসূরীদের প্রভাব পতিপত্তি মুঘল দরবার, মুর্শিদাবাদের নবাব এমনকি ইংরাজ সরকারের উপরও বজায় ছিল। এঁদের মর্যাদা ও গরিমা কোন রাজা বাদশাহর থেকে কিছু কম ছিলনা। সারাদেশে এঁদের অনেক কোঠী ছিল । ধর্মীয় ক্ষেত্রেও এঁদের বিশাল অবদান ছিল। সম্মেৎ শিখরের তীর্থক্ষেত্রগুলির উন্নয়নে এঁদের খুব বড় অবদান ছিল। সাধারণ মানুষ থেকে অনেক রাজা মহারাজা এমনকি দিল্লীর বাদশাহ এঁদের পর্যন্ত সম্মান করতেন। ধীরে ধীরে কালের প্রভাবে এই পরিবারের পতন শুরু হয়, ইংরাজদের দ্বারা প্রতারণার শিকার হওয়ার মধ্য দিয়ে। ঐ সময় ভাগীরথীর ভাঙ্গনের কারণে কোটি-কোটি মূল্যের সম্পত্তির লোকসান ঘটে, গঙ্গা ভাগীরথী তটে দুর্লভ কসৌটি প্রস্তরে নির্মিত জিনালয়টি ভাঙ্গনের ফলে ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয়।

তখন শেঠ উদয়চাঁদ ভগবান তীর্থঙ্করদের প্রতিমা উদ্ধার করে নিজের পরিবারের মহিমাপুরের ভিটেতে নূতনভাবে জৈনমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। এই মন্দির নির্মাণে ভগ্নপ্রাপ্ত মন্দিরের দুষ্প্রাপ্য কসৌটী প্রস্তর উদ্ধার করে ব্যবহার করা হয়েছিল । যেভাবে একদিন অত্যাচারিত হয়ে বাংলার জৈন সম্প্রদায়ের লোকেরা বাংলা ছেড়ে রাজস্থান আদি স্থানে পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছিলেন, কিন্তু চলে যাবার সময় প্রাণের চেয়েও প্রিয় জৈনমূর্তিগুলি সঙ্গে নিয়ে সুদূর রাজস্থানের বিভিন্ন জায়গায় পুন:প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তেমনই আজ মহিমাপুরের জগৎশেঠের কাসৌটী-প্রস্তর নির্মিত জৈন মন্দির গুজরাটের গাঁধীনগরের বিশ্বমৈত্রীধাম, বোরিজে নিয়ে গিয়ে স্থাপন করা হয় আচার্য প্রবাসী পদ্মসাগর -- মহারাজ সাহেবের প্রেরণায় মহান শ্রেষ্ঠী শ্রী মুকেশ ভাই শাহের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই মন্দির--------। কসৌটী মন্দিরের প্রশান্তি :

দানেয়েনং তিরস্কৃত: সুরতরু ধৈর্যেন বারানিধি

লব্ধং বংশ বিভূষকং চ জগতঃ শ্রেষ্ঠীতিরং পদম্
হীরানন্দ ইতি প্রভূত বিভব: শ্রেষ্ঠী গুণৈ ভূষিতো
লোকানাং সুখদে জিনৈর্নিগদিতং ধর্মেরতঃ সোহমবত্।।
মাণিক্যচন্দ্র শ্রেষ্ঠী তস্য সুতো গুণিগণৈ: সুপূজ্যোহ ভূত।
তস্য চ রুচির: সূনুঃ শ্রীমান্ ফতেচন্দ্রঃ জগত: শ্রেষ্ঠী পদং।। ২ ।।
তস্মাৎ কলা কলাপৈ রানন্দাননূচন্দ্র নামঢ্য:
তস্মাদপিচ সুপুত্রো জাতো মহতাবরায়শ্চ ।। ৩ ।।
তস্মাদ খুশালচন্দ্রো ভূদ্ হর্ষচন্দ্রস্তদংগজ:
তদাত্মজশ্চেন্দ্রচন্দ্রো ধর্ম কর্ম পরাঁয়ন: ।। ৪ ।।
গোবিন্দচন্দ্রঃ প্রবভূব তস্মা জাতোহঙ্গ ভূস্তস্য গুলাবচন্দ্র:
শ্রুতপ্রিয়: প্রীতিকরো জনানা জগত: শ্রেষ্ঠীতি শব্দ:-প্রতিবংশমাসীত্ ।। ৫ ।।
প্রভূদিত পতিকার লালিত দেশ কুলজন সুখকর বাচি প্রবীণা।
পর ভূত খজিতি ফুলকুমারী বুধ গণ রতি কৃতি তস্য প্রিয়াভূত ।। ৬ ।।
তস্যা ফতেচন্দ্রসুত: কনিষ্ঠ স্তস্যানুজ জগত: শ্রেষ্ঠীবরো হি জাত:।
স্নিগ্ধ: সুকীর্ত্যেদয়চন্দ্র সজ্ঞ স্তাভ্যাংচ সা শীলবতী গুণজ্ঞা।। ৭ ।।
নিকষ প্রস্তর নির্মিত মন্দির সুরনদীস্য ভগ্ন মবেক্ষ্যতৎ।
শুভকরী প্রতিমাং গৃহ-মানয়দ্ নবনিকেতন বাস বিধিত্সয়া ।। ৮ ।।
শুভদ্মাধব মাসি সিতে দলে সুশর সপ্ত নবেন্দু (১৯৭৫) মিতে হব্দকে।
বিধু যুতোত্তর ফাল্গুনি কর্কট যম তিথৌ জিন পার্শ্বপ্রতিষ্ঠিতম্ ।। ৯ ।।
ভূবন সংসৃতি দু:খ বিমোচিনী নিজ বিধাপিত নূতন মন্দিরে।
ব্যতনুত প্রথিতে মহিমাপুরে রুচিকরে চ মুনীন্দ্র সুসংকুলে ।। ১০ ।।

দানে যিনি কল্পতরুকে পরাভূত করতে সমর্থ, ধৈর্যে যিনি সমুদ্রপ্রতিম, গৈলড়া বংশভূষণ, জগৎশেঠ উপাধিধারক, জৈনধর্ম পরায়ণ শ্রমণ অনুরাগী, জনগণ সুখ দানকারী, বিপুল ঐশ্বর্যশালী, গুণবান ছিলেন হীরানন্দ শেঠ। তাঁর সুপুত্র গুণীজনমান্য শেঠ মানিকচাঁদ, যাঁর পুত্র জগৎশেঠ পদধারী শেঠ ফতেহচাঁদ। তাঁর সুপুত্র আনন্দচন্দ এবং তৎপুত্র মহতাবরায়। তাঁর পুত্র খুশলচন্দ্র এবং উনার অঙ্গজ হর্ষচন্দ্র এবং তাঁর আত্মজ ইন্দ্রচন্দ্র ছিলেন ধর্ম তথা কর্ম কুশল, যাঁর পুত্র গোবিন্দচন্দ্রের অঙ্গজ শ্রুতপ্রিয় এবং জনতার প্রীতি-পাত্র জগৎশেঠ গুলাবচন্দ্র। তাঁর প্রিয় পত্নী ফুলকুমারী কুলের সুখদায়িনী রমণী ছিলেন। তাঁর পুত্র ফতেচন্দ্র এবং _কনিষ্ঠ অনুজ কীর্তিশালী উদয়চন্দ্র। তিনি এবং তাঁর গুণবতী ও শীলবতী (ভার্যা) কসৌটী

প্রস্তরে নির্মিত মন্দির ভাগীরথী-গঙ্গা দ্বারা ধ্বংস হতে দেখে শুভকারক প্রতিমাগুলিকে উত্তরাফাল্গুনী নক্ষত্রের দিনে নিজ বাসভবনে প্রতিষ্ঠিত করেন। সন্ ১৯৭৫ বৈশাখ শুক্লা তিথি এবং সংসারের সকল দু:খ থেকে মুক্তি দেওয়ার বিধানকারীকে নিজনির্মাণকৃত নূতন মন্দিরে সুরুচিকর আচার্যমহারাজের নিকট জিনেশ্চর পার্শ্বনাথের প্রতিষ্ঠা করা হয়।

-স্বর্গীয় ভঁয়রলালজী নাহটা।

ভঁবরলালাই

বঙ্গদেশে জৈনধর্মের পুনর্জাগরণ:

যখন কোন রাষ্ট্রের বিভাজন হয় অথবা তার সীমানার পরিবর্তন ঘটে তখন নিজ ভূমি পর হয়ে যায় এবং পরভূমি আপন হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের বিভাজনের পর বঙ্গভূমির সীমানার ক্ষেত্রে বিরাট পরিবর্তন ঘটে। পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানে চলে যায় এবং পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষে থেকে যায়, যেখানে বিহারের কিছু পরিমাণ ভূমি পশ্চিমবঙ্গের সীমানার অন্তর্ভুক্ত হয়। অতীব প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র সম্মেৎ শিখরে যার বিশ (২০) তীর্থঙ্করের নির্বাণ ভূমি হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়েছিল তাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র তীর্থক্ষেত্র রূপে মান্যতা দেওয়া হয়ে থাকে। এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রবাহিত নদীগুলি, যেমন, দামোদর, কংসাবতী,শিলাবতী, বরাকর এবং অজয় তটবর্তী অঞ্চলে জৈন সংস্কৃতির প্রাচীনতম নিদর্শন এই ক্ষেত্রে জৈন ধর্মের প্রভাবের সাক্ষ্যরূপে আজও বর্তমান। আচারঙ্গ সূত্র থেকে জানা যায় যে আজ থেকে ২৬০০ বৎসর পূর্বে ভগবান মহাবীর অঙ্গ, বঙ্গ, এবং রাঢ় ভূমির বিভিন্ন জায়গায় পরিভ্রমণ করতেন। তাঁর উপদেশের প্রভাব আজও এই সকল ক্ষেত্রগুলিতে দেখতে পাওয়া যায়। ড: প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতানুসারে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে জৈনধর্ম বঙ্গদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, যা সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রচলিত ছিল।

সপ্তম শতাব্দীর পর ক্রমশ: শ্রাবকগণ বঙ্গভূমি থেকে পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছিল। রাজস্থান এবং গুজরাটের ভূমিতে। যেখানে শ্রমণ সংস্কৃতির সৌরভ বিকশিত ছিল ধীরে ধীরে তাও হ্রাস পায়। কয়েক শতাব্দীর পর রাজস্থানে শ্রাবকদের পুনরাগমণ ঘটে। সপ্তদশ শতাব্দীর অন্তিম পর্যায়ে জগৎ সেঠের বঙ্গদেশে পদার্পণের পর অনেক শ্রাবক কাসিমবাজার, অজিমগঞ্জ, জিয়াগঞ্জ, বালুচর, মহিমাপুর প্রভৃতি জায়গায় বসতি স্থাপন করে। যে ভূমি কখনও জৈনতীর্থঙ্কর গণের পবিত্র চরণ ধুলিতে পবিত্র হয়েছিল, সেখানে প্রাচীন জৈন তীর্থস্থান ডিহি জৈনেশ্বর ছিল,যার বর্তমান নাম আজিমগঞ্জ । ঐ জায়গায় এই শ্রাবকগণ মন্দির এবং ধর্মশালা নির্মাণ করে এক তীর্থস্থান রূপে স্থাপিত করেছেন। একে তীর্থস্থানে অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুনরায় পরিব্রাজক এবং জৈনমুনিদের আগমণ ঘটে, যার প্রভাব ওখানকার জৈনসমাজের লোকেদের উপর বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর

শেষভাগে জৈন পরিব্রাজক কবি নেহাল প্রথম জগৎশেঠ ফতেহচাঁদের মাতাশ্রী মানকদেবীর চরিত্রময় রাসগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। শ্রী জ্ঞানসাগর মহারাজজীর কাব্যে বঙ্গদেশের অনেক সুন্দর বর্ণনা রয়েছে। সম্রাট আকবরের ধর্ম প্রতিবোধক, হীরবিজয় সূরিজীর শিষ্য সোমবিজয়জী উপাধ্যায় তথা তাঁর শিষ্য পরম্পরার মধ্যে অগ্রণী ঋদ্ধিবিজয়জীর শিষ্য চেতন বিজয়জী। এঁর জন্ম বঙ্গদেশেই ঘটেছিল এবং ইনি আজিমগঞ্জে অনেক বছর অতিবাহিত করে অনেক সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর রচনাগুলি নাহার সংগ্রহালয়ে আজও বিদ্যমান। ইনি প্রথমে জৈন কবি, যাঁর জন্ম বঙ্গদেশেই হয়েছিল।

কাসিম বাজারের মন্দির সম্বৎ ১৭৮০ মাঘ কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে, মুনি ভদ্রগণির পরিচালনায় নির্মাণ এবং কপুর প্রিয়গণি দ্বারা প্রতিষ্ঠা করানোর উল্লেখ সংগ্রহালয়ে পাওয়া যায়। সম্বৎ ১৭৮১ তে গুলাবচাঁদ সেঠিয়া সাধু হীরাগিরিজীর পাদুকার নির্মাণ করিয়েছিলেন। সম্বৎ ১৮২১ মাঘ শুক্লপক্ষে পঞ্চদশ দিবসে মহোপাধ্যায় এর সময় সুন্দরজীর পরম্পরায় পন্ডিত হাজারী নন্দজীর উপদেশ অনুযায়ী মকসুদাবাদের কিরাতবাগ জিয়াগঞ্জে দাদাসাহেবের চরণের নির্মাণ করিয়েছিলেন, এবং তথা মহেন্দ্রসাগর সূরিজী দ্বারা শোভাচাঁদ মোতিচাঁদজী এর প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন উপাধ্যায় ক্ষমাকল্যাণ মহারাজজী "জয়তি হুঅণ ভাষা-৪১ গাথা"র রচনা করেছিলেন। মকসুদাবাদ নিবাসী সুগালচাঁদের আগ্রহে মহোপাধ্যায় সমোসুন্দরজীর শিষ্য পরম্পরার পন্ডিত আসকরণজীর শিষ্য আলমচাঁদজী সম্বৎ ১৮১৫ বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের পঞ্চম দিবসে 'জীববিচার স্তবন গাথা ১১৫' রচনা করেছিলেন। এরপর "মৌন একাদশী চৌপাঈ" 'ত্রৈলোক প্রতিমা স্তবন' তথা "সম্যকত্ব কৌমুদী চৌপাঈ" এর রচনা করেন। সম্বৎ ১৮৪৭ এ উপাধ্যায় ক্ষমাকল্যাণ মহারাজ মকসুদাবাদে সূক্তিরচনাবলী স্বোপজ্ঞবৃত্তি সহিত রচনা করেছিলেন। এইসব প্রত্যক্ষ করে আমার মনে হয়েছে দেশের চরম অরাজকতার সময়েও মুর্শিদাবাদের আজিমগঞ্জে এবং জিয়াগঞ্জের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জৈন সাধু এবং পরিব্রাজকগণের আসা যাওয়া অব্যাহত ছিল, এবং বিভিন্ন ধর্মমূলক সাহিত্যও রচিত হয়েছিল, যার ফলে জৈনসমাজও ধার্মিক চেতনায় সমৃদ্ধ হয়েছিল। জগৎশেঠের আধিপত্যের অবসান ঘটলেও জৈন সমাজ বঙ্গদেশে ধর্ম, কলা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সচেষ্ট ছিল।

: সমাপ্ত :

-:নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী:-

১। অথর্ববেদ্ সংহিতা -সম্পা: শ্রীরাম শর্মা আচার্য, সংস্কৃত সংস্থান বরেলী, ১৯৭০
২। অভিধান চিন্তামণি (হেমচন্দ্র) সম্পা: হরেগোবিন্দদাস বেচরদাস, ভাবনগর, বীরসম্বত্,২৪৪৬
৩। আচার নির্যুক্তি (ভদ্রবাহু)- সুরাট, ১৯৪১
৪। আবশ্যক নির্যুক্তি (ভদ্রবাহু)-সুরাট,১৯৪১
৫। আদি পুরাণ (জিনসেন) সম্পা: পান্নালালা জৈন, বারাণসী,১৯৬৩
৬। উত্তর পুরাণ (জিনসেন) সম্পা: পান্নালাল জৈন, বারাণসী,১৯৬৮
৭। ঋগ্বেদ্ সংহিতা - সম্পা: ভট্টাচার্যেণ শ্রীপাদ শর্মণা দামোদর ভট্টসূনুনা সান্তবলেকর কুলজেন, ভারতমুদ্রাণালয়ম্ ঔন্ধ-নগরম্ সাতারা, ১৯৪০
৮। কল্পসূত্র সম্পা: এবং হিন্দী অনুবাদক, মহোপাধ্যায় বিনয়সাগর, জয়পুর, ১৯৭৭
৯। চক্রবর্তী তপন - বাংলা সমাজ এবং সাহিত্যে জৈনধর্ম ও সংস্কৃতি (বাংলা)
১০। তেওয়ারী হরিপ্রসাদ ও নরসিংহ প্রসাদ :
(ক) জৈন ধর্মাবলম্বী রাঢ় ক্ষেত্র কী সরাক জাতি।
(খ) জৈন ধর্মকে পৃষ্ঠপোষক রাজা পুন্ড্র ঔর উনকী রাজধানী।
(গ) ভগবান মহাবীর কী সিদ্ধভূমি ঔর তৎসংলগ্ন ঔর অঞ্চল।
১১। পাল, চিত্তরঞ্জন - বাংলা দেশের বৃহত্তম নদী পদ্মা
১২। মজুমদার, রমেশচন্দ্র - প্রাচীন ভারত, মোতীলাল বনারসী দাস, বেঙ্গলীরোড, জবাহরনগর, দিল্লী,১৯৯৪
১৩। মুখোপাধ্যায়, শ্যামচন্দ্র - বাংলা সীমানা পর বসা সরাক সম্প্রদায়।
১৪। নাহাটা ভঁবরলাল - জগত সেঠ
১৫। পারখ ছোটেলাল - পাহাড়পুর কা জৈন তাম্রপত্র লেখ,
১৬। প্রবন্ধকোষ - বপ্পভট্টসূরী, সিংঘী জৈনগ্রন্থমালা
১৭। বাণ্ঠিয়া হজারীমল - জগৎশেঠ কী মাতা - এক আদর্শ নারী কী কহানী
১৮। বসু গোপেন্দ্র কৃষ্ণ - বাংলায় জৈনযুগের স্মৃতি
১৯। বসু ত্রিপুরা - রাঢ়ভূমে জৈনধর্ম
২০। বোথরা লতা -ভারত মে জৈনধর্ম, শ্রী জৈন শ্বেতাম্বর, পঞ্চায়তী মন্দির, কোলকাতা।
২১। রায় নীহার রঞ্জন - বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব)

২২। বিবিধ তীর্থঙ্ককল্প (জিনপ্রভসূরি) সম্পা: মুনি জিনবিজয়, কোলকাতা ১৯৩৪
২৩। সেন প্রবোধচন্দ্র -বাংলার আদি ধর্ম
২৪। সেন ক্ষিতিমোহন-জৈনধর্ম ও বঙ্গদেশ
২৫। সিংহ, শিবপ্রসাদ - জৈন তীর্থো কা ঐতিহাসিক অধ্যয়ন, পার্শ্বনাথ বিদ্যাশ্রম শোধ সংস্থান, বারানসী-৫ ১৯৯১ ,
২৬। শাহ উমাকান্ত - সুবর্ণভূমি মে কালকাচার্য, জৈনসংস্কৃতি সংশোধন মন্ডল, বনরাস,১৯৫৬।
২৭। Allchin, F.R. The Archaeology of Early Historic South Asia, Cambridge University.
২৮। Bandopadhyay - Jain Temples of Murshidabad
২৯। Chanda, Rama Prasad - Notes on Pre-Historic Antiquities from Mohenjo - Daro, Modern Review, Calcutta,1924
৩০। Choudhury - Political History of Northern India from Jain Sources
৩১। Chattopadhyay B.D - Studies in Early History, Delhi - 2003
Dwivedi Dr. R.C - Contribution of Jainism to Indian Culture. Motilal Banarasidas 1975.
৩২। Das Gupta, Nupur - Settlement in Ancient Bengal
৩৩। Gupta P.C. - Jainism in Ancient Bengal
৩৪। Hussain Shahanara, Everyday Life in the Pala Empire, Asiatic Siciety, Dacca,1968
৩৫। Jain Jagadish Chandra - Life in Ancient India as de picted in the Jaina Canons, New Book Co. Ltd. Bombay, 1947.
৩৬। Lalwani K.C. Bhagavati Sutra I-II- Jaina Bhavan, Kolkata.
৩৭। Kalhar- Studies in Art Iconography Architecture and Archaeology of India and Bangladesh.
৩৮। Majumder R.C. Colonial and Cultural Expansion in South East Asia, W.Bulm, London,1975
৩৯। Majumdar R.C - The History of Bengal, Vol-I,The

University of Dacca, Dacca
৪০। Marshall, Sir John - Mohan-Jo-Daro and The Indus Valley - Heinerermann, London,1898
৪১। MC. Crindle J.W. _Anicient India, ed by Ram Chandra Jain, Today & Tomorrow's Printers & Publishers, New Delhi-5,1972
৪২। Mitra - Nepalese Buddhist Tradition
৪৩। Pal Chittaranjan - Mahamuni Jambu Swami and Bengal.
৪৪। Pargiter F.E - Ancient Indian Historical Tradition, Moti Lal Banarasidas, Delhi,1962
৪৫। Sarkar D.C - Religion, Culture of Jain,University of Calcutta, 1973
৪৫। Sen B.C - Some Historical aspects of the inscrip tions of Bengal
৪৭। Shastri Nilakanta - A Comparative History of India, Calcutta 1957
৪৮। Smith V. A - An Encyclopaedia of Religions, New York,1921
৪৮। V.R.R Diksitar - The Gupta Polity, Delhi-1993 (Reprint)
৪৮। Jaina Journal - Quarterly Magazine, Jain Bhavan, Kolkata

পত্র-পত্রিকা:

১। কুশল নির্দেশ - সম্পা: ভঁবরলাল নাহটা, শ্রী জিনদত্ত সূরি সেবা সংঘ, কোলকাতা, অঙ্ক ১১২, বর্ষ ১৯৭১।

২। শ্রমণ (বাংলা)-জৈনভবন, কোলকাতা।

৩। তিত্থয়র (হিন্দী) - জৈনভবন, কোলকাতা,

৪। সরাকসংস্কৃতি ঔর জৈন ধর্ম, বিশেষাঙ্ক, তিত্থোয়ার,১৯৯৮।

৫। ভগবান মহাবীর ২৫০০ নির্বাণ মহোৎসব স্মারক গ্রন্থ, মুর্শিদাবাদ।

৬। আজ কী যোগী পাহাড়ী, শ্রী জৈন শ্বেতাম্বর মন্দির স্মারিকা, সাঁইথিয়া,বীরভূম সরাক সংস্কৃতি ঔর জৈনধর্ম -তিত্থোয়ার বিশেষাঙ্ক ১৯৯৮

৭। Jaina journal-Quarterly Magazine, Jaina Bhavan, kolkata.